সুভাষ-রচনাবলী

মেয়র। আগস্ট ১৯৩০

সুভাষ-রচনাবলী

৩

উপদেষ্টামণ্ডলী

সভাপতি

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

সদস্যগণ

শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী
শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ
ড. অশোকনাথ বসু
শ্রীসমর গুহ

প্রধান সম্পাদক

শ্রীসুনীল দাস

জয়শ্রী প্রকাশন। কলিকাতা ২৬

SUBHAS-RACHANAVALI— Vol. III

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৮৬ : মার্চ ১৯৮০

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

প্রকাশক : শ্রীবিজয় নাগ
জয়শ্রী প্রকাশন
২০এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলিকাতা ২৬

মুদ্রক : শ্রীদুলাল দাশগুপ্ত
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস। ১৫ মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

গ্রন্থক : সেঞ্চুরি বাইন্ডিং কোম্পানি
কলিকাতা ৯

ভূমিকা

'সুভাষ-রচনাবলী'র তৃতীয় খণ্ডে ১৯৩০-৩৫ সালের সময় পর্যায়ের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন অভিভাষণ, ভাষণ, বিবৃতি, ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম দুই খণ্ডের মতো উপরোক্ত সংকলনগুলি ইতিপূর্বে একসঙ্গে অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

তৃতীয় খণ্ডের সংগ্রহগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম। তার মধ্যে ১৯৩০-৩১ সালের কংগ্রেস, বিশেষ করে তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার কংগ্রেসে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিভিন্ন নেতৃবর্গের মধ্যে সংঘাত, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ধারা-বিবরণ পাওয়া যায়। ঐগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে সেই সময়ের অন্যান্য প্রবীণ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধের কারণ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের রণচাতুর্য ও কৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য, নিছক ব্যক্তিগত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা নয়। ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্বন্ধে তাঁর গুণাবধানকারী ভাষণগুলিকে অনুপম বলা যায়।

১৯৩২ সালের পরবর্তীকালে তাঁর ভাষণ ও লেখার মধ্যে তাঁর মতের এবং দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তাধারার ক্রম-বিকাশের রূপরেখাও প্রতিভাত হয়। শেষের দিকের রচনাগুলিতে সুভাষচন্দ্রের ইয়োরোপে অবস্থানকালে তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের আভাষ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দুষ্প্রাপ্য সংকলনগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে "জয়শ্রী প্রকাশন" নেতাজীর আত্মীয়পরিজন এবং জনসাধারণের আন্তরিক ও বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রধান সম্পাদক শ্রীসুনীল দাস এবং শ্রীবিজয়কুমার নাগ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস অধ্যবসায়ের জন্য এই দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যাঁর অনুপ্রেরণা, উপদেশ ও মহামূল্যবান পরামর্শে 'সুভাষ-রচনাবলী' প্রকাশ শুরু হয়, উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি,

আচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের জীবদ্দশায় সেই রচনাবলী প্রকাশ সম্পূর্ণ করা গেল না। প্রথম খণ্ড প্রকাশ উপলক্ষে প্রেস ক্লাব শিবিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ড. মজুমদার জয়শ্রী প্রকাশনকে যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও আশীর্বাণী জানিয়েছিলেন, আশা করি তাকেই পাথেয় করে উদ্যোক্তারা আরব্ধ কার্য সম্পন্নে সক্ষম হবেন।

কলিকাতা,
৭ মার্চ ১৯৮০

মুখবন্ধ

উনিশশো ত্রিশের পয়লা জানুয়ারি, স্বাধীনতার দুর্বার গতিবেগ বহন করে নিয়ে এলো। নূতন বছরের প্রথম দিনের উষালগ্নে কংগ্রেস-সভাপতি লাহোরের দুরন্ত শীতে গভীর উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করলেন। লাহোর-কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও সে-লক্ষ্য পূরণে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করেই কংগ্রেসের সমাপ্তি ঘোষণা হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজি-উত্থাপিত স্বাধীনতার মূল প্রস্তাবে সংশোধনী জুড়ে দিয়ে একদিকে যেমন প্রতি-সরকার গঠনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দাবি জানিয়েছিলেন, অপরপক্ষে, কর-রহিত সমেত আইন-অমান্য আন্দোলন এবং যখন যেখানে সম্ভব সাধারণ ধর্মঘটের দাবিও জানিয়েছিলেন : "...launch a campaign of civil disobedience including non-payment of taxes and general strike wherever and whenever possible".

গান্ধীজি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয়েছে, এবার সংগ্রামের দাবিও অল্পকালের মধ্যেই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। সুতরাং, অনতিকালের মধ্যেই তাঁকে বলতে শোনা গেল 'একমাত্র আইন-অমান্য আন্দোলনই দেশকে আসন্ন আইন-শৃংখলাভঙ্গের ও গুপ্ত অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে, কারণ, দেশে হিংসাশ্রয়ী দল রয়েছে, যারা কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামই বোঝে— বক্তৃতা, সম্মেলন বা প্রস্তাবে কান দেবার প্রয়োজন বোধ করে না' : "Civil Disobedience alone can save the country from impending lawlessness and secret crime, since there is a party of violence in the country which will not listen to speeches, resolutions or conferences, but believes only in direct action."—The Indian Struggle : Thacker Spink & Co. Ltd., Calcutta, 1948, p. 247। কিন্তু এতেই সমস্যা মিটল না। এই সংগ্রামের পরিধিতে অহিংসা বজায় রাখতে হবে। সুতরাং, সংগ্রামের নেতৃত্বও গান্ধীজিকে স্বহস্তে ধারণ করতে হবে।

২৬শে জানুয়ারি সমগ্র ভারতবর্ষে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামের পদক্ষেপ শুরু হল। সেই অনুষ্ঠান-সূচীর জন্য গান্ধীজি-

রচিত যে দীর্ঘ ঘোষণাপত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করলেন তাতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হল ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে : "...India must sever the British connection and attain Purna Swaraj or complete Independence।"

'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবিতে সুভাষচন্দ্রের দাবিই নিঃসন্দেহে প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু চরমপন্থীদের দাবির অনুরণন ! তা তো সম্ভব নয় ! তাই অচিরেই গান্ধীজি এই দাবির চড়া সুর নামিয়ে আনবার জন্য ১৯৩০-এর ৩০ জানুয়ারি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় বিবৃতিতে বললেন 'স্বাধীনতার সারমর্ম" বা "substance of Independence" পেলেই তিনি খুশি। বাক্যে কিবা আসে যায়! তাই অতঃপর 'independence' শব্দটি বর্জন ক'রে 'substance of independence' বাক্যটিকেই তারই স্থলবর্তী প্রতিশব্দের মর্যাদা দিয়ে চললেন। 'কায়া'টিকে চাপা দিয়ে 'ছায়া'টিকে আত্মস্থ করবার অপরূপ কৌশলে গান্ধীজি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা'র দাবিতে যাদের মনে ত্রাসের শিহরণ বয়ে গেল তাদেরও তো শান্ত করা চাই, নিঃসংশয় ক'রে সঙ্গে রাখা চাই ! তাই গান্ধীজি 'স্বাধীনতা' বা 'independence'-এর স্থলবর্তী আর-একটি মানানসই প্রতি-শব্দ উদ্ভাবন করে 'স্বাধীনতার সারমর্ম"-এর যদিচ্ছা আকার ধারণের অবকাশ সৃষ্টি করলেন। এই নূতন উদ্ভাবনটির নামকরণ হল 'পূর্ণ স্বরাজ'— "Purna Swaraj"। আসলে সুভাষচন্দ্র-উত্থাপিত 'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবির যে বৈপ্লবিক তাৎপর্য রয়েছে তাকে যতটা সম্ভব লঘু করা চাই। 'substance of independence' কিম্বা 'Purna Swaraj'-এর ঘেরাটোপ দিয়ে গান্ধীজি সে-কাজই করতে চেয়েছেন। 'পূর্ণ স্বরাজ' শব্দটি উদ্ভাবন ক'রে গান্ধীজি থেমে যান নি। ১১-দফা প্রতিপাদ্য দিয়ে তারও আবার ভাষ্য রচনা করেছেন। সুতরাং গান্ধীজি ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রাক্কালে ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবকে ১১-দফা সূচী ঘোষণায় সীমিত করে ফেললেন। এই 'স্বাধীনতার সারমর্ম" বা 'পূর্ণ স্বরাজ' বা '১১ দফা' প্রতিপাদ্যের ঘেরাটোপ জাতীয় বিপ্লবকে বিপর্যস্ত ও প্রতারিত ক'রে দেশ-বিভাগ অনিবার্য করে তোলে। সেই অসমাপ্ত বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বমুহূর্তে ১৯৪৭ এর ১৪-১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে 'Tryst with Destiny' বা 'বিধাতা-পুরুষের সহিত চুক্তি' শীর্ষক প্রদত্ত

জওহরলাল নেহরুর প্রখ্যাত ভাষণে 'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা'র বৈপ্লবিক স্পর্ধার পরিবর্তে 'স্বাধীনতার সারমর্ম'-এর ঘেরাটোপের মুখর প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। জওহরলাল বললেন : "Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially..."। জওহরলাল স্পষ্টই বললেন : 'যে কায়াকে পূর্ণাবয়বে পরিণতি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম, দীর্ঘ বছর পূর্বে, সে-প্রতিশ্রুতি পূরণের লগ্ন সমাগত। কিন্তু সে-প্রতিশ্রুতি পূর্ণাবয়ব পেল না, তার সারমর্ম অনেকটা পেল···'। অর্থাৎ, 'কায়া'র পরিবর্তে 'ছায়া' নিয়েই জাতিকে সে-দিন আত্মতৃপ্ত থাকতে বললেন জওহরলাল— গান্ধীজি যে 'ছায়া'কে লাহোর-কংগ্রেসের পর থেকেই অনুসরণ করে চলেছেন, আর সুভাষচন্দ্র তার পূর্ব থেকেই 'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা'র লক্ষ্যে আত্মনিবেদিত।

লাহোর-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের প্রতি-সরকারের সংশোধনী প্রস্তাবই যে শুধু পরাজিত হয়েছিল তাই নয়, কংগ্রেসের অন্তিম দিনে ১ জানুয়ারি ১৯৩০ তারিখে গান্ধীজির প্রস্তাব অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রসহ কয়েকজন বামপন্থীকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের সংশোধনী-রূপে আরো কয়েকটি নাম গান্ধীজির প্রস্তাবিত নামগুলির সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য শ্রীসত্যমূর্তি উল্লেখ করলে গণতান্ত্রিক নীতি ও নিয়ম-বিধি লংঘন ক'রে সভাপতি সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেবার পূর্বে মূল প্রস্তাব ভোটে দেবার স্বপক্ষে ভোট গ্রহণ করেন; সভাপতির অনুসৃত কার্যপদ্ধতি ৭২।৬২ ভোটে জয়ী হলে ৬২ জন সদস্য সভাস্থল ত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র এই বিরোধকে স্বাধীনতাবাদীদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনবাদীদের বিরোধ-রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রথম দল ত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় দলে জওহরলালের যোগদানের উল্লেখ করেছেন। সে-সময় থেকেই গান্ধীজি একমতাবলম্বী ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। লাহোর-কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির জন্য ১০ জনের নামের প্রস্তাব তারই পূর্বপ্রস্তুতি। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বামপন্থীদের বর্জনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে গান্ধীজি বুঝলেন তারুণ্য-শক্তির ঝড়ের বেগ অবিলম্বে প্রতিহত করতে হবে; সেজন্য সংগ্রামী অভিযানের কর্মসূচীও ছকে ফেললেন। সি. এফ. অ্যান্ড্রুজকে সে-

সময়ে লেখা চিঠিতে মহাত্মা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে তারুণ্য-শক্তির দুর্জয় প্রতিক্রিয়ায় বাধ দিতে হলে কালবিলম্ব না করে অহিংস সংগ্রামের নেতৃত্ব তাঁকে দিতেই হবে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বাধীনতাবাদীদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা গান্ধীজির এই ত্বরিৎ সিদ্ধান্তে অবশ্যই স্বীকৃতি পেল।

গান্ধীজি স্থির করলেন ১২ মার্চ ১৯৩০ সবরমতী আশ্রমের বাছাই করা ৭৮ জন অনুগামী নিয়ে সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং ৬ এপ্রিল সমুদ্রতীরে লবণ-আইন ভঙ্গ ক'রে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। সংগ্রামের শর্ত হল, তাঁর গ্রেপ্তারের পর তীব্র সক্রিয়তার সঙ্গে অহিংস সংগ্রাম দিয়ে সর্বতোভাবে হিংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধ চাই, একজন সত্যাগ্রহীও জীবিত বা মুক্ত থাকা পর্যন্ত অব্যাহত সংগ্রাম চলবে।

'ডান্ডী মার্চ' নামে খ্যাত এই সংগ্রাম শুরু করবার পূর্বে গান্ধীজি বড়োলাট লর্ড আরউইনকে ২ মার্চ ১৯৩০ একটি পত্র লেখেন। ১৯২৯ জুনে ইংলন্ডে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসীন হলে, বড়োলাট লর্ড আরউইনকে পরামর্শের জন্য লন্ডনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। সে-বছর অক্টোবরে লর্ড আরউইন ভারতবর্ষে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ. ১৯২৯-এর ৩১ অক্টোবর ঘোষণা করলেন যে ১৯১৭-র রাজকীয় ঘোষণার স্বাভাবিক সাংবিধানিক পরিণতি ভারতবর্ষের 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এ উত্তরণ। কিন্তু সে-বছরই ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজি ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' মঞ্জুরী সম্পর্কে বড়োলাটের আশ্বাসলাভে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। অথচ বড়োলাটের নিকট লিখিত ২ মার্চ, ১৯৩০-এর পত্রে ঘুরেফিরে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' ও 'ইন্ডিপেনডেন্স'-এর সমীকরণে গান্ধীজি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, সংগ্রামের মুহূর্তেও। উপরোক্ত ২ মার্চ-এর পত্রে গান্ধীজি বড়োলাটকে আশ্বস্ত করে বলছেন : 'স্বাধীনতা-দাবিতে গৃহীত প্রস্তাবে কোনো ত্রাসের সঞ্চার করা উচিত নয়, যদি আপনার ঘোষণায় 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর উল্লেখ চলতি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ্‌রা কি 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'কে কার্যত 'স্বাধীনতা'-রূপেই স্বীকার করেন নি ?'— "But the resolution of independence should cause no alarm if the dominion status mentioned in your announcement had been used in the accepted sense. For has it not been admitted by responsible British statesmen that Dominion Status is virtual Independence ?"

বড়োলাটের ৩১ অক্টোবর, ১৯২৯-এর 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' সম্পর্কে ঘোষণার উল্লেখ করে তাকেই কার্যত স্বাধীনতারূপে মানতে গান্ধীজির সায় কত তীব্র এবং আকুল— এই উদ্ধৃতিতে তারই স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ মাত্র তিনমাস পূর্বে লাহোর-কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, আর ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস'-এর সংকল্প ঘোষণায় 'ব্রিটিশ-সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা'র উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্যাপনের মাত্র কয়েক-দিন পূর্বে রাজদ্রোহমূলক অপরাধের অভিযোগে সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ড হয়। গ্রেপ্তারের পূর্বে বিভিন্ন সভাসমিতিতে ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার, গ্রামে সৈনিকদল গঠন, আদালতের স্বারস্থ না হয়ে সালিশী দিয়ে বিরোধ মেটানো, বিলাতী দ্রব্য, বিশেষত বস্ত্র ও লবণ বর্জন, যে স্থানে সম্ভব আইন-অমান্য করা— গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠন— এই কর্মসূচীগুলির উপর জোর দিয়ে তিনি সংগ্রামের প্রস্তুতির আহ্বান জানান। ইতিপূর্বে সুভাষচন্দ্র ভারতের মিশনের কথা বলেছেন, বিশ্বসভায় তার অবদানের কথা বলেছেন ; প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে ওঙ্কারধ্বনির মতো তিনি ভারতীয়ত্ববোধের এই আদর্শ বিলিয়ে গেছেন। জওহরলালের সঙ্গে এ-সম্বন্ধে তাঁর মতভেদ ছিল দুস্তর। ১৯২৮ মে মাসে বোম্বাইয়ে একই সভামঞ্চে তারুণ্যের প্রতীক দুই নেতা উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় সুভাষচন্দ্র তাঁর ভারতীয়ত্ববোধের আদর্শ প্রচারে তন্ময়। আর জওহরলালও দ্বিধাহীন কণ্ঠে বিপরীত সুরে বললেন, "ভারতের কোনো মিশন আছে একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের অমর অতীত ঐতিহ্যের কথা কেউ বললে আমার বিরক্তি জন্মে।"...দুইজনের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান। তাই গোড়া থেকেই পথের বিভিন্নতা, পরিখার দুই পাশে দুই শিবির : স্বাধীনতা-বাদী বনাম ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনবাদী। সুভাষচন্দ্র প্রথম শিবিরে আত্ম-নিবেদিত, জওহরলাল দ্বিতীয় শিবিরে আত্মসমর্পিত। কালের ব্যবধানে ইতিহাসের পাতায় আরো বিচিত্র এবং বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে এই দুই শিবিরের সংঘাত আরো তীব্র ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে— কখনো বা এই দুইয়ের মধ্যে সাময়িক সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে মাত্র। ১৯২৮-এর এই মে মাসেই বিভিন্ন সভায় সুভাষচন্দ্র আর-একটি বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনির উল্লেখ করেন।

সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ থাকাকালীন একদিকে যেমন উত্তাল অহিংস সংগ্রাম দমনে ব্রিটিশ শাসকদের দুরন্ত চণ্ডনীতি নেমে এলো, অপরদিকে সূর্য সেনের

নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম ১৯৩০ এপ্রিলে আত্মপ্রকাশ করল। অহিংস সংগ্রামের পাশাপাশি বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংযোজন ব্রিটিশ শাসকদের উদ্বিগ্ন করে তোলার ফলে আইন-অমান্য আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০, ৫ মে গান্ধীজিকে বন্দী করা হল। তারপর আপস-মীমাংসার পালা শুরু। ইংরেজের চোখে গান্ধীজি ছিলেন "...the best policeman the Britisher had in India" (Miss Ellen Wilkinson ১৯৩২এ ভারত পরিদর্শনের পর বলেন))। অথবা অপর এক ইংরেজ লেখক যেমন গান্ধীজিকে চিহ্নিত করেছেন : "Gandhi's whole aim was to minimize violence" (Michael Edwards : Last Years of British India, p. 47) ; এই লেখকই অন্যত্র গান্ধীজি সম্পর্কে বলেছেন : "...as a neutralizer of rebellion" (Ibid, p. 57)। তেজ-বাহাদুর সাপ্রু ও এম. আর. জয়াকরের শান্তিমিশন আগস্ট ১৯৩০-এ ব্যর্থ হল। নভেম্বরে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই প্রথম গোলটেবিল বৈঠক লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

১৯৩১ জানুয়ারিতে গান্ধীজি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন— উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকারের সংগে তাদের আপস-চুক্তির সুযোগ দেওয়া। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি বড়োলাটের সংগে গান্ধীজির আলাপ-আলোচনা শুরু, গান্ধী-আরউইন চুক্তি বা দিল্লী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৫ মার্চ, ১৯৩১। এই চুক্তি অনুযায়ী আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হল, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সাব্যস্ত হল, পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের দাবি হল— পরে এই দাবি প্রত্যাহার করা হয়— অহিংস আন্দোলনে বন্দীদের মুক্তি-দান, বাজেয়াপ্ত জমি ও সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, এমারজেন্সি অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহার, সমুদ্রের নিকটবর্তী সীমিত সীমায় বসবাসকারীদের লবণ তৈরির অধিকার দান, স্বদেশী শিল্প প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদেশী পণ্য পিকেটিং-এর এবং মদ, অহিফেন ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের দোকানেও পিকেটিং করার অধিকারে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

আগস্ট ১৯২৯-এ দক্ষিণ কলিকাতায় 'নিখিল ভারত রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস' পালন উপলক্ষে শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্র সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন এবং এই মামলায় ১৯৩০, ২৩ জানুয়ারি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সে-বছর ২৩ সেপ্টেম্বর

মুক্তি পান। ১৯৩১, ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলকাতার মেয়ররূপে কর্পোরেশনের দপ্তর থেকে ময়দানে মনুমেন্ট অভিমুখে শোভাযাত্রা পরিচালনাকালে পুলিশের লাঠির আঘাতে সুভাষচন্দ্র গুরুতররূপে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হন। পরদিন দাঙ্গার অভিযোগে বিনাশ্রমে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় এই দণ্ড ভোগ করছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের পর ৮ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির পরই বোম্বাই উপস্থিত হয়ে গান্ধীজিকে তিনি বলেন যতদিন পর্যন্ত গান্ধীজি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অবিচল থাকবেন, ততদিন গান্ধীজি তাঁর সমর্থন লাভ করবেন; করাচী-কংগ্রেসের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সহবন্দীদের উপর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। তাঁদের প্রাণরক্ষার দাবি গান্ধীজি চুক্তির মাধ্যমে পূর্বশর্তরূপে উত্থাপন করেন নি। কারণ, সশস্ত্র হিংসাত্মক সংগ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজি বীতরাগ। অথচ সুভাষচন্দ্র আয়ারল্যান্ডের সিন্ ফিন্ পার্টি এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উল্লেখ করে বলেন সে-সময় আইরিশ নেতারা রাজবন্দীদের সার্বিক মুক্তির প্রস্তাবই শুধু উত্থাপন করেন নি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সীয়ন ম্যাক্‌কিওন্ ছাড়া অন্যান্য সকল বন্দীদের মুক্তিদানে সম্মত হলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সীয়ন ম্যাক্‌কিওন্‌কে মুক্তি না দিলে সিন্ ফিন্ নেতারা চুক্তি বাতিলের চরম হুমকি দেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা এই চরম দাবি মেনে নিয়ে সীয়ন ম্যাক্‌কিওন্‌কে মুক্তিদান করেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজি অতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সম্মত ছিলেন না। অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলনে যুক্ত বন্দীদের মুক্তির শর্ত, চুক্তিতে সংযোজিত হওয়ার ফলে বিপ্লবী ও শ্রমিক-দলের বন্দীদের, বাংলার বিনাবিচারে রাজবন্দীদের মুক্তি সম্ভব হল না। গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে হিংসা ও অহিংসাপন্থী বন্দীদের এই বিভেদমূলক স্তরভেদ জাতীয় বিপ্লবের সংহত সংগ্রামে বিচ্ছেদের পথ কেটে দিল। ১৯২০-এর দিল্লী ইস্তাহারে কিম্বা গান্ধীজির 'পূর্ণ স্বরাজ' ভাষ্যের প্রখ্যাত ১১-দফায়ও এই স্তরভেদ স্থান পায় নাই।

বোম্বাই আলোচনায় সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবেই গান্ধীজিকে জানিয়ে দেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি থেকে স্খলন হলে তিনি তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে

নেবেন। এই আলোচনাকালে আরো স্থির হয় যে লাহোর-কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করাচী-কংগ্রেসে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের যোগদানের শর্ত বেঁধে দেওয়া হবে।

জওহরলাল দিল্লী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সময় মুক্ত থেকেও এক বিবৃতিতে বলেন চুক্তির কোনো কোনো ধারা তিনি অনুমোদন করেন না বটে কিন্তু একজন অনুগত সৈনিকের মতো তিনি নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। অপরপক্ষে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের বামপন্থীদের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করাচী-কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সরাসরি বিরোধিতা করেন, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে চুক্তি সম্পর্কে ভোট গ্রহণে বিরত থাকেন। দিল্লী-চুক্তি সমর্থক বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের সমবেত করতে গান্ধীপন্থীরা বদ্ধপরিকর হয়ে বিপুল অর্থব্যয় করেন। দেশের বিত্তশালীরা চাইছিলেন স্থায়ী শান্তি ফিরে এলে তারা নির্বিঘ্নে শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগ পাবেন। তাই অকাতর অর্থব্যয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমর্থক কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের করাচী-কংগ্রেসে উপস্থিত হবার সুযোগ করে দিতে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ২৩ মার্চ সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসি হয়ে গেল। এ. আই. সি. সি.-র বৈঠক ২৬ মার্চ এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন ২৯ মার্চ ধার্য হয়ে রয়েছে কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তি-সমর্থক এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি গান্ধীপন্থীরা করাচীতে সমবেত করেছেন যে বিপ্লবীত্রয়ীর ফাঁসির প্রতিক্রিয়ারূপে চুক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চিতির শিহরন বয়ে গেলেও, কংগ্রেস অধিবেশনে চুক্তির স্বপক্ষে বিপুল সমর্থন সুনিশ্চিত ছিল। তবুও সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সহ-বিপ্লবীদের অমিত তেজ ও আত্মদানের সপ্রশংস প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে গ্রহণ করতে হয়, সেইসঙ্গে সকল প্রকার হিংসামূলক কাজের নিন্দাসূচক প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় করাচী-কংগ্রেসের সভাপতি সর্দার প্যাটেল তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে লাহোর-কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের লক্ষ্যে পিছিয়ে এলেন! এবারও অন্ধ গান্ধী-অনুরাগীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়— আবার সেই স্বাধীনতাবাদী ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনবাদীদের দুই শিবির।

২৮ মার্চ ১৯৩১ করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত-

সভার (নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস) দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শবোধের এক নূতন দিগন্ত খুলে দেয়। এই ভাষণে উত্থাপিত প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে তাঁর কোনো কোনো ভাষণে বিবৃত হয়েছে বটে, কিন্তু এই ভাষণে বিভিন্ন মৌলিক ভাবনার সংহত বিন্যাস ভাষণটিকে একটি স্বকীয়তা দান করেছে। করাচী-কংগ্রেসে ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ভূমিনীতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলি বিবৃত করেছেন, দেশের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারের উল্লেখ করেছেন কিন্তু আগামী দিনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কোনো ইশারা তাঁর ভাষণে স্থান পায় নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নওজোয়ান ভারতসভায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন "আমি চাই ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক।" কোন্ আদর্শের উপর সমাজজীবন গঠিত হবে? এই সামাজিক আদর্শের মর্মবস্তুই বা কী? ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, নিয়মানুগত্য ও প্রেম— ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূলাধার হবে এই পাঁচটি নীতি বা আদর্শবোধ। সাম্য-স্বাধীনতার ঘাত-প্রতিঘাতে বৈপ্লবিক চেতনা সঞ্চারিত হয়ে সমাজজীবনের পুরাতন ভারসাম্য ভেঙে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব ক'রে তুলবে। বৈদেশিক ভাবধারার অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন রাশিয়ার পরিস্থিতিতে যেমন মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রয়োগে মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদ জন্ম নিয়েছে, তেমনি ভারতীয় পরিস্থিতিতে ভারতীয় সমাজবাদ গড়ে উঠবে। কোনো দেশের বা জাতির ইতিহাস বা ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সে দেশের বা জাতির আদর্শবাদ গড়ে উঠতে পারে। এমনও সম্ভব যে ভারতবর্ষে যে-ধাঁচের সমাজতন্ত্র গড়ে উঠবে তার নূতনত্ব ও মৌলিকতা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণসাধন করবে। সুভাষচন্দ্র বার বার আদর্শগত জীবনে ভারতবর্ষের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে রংপুর ভাষণে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: "আজকাল সমাজতন্ত্রের নূতন চিন্তাধারা পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে আমাদের দেশের বহুলোকের চিন্তাধারা বদলে দিচ্ছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাবধারা আমাদের দেশে কোনো নূতন মতবাদ নয়। সমাজবাদকে নূতন ভাবধারা মনে করবার কারণ, আমাদের নিজেদের ইতিহাসের পরম্পরা হারিয়ে ফেলেছি। কোনো মতবাদকেই অভ্রান্ত ও শাশ্বত মনে করা অযৌক্তিক।...সুতরাং আলোকসম্পাতের জন্য রাশিয়ার দিকে চেয়ে থাকা

মুখাপেক্ষী বৈ আর কিছু নয়। আমাদের নিজস্ব আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সমাজ ও রাজনীতি গড়ে তুলব। প্রত্যেক ভারতবাসীরই এটাই হবে লক্ষ্য ও আদর্শ।"

কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক চেতনার স্পর্শ দিতে চেয়েছেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের কর্মসূচীর ভিত্তিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন আপসমুখিন রূপে, সংগ্রামমুখিন নয়। অথচ বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া সমাজের রূপান্তর ঘটবে কেন? নূতন সমাজে উত্তরণ তো সামাজিক শক্তি-বিন্যাসের নূতন ভারসাম্যে পৌঁছানোতেই সম্ভব হবে। সামাজিক শক্তি-বিন্যাসের এক ভারসাম্য থেকে অন্য ভারসাম্যে উত্তরণের অপর নামই তো বিপ্লব! সুভাষচন্দ্র নওজোয়ান ভারতসভার ভাষণে এই বিপ্লবের কৌশল ও পদ্ধতির রূপরেখাই এঁকে দিয়েছেন। এই পথেই তিনি ভারতবর্ষে বামপন্থী সংগ্রামী রাজনীতির ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন। এ-ছাড়া করাচী-কংগ্রেস অধিবেশনে মতভেদ সৃষ্টির দায় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য স্বীয় কর্তব্য পালনে বিরত থেকেছেন, এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র কঠোরতম ভাষায় গান্ধী-আরউইন চুক্তির আট-দফা সমালোচনা করে সেই কর্তব্যচ্যুতির গ্লানিমুক্ত হয়েছেন। সম্মেলনে এই চুক্তির তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। মে মাসে মথুরায় অনুষ্ঠিত যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক যুব-সম্মেলনে এবং জুলাই মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনেও দিল্লী-চুক্তি ধিকৃত হয়। এই দুই সমাবেশের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এ ছাড়া বাংলায় পুলিশের নির্মম অত্যাচারের উত্তরে বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভিযানে সংগ্রাম-মুখর হয়ে ওঠে।

নওজোয়ান ভারতসভায় অভিভাষণের উপসংহারে সুভাষচন্দ্র বিশ্বের সংস্কৃতির ও সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের অন্তিম অবদান সম্পর্কে অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে তাঁর মত অভিব্যক্ত করেছেন। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির অনাবিল স্বচ্ছতা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে সে-বাণী ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। সমগ্র মানবতার উৎকর্ষের জন্য, একটি নূতন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গড়নই হবে বিশ্বের ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের সর্বশেষ অবদান। সমগ্র পৃথিবী সেই অবদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে।

কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার পূর্বেই, মহাত্মাজী প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিমদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি উত্থাপনের সুযোগ ক'রে দেন, গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে

এবং ভবিষ্যৎ সংবিধানে প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি প্রশ্নে তাদের সম্মতির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে। এই সময় সুভাষচন্দ্র দিল্লীতে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে, গান্ধীজি জানতে চান পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁর কোনো আপত্তি আছে কিনা। সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী জাতীয়তাবাদের মূল নীতির বিরোধী এবং তিনি মনে করেন এই ভিত্তিতে স্বরাজলাভও অবাঞ্ছনীয়। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরাও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করেন।

ইতিমধ্যে ১৮ এপ্রিল লর্ড আরউইনের কার্যকাল ফুরিয়ে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন লর্ড উইলিংডন। সরকারপক্ষের দিল্লী-চুক্তি লঙ্ঘনের ঘটনাও দ্রুত বৃদ্ধি পেলে গান্ধীজির গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান প্রায় বাতিল হবার উপক্রম হয়। আগস্ট মাসে গান্ধীজির সঙ্গে লর্ড উইলিংডনের সাক্ষাৎ আলোচনায় উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পেলে গান্ধীজি ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ লন্ডনে পৌঁছান।

গোলটেবিল বৈঠকে যা ঘটবার তাই হল। ব্রিটিশ সরকারের বাছাই করা স্বার্থসন্ধ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে একা বসবার সম্মতিটাই যে গোড়ায় গলদ হয়েছে গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক সমাধানে গোলটেবিল আলোচনায় 'মাইনরিটিস কমিটি'র বৈঠকের পরই তা গভীর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন। ৮ অক্টোবর, ১৯৩১-এর বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে তিনি বললেন : "...Causes of failure were inherent in the composition of the Indian delegation." ১৯২৯ নভেম্বরে নেতৃবর্গের 'দিল্লী ইস্তাহার' নামে খ্যাত বিবৃতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র কয়েকজন সহকর্মীসহ পৃথক ইস্তাহারে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের কঠোর বিরোধিতা করেন। সেই ইস্তাহারে আরো বলেন, পরস্পর যুদ্ধমান দেশগুলি গোলটেবিল বৈঠকে সমবেত হয় এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভারতীয় জনসাধারণই নির্বাচিত করবেন, তাঁরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বাছাই করা হবেন না— যা বর্তমান ক্ষেত্রে করা হবে। আর বড়োলাটের ৩১ অক্টোবর ১৯২৯-এর ঘোষণা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট-এর বিছানো একটি ফাঁদ মাত্র :

১৯৩১, ২৮ ডিসেম্বর ব্যর্থ গান্ধীজি বোম্বাই অবতরণ করলেন। সুভাষচন্দ্র তার কয়েকদিন আগেই তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য বোম্বাই পৌঁচেছেন। ২৯ ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীজিকে বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ

প্রার্থনায় সম্মতি দিলে গান্ধীজি তাঁকে তারবার্তা পাঠালেন। ১ জানুয়ারি ১৯৩২ ওয়ার্কিং কমিটি কার্যত আইন-অমান্য আন্দোলনের ডাক দিল, যদি না বড়োলাট তাঁর মত পরিবর্তন করেন। ২ জানুয়ারি বড়োলাট জানালেন আইন-অমান্য আন্দোলনের হুমকির মুখে সাক্ষাতের প্রশ্ন একেবারে অবান্তর। গভর্নমেন্ট এবার দুর্জয় শক্তি নিয়ে আন্দোলন দমনে প্রস্তুত। হাজার হাজার নেতা ও কর্মী ত্বরিৎ আঘাতে গ্রেপ্তার হলেন। অত্যাচারের সংগে পাল্লা দিয়ে সংগ্রামের গতিবেগও দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। আট মাস মরণপণ সংগ্রামের পর ১৯৩২-এর ২০ সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ গান্ধীজি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর 'কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড'-এ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করলে আইন অমান্য আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর পুণা-চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থার বিকল্প প্রস্তাব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ২৬ সেপ্টেম্বর গ্রহণ করবার পর গান্ধীজির অনশন রদ হয়।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর ট্রেনে বোম্বাই থেকে কলকাতা অভিমুখে রওয়ানা হলে, বোম্বাই-এর অনতিদূরে কল্যাণ স্টেশনে ২ জানুয়ারি ১৯৩২ তারিখে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার হয়ে মধ্য প্রদেশে সিওনি জেলে স্থানান্তরিত হন। শরৎচন্দ্র বসুও ৪ ফেব্রুয়ারি ঝরিয়ায় গ্রেপ্তার হয়ে সুভাষচন্দ্রের সহবন্দীরূপে সিওনি জেলে প্রেরিত হন। সিওনি থেকে ৩০ মে বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জব্বলপুর জেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সুভাষচন্দ্রকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাদ্রাজে এবং ৮ অক্টোবর উত্তর প্রদেশের ভাওয়ালী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়; ডিসেম্বরে আবার ভাওয়ালী থেকে লক্ষ্ণৌ বলরামপুর হাসপাতালে সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। গভর্নমেন্ট নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ইয়োরোপ যেতে সম্মতি দিলে ১৯৩৩, ২৩ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র বোম্বাই থেকে ইয়োরোপের পথে রওয়ানা হলে তাঁকে জাহাজে মুক্তি দেওয়া হয়। ৩ মার্চ সুভাষচন্দ্রের জাহাজ এস. এস. গাংগে ভেনিসে পৌঁছলে ইটালী সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

৮ মে ১৯৩৩ আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধীজি তিন সপ্তাহের অনশন শুরু করলে গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দেন। অতঃপর গান্ধীজির অনুমোদনক্রমে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীআনে আইন-অমান্য আন্দোলনের বিরতি

ঘোষণা করেন। বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র আইন-অমান্য আন্দোলনের বিরতি ঘোষণা সম্পর্কে গান্ধীজির সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে ভিয়েনা থেকে এক ইস্তাহারে বলেন যে এই সিদ্ধান্ত তেরো বছরের আত্মত্যাগ ও কর্মসাধনা মুছে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আইন-অমান্য আন্দোলনের এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের ব্যর্থতা ঘোষণা করছে এবং অতঃপর আরো চরমপন্থী নীতির ও নেতৃত্বের সন্ধান করতে হবে। ১৯৩৩-এর মে'র পশ্চাদপসরণকে সুভাষচন্দ্র আত্মসমর্পণরূপে চিহ্নিত করেছেন।

লন্ডনে বসবাসকারী ভারতীয়রা ১৯৩৩-এর ১১ ও ১২ জুন লন্ডনে 'ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল কনফারেন্সে'-এ সভাপতিত্ব করবার আমন্ত্রণ জানালে সুভাষচন্দ্র লন্ডনে যাবার পাসপোর্টের আবেদন করেন। তাঁর পাসপোর্টে ফ্রান্স, ইটালী, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড যাবার অধিকারের মঞ্জুরী থাকলেও লন্ডন ও জার্মানীতে যাবার মঞ্জুরী ছিল না। ভিয়েনা থেকে চিকিৎসার জন্য জার্মানীতে যাবার মঞ্জুরী পেলেও ইংলন্ডে যাওয়া না-মঞ্জুর হল। এ-বছর জুলাই মাসে ওয়ারশ' থেকে তাঁর মস্কো যাবার চেষ্টা বিফল হল। অজ্ঞাতকারণে সোভিয়েত গভর্নমেন্ট তাঁকে মস্কো যাবার ভিসা দিতে অসম্মত হন।

লন্ডন পলিটিক্যাল কনফারেন্সে সুভাষচন্দ্রের সভাপতির ভাষণ 'বিপ্লবের কৌশল' বা 'Technique of Revolution' সম্পর্কিত একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল ; এই অভিভাষণে তিনি ক্ষমতা দখলের জন্য কৌশল রচনায় বৈপ্লবিক স্পর্ধা দেখিয়েছেন। তিনটি সূত্র-নির্দেশে সরকারী যন্ত্রকে অচল করে দেবার পথ দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তিতে বুদ্ধি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ও তীব্রতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন।

সকল প্রকার দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে একদল দৃঢ়সংকল্প নরনারীকে ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য তিনি দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। উপযুক্ত নেতৃত্ব গড়ে তুলে ক্ষমতা দখলের জন্য এঁরা এগিয়ে যাবেন, ক্ষমতা দখলের পর কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র, বিপ্লবের কৌশল সম্পর্কিত তাঁর এই ভাষণে বলেছেন, যাঁরা ক্ষমতা দখল করবেন, নূতন রাষ্ট্র পরিচালনার ও সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের উন্নয়নের জন্য তাঁদেরই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কারণ যুদ্ধকালীন নেতৃবর্গ

যুদ্ধোত্তর নেতৃত্বের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি না হলে ক্ষমতা দখলের পর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন পরিস্থিতি ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এই নূতন দল গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একদিকে 'জাতীয়' সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবে, অপর দিকে নূতন ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে স্থপতির কাজ করবে ; অতঃপর সুভাষচন্দ্র ভারতের যে বিশেষ বাণী সম্পর্কে দীর্ঘকাল যাবৎ গভীর প্রত্যয় নিয়ে কৈশোর থেকে বলে এসেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে এই অভিভাষণে বলেন : "অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়বে। আমরা সকলেই জানি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ড সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের আদর্শের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিশ্বসভ্যতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছে। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স "স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রী"র আদর্শের মধ্য দিয়ে অভাবনীয় অবদান রেখে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী তার মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্য দিয়ে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বহারাদের বিপ্লব, গভর্নমেন্ট এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্থকতার মধ্য দিয়ে বিশ্বসংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পরবর্তী অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়বে।" দ্রষ্টার মতো সুভাষচন্দ্র সেই ১৯৩৩-এর সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন : "Free India will not be a land of capitalists, landlords and castes. Free India will be a social and a political democracy. The problems of free India will be quite different from those of present-day India, and it will therefore be necessary to train men from today who will be able to visualise the future, to think in terms of free India and solve those problems in anticipation. In short, it will be necessary to educate and train from today the future cabinet of free India."

এই কাজের দায়িত্ব নেবে সর্বস্ব-নিবেদিতপ্রাণ একদল স্বাধীনতা-প্রদীপ্ত নরনারী। সুভাষচন্দ্র এই নূতন দলের নামকরণ করেছেন "সাম্যবাদী সংঘ"।

'সাম্যবাদ'-এর মর্মবস্তু কী সে সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র আলোচনা করেছেন জওহরলাল নেহরু প্রদত্ত ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৩-এর বিবৃতির সূত্রে। এই

বিবৃতিতে জওহরলাল বলেছেন 'বর্তমান পৃথিবীতে হয় কোনো ধরনের কম্যুনিজমকে নাহয় কোনো ধরনের ফ্যাসিজমকে বেছে নিতে হবে।··· এই দুই-এর কোনো মধ্যপথ নেই এবং এই দুই-এর মধ্যে আমি কম্যুনিস্ট আদর্শকেই বাছাই করেছি।' সুভাষচন্দ্র এই মতবাদকে মূলগতভাবে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজম-এর সমন্বয় সাধনের উল্লেখ করেছেন। কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজম-এর মূলগত প্রভেদ থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে এই দুই মতবাদের সাদৃশ্যও রয়েছে। এই সাদৃশ্যগত দিকগুলির ভিত্তিতেই দুই-এর সমন্বয় সাধিত হবে। এই সমন্বয়কে সুভাষচন্দ্র নামকরণ করেছেন: 'সাম্যবাদ' বা 'the doctrine of synthesis or equality". ভারতবর্ষের দায়িত্ব হবে এই সমন্বয় কার্যকরী করে তোলা।

পিতা জানকীনাথ বসু মৃত্যুশয্যায় এই খবর পেয়ে সুভাষচন্দ্র দেশে ফেরবার পথে ১৯৩৪, ৩ ডিসেম্বর করাচী পৌঁছান। সেখানে তাঁর পিতার লোকান্তরের সংবাদ পান। ৪ ডিসেম্বর দমদম পৌঁছালে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এলগিন রোডের বাসগৃহে অন্তরীণের আদেশ জারী করা হয়। পারলৌকিক ক্রিয়ার পর ইয়োরোপে ফিরে যাবার অনুমতি পেলে সুভাষচন্দ্র ৮ জানুয়ারি, ১৯৩৫ ইয়োরোপ রওনা হয়ে ২০ জানুয়ারি নেপলস-এ এবং এই মাসের শেষে ভিয়েনায় পৌঁছান। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ শ্বেতজাতির প্রাধান্য বিবৃত ক'রে— বিশেষভাবে 'নর্ডিক' বংশোদ্ভূতদের —অন্যান্য জাতির উপর তাদের স্বাভাবিক কর্তৃত্বের অধিকার সম্পর্কে হিটলার বক্তৃতা দিলে তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র এবং জার্মানীতে জাপানী রাষ্ট্রদূত তীব্র প্রতিবাদ করেন। নাৎসী পার্টির পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎরূপে পরে জানানো হয় যে তাদের নেতার ঐ বিবৃতি ভারত ও জাপান সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

১৯৩৩-৩৫-এ ইয়োরোপ প্রবাসকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের যেমন পরিচিত করিয়ে দেন, ভারতবর্ষের সঙ্গে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন, তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হন। সে-সময়কার সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনফ-এর সঙ্গে রোমের সোভিয়েত দূতাবাসে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৩৫,

জানুয়ারিতে মুসোলিনিকে তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থ উপহার দেন। ইয়োরোপের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র জাতীয় বিপ্লবের ভবিষ্যৎ কৌশল রচনার উপাদানগুলি সংগ্রহ করে নিলেন।

১৯৩০-৩৫-এর মধ্যে বাংলাদেশ, বাংলা কংগ্রেস, দেশবন্ধুর স্মৃতি, সুভাষচন্দ্রকে বারবার আলোড়িত করেছে; তাঁর সর্বভারতীয় দায়িত্ব সম্পাদন এবং আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের অন্তরঙ্গ অনুসরণ সত্ত্বেও। ১৯৩০, জানুয়ারি তিনি বলছেন শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন 'আমরা চাই ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত —সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।...অরবিন্দ নির্বাসনে গেলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ নির্বাসিত হইল না।' সেই দিনই তিনি বলছেন : '...গত ১২ মাসের মধ্যে বাংলায় কম কাজ হয় নাই। তাহার প্রমাণ— বাংলায় দমন নীতির প্রসার। দমন নীতির প্রসার যেখানে সেখানেই বেশি কাজ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি তাঁকে কিভাবে উদ্বেল ক'রে তুলত, তার পরিচয়ও রয়েছে সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন শ্রদ্ধার্পণে। ১৯৩১, ১৯ জুন বারাণসীর এক সভায় বলছেন : 'দেশবন্ধুর জীবন সমন্বয়ের কাব্যস্বরূপ। ...দেশবন্ধু ভারতীয় সাধনার মৌলিক ঐক্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মর্মবাণীর মূর্ত প্রকাশরূপে বিরাজমান ছিলেন।'

ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী শ্রমিক নেতারূপে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামে তাদের সংযোজনের উপর সুভাষচন্দ্র জোর দিয়েছেন। ১৯৩০, ২৫ জানুয়ারি কারাগারে যাবার পূর্বে তিনি বলেছেন : 'শ্রমিকদের জন্য যাহা করা যায়, তাহা ন্যায়পরায়ণতা ও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।' আবার ১৯৩১, ৪ জুলাই বলেছেন : '...শ্রমিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমস্যা।'...

বাংলা কংগ্রেসে বিরোধ তাঁর গভীর মর্মপীড়ার কারণ ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১, ১৮ সেপ্টেম্বর বিরোধ মেটাবার জন্য কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব থেকে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। জেনেভা থেকে ১৯৩৫, ৩০ জানুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদককে একটি সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস দল গঠনের সংকল্প জ্ঞাপন করেন এবং যদি বাংলা কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ বিভেদ চলতে থাকে তবে ১৯৩৬-এর মার্চে অনুষ্ঠিতব্য কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে কোনোপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ অনুচিত হবে বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করেন।

সুইজারল্যান্ডের ভেলেনভ্-এ মনীষী রোমাঁ রোলাঁর 'ওলগা ভিলা' নামক

বাসভবনে ১৯৩৫, ৩ এপ্রিল তাঁর সংগে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এক স্মরণীয় ঘটনা। গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহ এবং ভারতীয় সকল শ্রেণীর মানুষের— পুঁজিপতি, শ্রমিক, জমিদার, কৃষক— ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ সম্পর্কে রোমাঁ-রোলাঁ অবহিত রয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের প্রশ্ন : স্বাধীনতা অর্জনে সত্যাগ্রহ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে এবং সকল শ্রেণীর ভারতীয়দের সমবেত প্রতিরোধ স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে কৃষক-শ্রমিকের সংগ্রামের প্রতিভূ কোনো চরমপন্থী দল আত্মপ্রকাশ করলে মঁসিয়ে রোলাঁর সেক্ষেত্রে কী অভিমত হবে? রোমাঁ-রোলাঁর দ্বিধাহীন উত্তর, বিশ্বের নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশেই তাঁর স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। রোমাঁ-রোলাঁ বলেছেন : "আমি অহিংসার বিরুদ্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাই নাই, কিন্তু আমাদের সমাজজীবনের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু অহিংসা হইতে পারে না, সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।"...তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য : "আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হবে আরো ন্যায়সংগত এবং আরো মানবিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থাকে পুরানো সমাজ-ব্যবস্থার সকল হিংস্রতা থেকে রক্ষা করতে হবে..." : সুভাষচন্দ্রের মনের কথাই যেন ধ্বনিত হল মনীষীর কণ্ঠে।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি গোড়া থেকেই সুভাষচন্দ্রের মমত্ববোধ দেখা গেছে। উত্তর ভারত এবং ভারতের অন্যত্র এই আন্দোলন বিস্তৃত হলেও, বাংলা দেশেই এই আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটি দানা বেঁধেছে। সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনকে কখনো অ্যানার্কিস্ট কিম্বা কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনরূপে দেখেন নাই। তাঁর চোখে বিপ্লবীরা বিশৃংখলা ও ধ্বংসের বাহন কদাপিও ছিলেন না। তাঁদের কর্মপদ্ধতিতে সন্ত্রাস নিহিত থাকলেও লক্ষ্য কখনো সন্ত্রাসবাদ ছিল না, তাঁদের লক্ষ্যের অন্তিম পর্যায় ছিল বিপ্লব এবং বিপ্লবের পর জাতীয় সরকার গঠন। বিপ্লবীদের পথিকৃৎরা অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে বিপ্লবের পাঠ নিয়েছেন, সেখানকার বিপ্লবীদের জীবনী আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিদেশ থেকে ভারতীয় বিপ্লববাদীরা অনুপ্রেরণা নিয়ে এসেছেন, এ কথা বললে ভুল বলা হবে। ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ঔদ্ধত্য, অসম্মানজনক আচরণ, মনুষ্যত্ববোধের লাঞ্ছনা, এদেশে ইংরেজদের প্রতি ভারতীয় যুবশক্তির ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেক করে। ফলে ইংরেজদের আচরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্য যুবশক্তির বিপ্লবীচেতনা জাগ্রত হয়ে অত্যাচারকারীদের প্রতি আঘাত হানবার মানসিকতা

তৈরি করে দেয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র বসু—এঁরা সকলেই বিপ্লবীদের প্রতি দরদী ছিলেন। বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ যোগাযোগ তাঁকে বারবার বিনাবিচারে বন্দী, অন্তরীণ, নির্বাসন ইত্যাদি নানা প্রকার দণ্ড-ভোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর বিপ্লববাদে প্রত্যয় ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠার ফলেই বিপ্লবীদের তিনি আত্মার আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছেন এবং নিজের জীবনেও রূপান্তর ঘটিয়ে পরিপূর্ণ বিপ্লবী সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যে আত্ম-আবিষ্কারের দহন তাঁর জীবনের পনেরো বছর বয়সে শুরু হয়েছিল, তার দুর্দমনীয় বেগবান প্রবাহ আত্ম-আবিষ্কারের নির্নিমেষ সাধনায় তাঁকে একই লক্ষ্যে স্থির রেখেছে। ১৯৩০-৩৫ সাল গভীরভাবে সে-স্বাক্ষর বহন করছে। এই লক্ষ্যসাধনে তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর ব্যবধানও তাই দুস্তর হয়ে গেছে। আর ততদিনে জওহরলাল গান্ধীজির ছায়ায় আড়াল হয়ে গেছেন।

সুভাষ-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের অন্তিম মুহূর্তে ভারতবর্ষের সত্যসন্ধ ইতিহাস-দার্শনিক, আমাদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি আচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ মহাপ্রয়াণ করেছেন। রচনা-বলীর ছয় খণ্ডের পরিকল্পনা, বিষয়-বিন্যাস এবং সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে তাঁর অকৃপণ সহায়তা ও পরামর্শ আমাদের সম্পাদনার কাজ সহজ ও দ্রুততর করেছে। ১৯৭৮-এর ১৯ এপ্রিল প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম খণ্ড সুভাষ-রচনাবলী তিনি নিজে দেশের সুভাষ-অনুরাগী অগণিত পাঠকের হাতে প্রথম তুলে দেন। প্রথম খণ্ডে তাঁর রচিত ভূমিকায় মাত্র কয়েকটি বাক্যে একদিকে যেমন ইংরেজ শাসকদের ভারতত্যাগে সুভাষচন্দ্রের অনন্য ভূমিকা বিবৃত করেছেন, আর-একদিকে এই গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্যোগকে আশীর্বাণী জানিয়ে গেছেন। আমরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং যেহেতু তাঁর উপদেশ অনুসারেই এই গ্রন্থের সামগ্রিক পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়েছে আমরা উপদেষ্টা-মণ্ডলীর সভাপতিরূপে তাঁর নাম অপরিবর্তিত রাখছি।

এই খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ, ভাষণ, বিবৃতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সময়-সীমার মধ্যে সুভাষ-

চন্দ্র যতদিন কারাগারে কিংবা অন্তরীণে জীবনযাপন করেছেন, স্বভাবতই সে-সময় তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ থাকায় এই গ্রন্থে তাঁর সে-সময়কার ভাষণ, অভিভাষণ ইত্যাদি সংকলনের কোনো অবকাশ নেই। পাঠকরা সহজেই সেটা লক্ষ্য করবেন।

এই খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত যেমন, আবার তেমনি নিরুপায়ও বটে। পশ্চিম বাংলায় দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্যুৎ-সংকট, দ্রুত গ্রন্থ মুদ্রণে এবং প্রকাশনে দুরন্ত বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুরতিক্রম্য সংকটের জন্য পাঠকবর্গ আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে সহৃদয়তার সংগে বিচার করবেন, এই আশা করি।

বর্তমান খণ্ডে সুভাষচন্দ্রের দুখানি পত্র প্রকাশের সম্মতি দেওয়ায় শ্রীঅমিয়নাথ বসুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রথম দুই খণ্ড সংকলনে যাঁরা আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশকালেও সমভাবে তাঁদের আনুকূল্য পেয়েছি। উপরন্তু, এবার শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশান্ত বসু, শ্রীদেবদাস জোয়ারদার, শ্রীশিবব্রত ঘোষ ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছেন। অন্যান্য খণ্ডের মতো বর্তমান খণ্ড প্রকাশেও শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ, শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, শ্রীবিজয় নাগ ও শ্রীশেখর দাশগুপ্তের ঐকান্তিকতার উল্লেখ প্রয়োজন। এ-ছাড়াও যে-সকল শুভানুধ্যায়ী বন্ধু অন্তরাল থেকে আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রন্থ প্রকাশে অনিবার্য কারণে বিলম্ব সত্ত্বেও রচনাবলীর গ্রাহক ও পাঠকবৃন্দ যে মমত্ববোধ দিয়ে এই খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করেছেন, সেজন্য তাঁদের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি

দোল পূর্ণিমা, ১৩৮৬ সুনীল দাস

১ মার্চ ১৯৮০

বিষয়-সূচী

সং যো জ ন

চিত্র-সূচী

আলোকচিত্র

চিত্র ১-৩ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ও চিত্র ৪-৬ ড. অশোকনাথ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুভাষ-রচনাবলী

জানুয়ারি ১৯৩০ - ডিসেম্বর ১৯৩৫

বিবৃতি

১ জানুয়ারি ১৯৩০ নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত বিবৃতি।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রকাশম, আমি এবং আরো অনেক সদস্যকে বাদ দিবার মতলব করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটিতে আমাদের স্থান দেওয়া হয় নাই। ঐরূপ না করিয়া যদি আমাদের সহিত পরামর্শ করা হইত, তাহা হইলে আমরা স্বেচ্ছায় সরিয়া দাঁড়াইতাম। কিন্তু আমাদের বিবৃতির কারণ এই যে, প্রবীণ সদস্যগণ মতলব করিয়া আমাদিগকে ও এই সভার বহু সদস্যকে বাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরে শ্রীযুক্ত প্রকাশম্ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। গতবৎসরে শ্রীযুক্ত প্রকাশম্, শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলাম। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত শাম্বমূর্তি ও পণ্ডিত জওহরলালও ছিলেন। আমার মনে হয় আমরা ভালো কাজই করিয়াছিলাম, যদিও আমাদের মধ্যে চার জন সদস্য স্বাধীনতাবাদের পক্ষপাতী ছিলেন ও অপর সদস্যগণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর সর্বদল সম্মেলনের পর আমি ও পণ্ডিত জওহরলাল যে ওয়ার্কিং কমিটির সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহার কারণ বয়োবৃদ্ধদের সহিত আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছিল। তৎপরে আমাদিগকে পুনরায় ওয়ার্কিং কমিটিতে কার্য করিতে বলা হইলে আমরা মতের অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও গত নভেম্বর মাসের শেষভাগে এলাহাবাদে পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করি। নেতাদিগের দিল্লী ইস্তাহার প্রচারিত হইলে পণ্ডিত জওহরলাল ও আমি পদত্যাগ করি কিন্তু দেশের কাজের অজুহাত দেখাইয়া আমাদিগকে পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করিতে বলা হয়। দুঃখের বিষয় যে, এই অল্পকালের মধ্যেই দেশের কাজের প্রয়োজনে ওয়ার্কিং কমিটি হইতে আমাকে ও শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারকে বাদ দেওয়া হইল।

এক্ষণে দেখিতেছি যে, আমাদের সভাপতি তাঁহার পুরাতন স্বাধীনতাবাদী বন্ধুদের ত্যাগ করিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনবাদীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী একদলের দশজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন এবং ঐ নামের পরিবর্তে যে-সকল নূতন নাম-সম্বলিত সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত হয় তাহা সভাপতি মহাশয় বাতিল করিয়াছেন। সভাপতির এই কার্য কংগ্রেসের বিধির ২৪ ধারার বিরোধী হইয়াছে।

উক্ত ধারায় আছে— নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শেষ হইলে পর দশ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া লইবেন। ইঁহারাই ওয়ার্কিং কমিটি লইবেন। এই সম্পর্কে অবশ্য চিরাচরিত রীতি অবলম্বিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অবৈধ কার্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আর এইরূপ কোনো রীতি নাই বলিলেই হয়। আমার মনে আছে কয়েকবৎসর পূর্বে নাগপুরের নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় আমার ও আরো কয়েকজনের নাম সংশোধন প্রস্তাবে উক্ত হয়, কিন্তু সংশোধন প্রস্তাব পরাভূত হইয়া যায়। আমি শুনিয়াছি, গৌহাটি কংগ্রেসে দশ-এর অধিক নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল এবং ভোট গৃহীত হইয়াছিল। আমি যতদূর জানি তাহাতে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচন পরস্পরের মতের মিলেই হইয়া থাকে এবং কংগ্রেস কমিটির সদস্যদিগের ভোট লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ বৈধক্ষেত্রে চিরাচরিত রীতি চলিতে পারে না। সর্বদলের মত না লইয়া যদি এইরূপ কার্য করা হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস জাতির প্রতিষ্ঠানরূপে কিরূপে পরিগণিত হইবে ?

ফ্রী প্রেসের সাক্ষাৎকার

নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভা হইতে অপর সদস্যগণসহ বাহির হইয়া যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে ফ্রীপ্রেসের প্রতিনিধির জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য।

প্রথমদিন (অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইলে, বাংলা হইতে নব-নির্বাচিত সদস্যগণকে তাঁহাদের অধিকার পরিচালনা হইতে বিচ্যুত করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে আমি আপীল করিতে চাহি। আমার বক্তব্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যথানিয়মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সদস্য নির্বাচন করিয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য তালিকায় শূন্যপদ পূরণসহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অপর সকল কার্যই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত সদস্য-

গণও সেইরূপ কেন বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবে না, আমি তাহার সংগত কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না। আমাদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে আমাদের দলের উপস্থাপিত প্রত্যেক প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব (সভা মুলতুবীর প্রস্তাব সহ) যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রুলিং দিয়া বাতিল করিয়া দিলেন, তখন প্রতিবাদে আমাদের বাহির হইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমার মতন অবস্থায় সামান্যমাত্র আত্মসম্মানবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই ঠিক এইরূপ করিতেন। নবনির্বাচিত বৈধ সদস্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয় নির্বাচন সমিতিতে আমাদের যোগদান করা যে উচিত ছিল, ইহা কল্পনারও অতীত। আমাদের সভাত্যাগের ফল হইল পরদিন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় আপস হয় এবং মি. জে. এম. সেনগুপ্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির ও বিষয় নির্বাচন সমিতির সদস্যগণ নবনির্বাচিত সদস্যগণকে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হন। তখন আমরা একযোগে সভায় প্রবেশ করি।

দ্বিতীয়বার সভাত্যাগ

শেষদিন (১ জানুয়ারি) আবার আমাদিগকে প্রতিবাদস্বরূপ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয়। এবারকার প্রতিবাদ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নূতন সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। আমরা যখন সভায় আসি, তখন কেহই জানিতাম না যে, অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের আবার সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আমি জানিলাম মি. জে. এম. সেনগুপ্ত এই বলিয়া কলঙ্কারোপ করিয়াছেন যে, আমরা একটি নূতন দল করিবার উদ্দেশ্যেই ছল করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। এইরূপ কলঙ্কারোপ করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, অপরের উপর উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া তিনি কেবল নিজেকে বিবেচক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১ জানুয়ারি তারিখের সভার ঘটনাবলী "উটের পিঠে শেষ কুটা" সম্বন্ধে যে ইংরেজী প্রবাদ আছে, সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম হইতেই আমাদের দলের সদস্যগণের প্রতি সভাপতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ওয়ার্কিং

কমিটি আমাদিগকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, প্রকৃতপক্ষে সভাপতিকে সমর্থন করিয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি আমরা সকলেই বিক্ষুব্ধচিত্তে ছিলাম। যখন দেখিলাম, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী ও অপর কয়েকজন নেতা একমতাবলম্বী একটি দল গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং মনোভাবের অসামঞ্জস্যের যুক্তি বলে ওয়ার্কিং কমিটির পুরাতন ও পরীক্ষিত সদস্যগণকে বাদ দিবার সংকল্প করিয়াছেন, তখন উহা চরমে উঠিল। এই অসাধারণ পদ্ধতি কংগ্রেসের প্রচলিত নিয়মাবলী পদ্ধতির বিরোধী।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদের জন্য ১০ জনের নামের তালিকা সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উক্ত তালিকায় অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত প্রকাশম ও আমার নাম বাদ ছিল এবং ড. পট্টভি ও শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। অথচ ড. পট্টভির বিরুদ্ধে সভায় প্রবল মনোভাব বিদ্যমান ছিল এবং শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম সেদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতায় গোঁড়া ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা তালিকা উপস্থাপিত করিয়া নেতৃগণ তাঁহার প্রভাবের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া আমরা মনে করিলাম। এইরূপ অসাধারণ পন্থা অবলম্বনের পূর্বে আমাদের ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সহযোগীগণ আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া শিষ্টাচার পর্যন্ত প্রদর্শন করিলেন না, ইহাই আমাদের নিকট বিষম বিরক্তিকর হইল। তাঁহারা যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব আমরা সরিয়া যাইতে সম্মত হইতাম।

মূল তালিকা পাস করাইবার কৌশল

মহাত্মা গান্ধী যখন মূল তালিকাটি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি সংশোধন প্রস্তাবরূপে অপর কয়েকটি নামের উল্লেখ করেন। পাছে সংশোধন প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, সেইজন্য সকল নাম সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ এড়াইবার জন্য এই সময় নেতৃগণ বিষম চেষ্টা করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ প্রস্তাব করেন যে, অতিরিক্ত নামসমূহ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণের পূর্বে মহাত্মাজীর তালিকা সম্বন্ধে প্রথমে সভার অভিমত গ্রহণ করা হউক। সংশোধন প্রস্তাবসমূহ রুদ্ধ করিয়া মহাত্মাজীর নাম ও প্রভাবের দ্বারা মূল তালিকা সমগ্রভাবে যাহাতে গৃহীত হয়, তজ্জন্য ইহা একটা কৌশল।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্তি এইরূপ গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী ও নিয়মবিগর্হিত পদ্ধতির প্রতিবাদ করেন। তৎপর পণ্ডিত মতিলাল উঠিয়া বলিলেন, মি. বাজাজের মত কিম্বা মি. সত্যমূর্তির মত অনুসরণ করা হইবে সে সম্বন্ধেই বর্তমানে ভোট গ্রহণ করা হইবে। মি. সত্যমূর্তি পণ্ডিতজীর এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, ইহা বিধিবিরুদ্ধ ও গণতন্ত্রনীতি-বিরোধী। কারণ কার্যপদ্ধতির বিষয় সম্বন্ধে ভোট লওয়া সমীচীন নহে, যেহেতু উহা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠের প্রশ্নের বহু উপরে অবস্থিত। ইহাতে সভাপতি বলেন যে ইহাতে বিধিবিরুদ্ধ ও গণতন্ত্রনীতি-বিরুদ্ধ কোনো কিছুই নাই। এই বলিয়া তিনি ভোট লইতে আরম্ভ করিলেন। সভাপতির এই রুলিং অন্যায় ও অবৈধ এবং এ ক্ষেত্রে আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। কিন্তু আমরা মনে করিয়াছিলাম যেহেতু সভা আমাদের অনুকূলে মত প্রকাশ করিতে পারিত, সেই হেতু আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য সভাকে প্রথমে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রস্তাবের পক্ষে ৭২ ও বিপক্ষে ৬২ ভোট গৃহীত হয় এবং তাহাতেই অপর কোনো সংশোধন প্রস্তাবের পথ রুদ্ধ হয়।

যখন ভোটের ফল ঘোষিত হইল তখন আর কোনোরূপ আপীলের আশা রহিল না। তখন সভাপতির ও নেতৃবর্গের কার্যের ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমরা বাহির হইয়া আসি। এই সময় পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করেন যে, তিনি মনোনয়ন ও ব্যালট প্রদান করিতে অনুমতি দিবেন। এই ঘোষণা সভাপতির আর-একটি অন্যায় কার্য। তাঁহার প্রথম ভুল সর্বজনগ্রাহ্য কার্যপদ্ধতিকে ভোট দেওয়া; তাঁহার দ্বিতীয় ভুল সভায় ভোটের ফলাফল ঘোষণা করার পর সভার মতকে অবহেলা করা। স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁহার প্রথম ভুলকে চাপা দেওয়ার জন্যই পরে এইরূপ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি অত্যন্ত দেরিতে তাঁহার ভুল শোধরাইতে চাহিয়াছিলেন, কারণ এই সময় আমরা বাহিরে চলিয়া আসিয়াছি। সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন সে তাঁহার রুলিং-এর অপেক্ষা না করিয়াই আমরা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসি। আমি এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। পক্ষান্তরে যে পর্যন্ত কোনোপ্রকার ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা ছিল সে পর্যন্ত আমরা আমাদের আসন পরিত্যাগ করি নাই। যখন আমরা দেখিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটি বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতে ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনো আশা নাই, তখন আমাদের

বাহির হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাহির হইয়া আসার পর ভিন্ন দল গঠনের কথা উঠে। তৎপরে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিশেষত নেতৃবর্গ একমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে নিয়া সংঘবদ্ধ হইয়াছেন এই কথা ভাবিয়া আমরা অনুভব করিয়াছিলাম যে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার একমাত্র পন্থা পৃথক দল গঠন। ইহাই আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। উপরে আমি যে-সমস্ত কথা বলিলাম শীঘ্রই সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব।

৭ জানুয়ারি ১৯৩০

বাঙালীর কর্তব্য

৭ জানুয়ারি ১৯৩০ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে লাহোর-কংগ্রেস প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য আহূত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

লাহোরে এবার পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অন্তত দুইটি বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি। দেশের সর্বত্র স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা এবং বন্দিবিলায় আইন অমান্য করা— এই দুই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে না। আগামী ১২ মাসের মধ্যে আমরা যদি এতটুকুও করিতে পারি তাহা হইলে নিতান্ত কম কাজ হইবে না।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্তব্য

জানি না, আর বেশিদিন এভাবে জনসভায় বক্তৃতা করিতে পারিব কি না। নানা দিক দিয়াই দেশের উপর দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। এ সময়ে আমাদের কর্তব্য কী— তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত, লাহোর-কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সকল কথা জ্ঞাত করা দরকার। এই অবস্থায় আমার বক্তৃতা একটু দীর্ঘ হইবে। আমি আশা করি, আপনারা ধৈর্য ধারণ করিয়া আমার সকল কথা শ্রবণ করিবেন।

আমার মনে হয় এবার আমাদের জাতীয় সাধনা— বাংলার সাধনা ও স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে। আমরা এতদিন যে-সকল কথা নির্ভীকভাবে

বলিতে পারি নাই— আজকাল তাহা অকুণ্ঠভাবে বলিতেছি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে মনে হয়, দেশে একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। ইহাতে বেশিদিন লাগে নাই। ৪৪।৪৫ বৎসর হইল জাতীয় মহাসম্মিলনীর জন্ম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন হইয়াছে। অন্যান্য দেশে বোধ হয় ইহাতে দুই-তিন শত বৎসর লাগিত।

প্রথম যখন কংগ্রেসের জন্ম হয় তখন মডারেটগণ তাহাতে যোগদান করিতেন। সেখানে সর্বপ্রথমেই রাজভক্তি প্রকাশক প্রস্তাব পাস হইত। তাঁহাদের একটা আশংকা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদিগকে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করিবেন। এইরূপে ১০।১৫ বৎসর কাটিয়া গেল। দেশে একটা জাগরণ দেখা দিল। অনেক বিশিষ্ট ভারতবাসী বিদেশে গিয়া ভারতের বাণী প্রচার করিতে শুরু করিলেন। ইহাতে দেখা গেল যে, বিদেশীর চক্ষে ভারতবাসীর সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে ফিরিয়া যখন তাহারা সেই সংবাদ প্রচার করিলেন তখন ভারতবাসীর আত্ম-প্রত্যয় এবং নিজেদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব প্রবল হইল।

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব

যুবকেরা দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিরূপে জাপান রুশকে পরাজিত করিয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার করিল— তাহা দেখিয়া ভারতীয় যুবকেরা হৃদয়ে প্রেরণা পাইলেন। অরবিন্দ তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' কাগজে একদিন লিখিলেন— আমরা চাই ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত— সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। বাংলাদেশ ইহা শুনিল; কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিল না। ক্রমশ এই আদর্শ বিস্তারলাভ করিল। 'বন্দেমাতরম্' বন্ধ হইয়া গেল। অরবিন্দ নির্বাসনে গেলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ নির্বাসিত হইল না।

সুরাট-কংগ্রেস

তার পরের স্মরণীয় ঘটনা সুরাট-কংগ্রেস। দুই দল সৃষ্টি হইয়া গেল। একদল চাহিলেন স্বায়ত্তশাসন; আর-একদল চাহিলেন ঔপনিবেশিক শাসন। সেখানেও দলাদলি হইল, সভা ত্যাগ হইল, তবে সবটা অহিংসভাবে সম্পন্ন হয় নাই। জাতীয় দলে যাঁহারা তখন ছিলেন— তাঁহারা ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন। কয়েকবৎসর তাঁহাদিগকে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল।

গোপনে গোপনে স্বাধীন ভারতের ইস্তাহার বিলি হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্তন আসিতে খুব বেশি দেরি হইল না।

সকলেই একটা মীমাংসার প্রয়োজন বোধ করিল। ১৯১৭ সালে তাহা কতকটা সম্ভবপর হইল। ইহা পূর্ণ হইল ১৯২০ সালে। তখন উভয় দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেসের ক্রীডের একটু পরিবর্তন করিতে হইল। কংগ্রেসের লক্ষ্য "স্বরাজ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চিরদিনের জন্য এই ব্যবস্থা হইল না— সাময়িকভাবে সকল দলের মিলনের জন্য এই ব্যবস্থা হইল। স্বাধীনতার সুর কিন্তু নীরব হইল না।

১৯২০ সালের পরও কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইত, কিন্তু ভোটের বলে তাহা অগ্রাহ্য হইত। ১৯২২ সালে মৌলানা হজরত মোহানি এই স্বাধীনতার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সরকারপক্ষ তাঁহার বক্তৃতায় রাজদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া মামলা করেন। ফলে তাঁহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। ইহার পর সাত বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন হইয়াছে দেখুন। এখন আর স্বাধীনতার কথায় রাজদ্রোহ হয় না।

মাদ্রাজ-কংগ্রেস

তারপর মাদ্রাজ-কংগ্রেসে একরূপ বিনা বাধায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। ইহাকে আদর্শবাদী দলের জয় ছাড়া আর কী বলিব? এই প্রস্তাবের ফলে দেশে এবং বিদেশে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হইল। প্রবাসী ভারতবাসীরা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এখন আর বিদেশীরা ভারত-বাসীকে ক্রীতদাসের জাতি মনে করেন না।

স্বাধীন জাতি মাত্রই অপরের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। অন্য জাতিকে স্বাধীন হইতে দেখিলে তাঁহারা আনন্দিত হন। ভারতবাসীরা তাই বার্লিনে, জাপানে আয়ারল্যাণ্ডে সম্মান ও সহানুভূতি পাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিউইয়র্কে, লণ্ডনে এবং টোকিয়োতে কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতবাসীরা কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন না— বিদেশীরা প্রায়ই এ কথা জিজ্ঞাসা করেন। এখানে লোকমান্য তিলকের জীবনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। ১৯১৯ সালে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তখন চরম-পন্থী নেতা বলিয়া লোকমান্য পরিচিত ছিলেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি বলেন—১৫ বৎসরের মধ্যে "হোম রুল" পাইলেই ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইবে। ইংরাজ ছাত্রেরা তো এ কথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। তাহারা বলিল যে, ইনিই কি ভারতের চরমপন্থী নেতা।

কলিকাতা-কংগ্রেস

সে যাহাই হউক, স্বাধীনতা প্রস্তাব পাসের মূল্য আছে—এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতা-কংগ্রেসে আবার আমাদের আদর্শ একটু খাটো করিতে হইয়াছিল। আমরা অবশ্য কয়েকজনে মিলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে ঠিক মূল প্রস্তাবটি পাস হয় নাই। প্রথমে দুই বৎসর অপেক্ষা করার কথা হইয়াছিল। আমাদের প্রতিবাদে তাহা একবৎসরে পরিণত হয়। প্রকারান্তরে আমাদেরই জয় হইয়াছিল—এ কথা আমি আজ জোর দিয়া বলিতেছি। এবার যে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হইল—উহা আমাদের সেই চেষ্টার ফল। এখানে একটি কথা বলিতেছি। সব সময় ভোটের জয়ে জয় হয় না। আপনারা লেনিনের কথা শুনিয়াছেন। তিনি একবার কোনো সভার সভাপতিরূপে ভোটের ফলাফল প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—কম ভোট যাহারা পাইয়াছে তাহাদেরই জয় হইয়াছে। কারণ তাঁহার মতে সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষা সেই সংখ্যায় লঘিষ্ঠ দলই প্রকাশ করিয়াছেন।

দুইটি প্রধান কর্তব্য

সে যাহাই হউক, এখন কার্যতালিকার কথা। এ সম্বন্ধে অনেক কথাই প্রচারিত হইয়াছে। মতভেদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই মতভেদ কার্যক্ষেত্রে নয়। কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্যতালিকা অনুসারে কাজ করিতে হইবে। গতবৎসর আমরা মহাত্মাজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনো গোলযোগ হয় নাই। গত ১২ মাসের মধ্যে বাংলায় কাজ কম হয় নাই। তাহার প্রমাণ—বাংলায় দমন নীতির প্রসার। দমন নীতির প্রসার যেখানে বেশি সেখানেই কাজ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গত বৎসর বাংলা ও পাঞ্জাবের ন্যায় আর কোনো প্রদেশেই এমন ভীষণভাবে সরকারী নির্যাতন হয় নাই। তবে অনেকে বলিতে পারেন, আরো বেশি কাজ হওয়া উচিত ছিল। তাহা অস্বীকার করি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা অন্তরের সহিত

চেষ্টা করিয়াছি। এবারেও প্রাণপণে কংগ্রেসের কাজ করিতে চেষ্টা করিব। আসল কাজে দলাদলি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

দুইটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। স্বাধীনতার বাণী ঘরে ঘরে দেশের সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। যাহারা এখনো ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষপাতী তাহাদিগকে আমাদের পথে আনিতে হইবে। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে জাগাইতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের অভীষ্ট লাভ হইবেই হইবে।

গোল টেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠক মানে সন্ধিসভা। সেখানে দুই পক্ষ সন্ধি করিবার ক্ষমতা লইয়া হাজির হইবেন। এই সভার সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে যে বৈঠকের কথা উঠিয়াছে তাহাতে এ-সমস্ত কিছুই নাই। বড়োলাট কিম্বা ভারত-সচিব তাই "গোলটেবিল বৈঠক" এই কথাটি উচ্চারণ করেন নাই। তথাপি ভারতবাসীর মধ্যে কয়েক ব্যক্তি ইহাকে গোল-টেবিল বৈঠক বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন। ইহাই বড়ো দুঃখের বিষয়। এই ফাঁদে পা দেওয়া বড়োই বিপজ্জনক।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন— কাল যদি "ডোমিনিয়ন স্টেটাস" পান তাহা হইলে আপনি কী করিবেন? আমি এ-কথার প্রকৃত অর্থ বুঝি না।

আমার মতে পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেও পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আমাদের করিতে হইবে— পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। একদিন ইহাই আমাদিগকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথ দেখাইবে।

তাই আমি বলিতেছি— দেশের সর্বত্র, ঘরে ঘরে পূর্ণ স্বাধীনতার বার্তা প্রেরণ করিতে হইবে।

বন্দীবিলায় আইন অমান্য

বন্দীবিলায় আইন অমান্য করিতে হইবে। তথায় কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ন্যায় একজন সামান্য কর্মী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় এই আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে অর্থ ও কর্মী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

মেদিনীপুরে শ্রীযুক্ত শাসমলের চেষ্টায় একবার এই আন্দোলন সার্থক হইয়াছিল। এবার পুনরায় যশোহরে তাহা সার্থক করিতে হইবে। বারদোলীর ন্যায় এই বন্দবিলা যাহাতে ভারতের আদর্শস্থল হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নাই। আগামী ১২ মাসের মধ্যে যদি আমরা এতটুকু করিতে পারি তাহা হইলে কাজ নিতান্ত কম হইবে না।

তবে নির্যাতন আসিবে— আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। শুনিতেছি, আগামী ২৬ জানুয়ারি তারিখেই কর্তৃপক্ষ একটা বিপ্লবের আশঙ্কা করিতেছেন। তজ্জন্য নাকি বিরাট আয়োজন চলিতেছে। ইহাতে আমরা ভীত হইব না— নির্যাতনে আমাদের আন্দোলন আরো শক্তিশালী হইবে। আমি তাই সকলের নিকট আবেদন করিতেছি— এ-সময়ে দলাদলি ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ুন। যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘর্ষ, যেখানে আসল কর্মক্ষেত্র— সেখানে আমরা এক এবং অভিন্ন।

বন্দবিলা সত্যাগ্রহ : একটি আবেদন

যশোহর জিলায় বন্দবিলাতে ইউনিয়নবোর্ড স্থাপনের চেষ্টার বিরুদ্ধে গত ছয় মাস যাবৎ যে সংগ্রাম চলিতেছে সে সম্বন্ধে জনসাধারণ অবগত আছেন। এই সংগ্রাম প্রথম আরম্ভ করেন বন্দবিলা কংগ্রেস কমিটি ও তাহার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র রায় এই সংগ্রামের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। গত জুলাই মাসে যশোহরে যখন জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয় তখন সেখানে ঐ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল এবং এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত কংগ্রেস হইতে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয় এবং তখন হইতেই যশোহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যশোহর কংগ্রেস কমিটি ও বন্দবিলা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি আমাদিগকে এই ব্যাপারের ভারগ্রহণ করিতে বলেন। তাহাতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেন ও তাহাদের রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। ঐ কমিটি ঐ-সমস্তস্থানে গমন করেন এবং বি. পি. সি. সি.-র এই সংগ্রাম হাতে লওয়ার স্বপক্ষে রিপোর্ট প্রদান করেন। তৎপর আমি নিজে বন্দবিলায় যাই এবং ঐ সংগ্রাম হাতে লওয়া উচিত বলিয়া বিশ্বাস করি।

ঐ-সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি ঐ সংগ্রাম হাতে লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ট্যাক্স বৃদ্ধি

১৯১৯ সালের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী সরকার যে-কোনো জিলায় অথবা জিলার অংশে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পূর্বে যে-সমস্ত জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে সে-সমস্ত স্থানে গবর্নমেন্ট ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন নাই। জনসাধারণের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধী হওয়ার বহু কারণ আছে— তন্মধ্যে ট্যাক্স বৃদ্ধি অন্যতম। ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য যশোহরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দবিলাতে জনসাধারণ ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে, এবং জোরের সহিত আইন অমান্য নীতি প্রচলন করে। গবর্নমেন্ট দমন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং আমাদের বহু কর্মী ও গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। যাহারা ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে তাহাদের মালপত্র ক্রোক করা হইতেছে এবং মাঝে মাঝে গোপনে বিক্রয় করা হইতেছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট টাকা মূল্যের গোরু নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে! যাহা হউক, গ্রামবাসীগণ অটল। তাহারা এই আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার বিশেষ নিবেদন এই যে সমস্ত দলাদলির কথা ভুলিয়া গিয়া জনসাধারণ এই সংগ্রামকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সাহায্য করুন। এই কাজের জন্য লোক ও অর্থের প্রয়োজন।

৮ জানুয়ারি ১৯৩০

কংগ্রেস কার্যতালিকা

কয়েকটি কাজের প্রস্তাব।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি এক্ষণে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং, উক্ত লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য অবিলম্বে কার্য আরম্ভ করা আমাদের কর্তব্য। ইহার জন্য সমগ্র প্রদেশে প্রবল আন্দোলন ও বাংলার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেখানে অবস্থা অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইখানেই আইন অমান্য আরম্ভ করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আকারে যশোহর জেলায় আইন অমান্য ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বন্ধ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে। আমি জানি বাংলায় এমন আরো অনেক জেলা আছে, যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড জনপ্রিয় নহে। এবং তথাকার অধিবাসীরা ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তুলিয়া দিতে চাহেন। আমি ঐ সকল জেলাস্থিত কংগ্রেস কমিটিসমূহকে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিয়া তাহাদের এলাকার মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত ডায়মন্ডহারবার মহকুমায় বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইবার সময় কোন্ কোন্ কাজ করা উচিত, সে সম্বন্ধে আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা এবং কমিটির নিকট এই ত্রিবিধ কার্যতালিকা উপস্থিত করা তাহাদের কর্তব্য—

১. গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটিসমূহ একটি করিয়া জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করিবেন। এই বাহিনী প্রাণ রক্ষার কার্যভার গ্রহণ করিবে এবং ইহার ফলে গ্রামবাসীগণকে পুলিশ বা গ্রাম্য চৌকিদারগণের উপর আদৌ নির্ভর করিতে হইবে না।

২. গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটিসমূহ গ্রামবাসীগণকে আদালতে না গিয়া কংগ্রেস

কমিটির মারফতে সালিশীর দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিবে।

৩. গ্রাম্য কংগ্রেস কমিটিসমূহ ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন চালাইবেন এবং সেইসঙ্গে স্বদেশী শিল্পব্যবসায়ে উৎসাহ দানেও সাহায্য করিয়া গ্রামবাসীগণকে অর্থনীতির দিক্ দিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করিবেন।

আমি এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন জেলার কর্মিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়া এই কার্যতালিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই মর্মে তাঁহারা আরো কিছু যদি প্রস্তাব করিতে চাহেন, তাহাও জানাইতে অনুরোধ করিতেছি।

৯ জানুয়ারি ১৯৩০

কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি

৯ জানুয়ারি ১৯৩০ কংগ্রেসের কার্য পদ্ধতি ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য হরিশ পার্কে এক বিরাট জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো বিষয়ে একবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে তাহা পালন করা একান্ত কর্তব্য। আজ যে ভারতীয় জাতীয় মহসভায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ইহাতে দেশের যুবক সম্প্রদায়ের জয় সূচিত হইতেছে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের প্রস্তাবক ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যুবকদল কংগ্রেসকে স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে স্বাধীনতা সম্পর্কীয় কার্য-পদ্ধতিকে কাজে পরিণত করিতে হইবে। দলাদলির কথা বিস্মৃত হইয়া সকলকেই এইদিকে অবহিত হইতে হইবে। প্রত্যেকেরই এই কার্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে হইবে। সকলের নিকটেই ইহা সমান। আমাদের সম্মুখে কাজ রহিয়াছে। আমাদের এখন কর্তব্য হাজারে হাজারে বাহির হইয়া আসিয়া গ্রামে গিয়া এক বৎসর পর্যন্ত স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করা। তাহাতেও যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, আগামী বৎসর করাচীতে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তখন আবার আমরা কার্যপদ্ধতি

পরিবর্তনের প্রস্তাব করিব। প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইজন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্ত কমিটি গ্রামরক্ষা দল সালিসী বোর্ড ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিসে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। আমরা এই কার্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে পারিলে প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীবৃন্দই আর্থিক হিসাবে আত্মনির্ভরশীল হইবে। আমাদের চরম লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের মুখ্য কাজ। বর্তমান বর্ষে স্বাধীনতার বাণী প্রচার এবং আইন অমান্যের জন্য দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বন্দাবিলায় আইন অমান্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের বাণী সর্বত্র যাহাতে প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি পাঁচ হাজার বক্তা চাই। তাঁহারা কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিয়া জনসাধারণের মনে একটা আত্মবোধ জন্মাইয়া দিবেন।

ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী প্রচার

হাওড়া ক্ষীরেরতলা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

এখন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধের বিষয় আছে তাহার উপর জোর না দিয়া যে-সমস্ত বিষয়ে আমরা একমত, আসুন, তাহার উপর আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করি। বাংলার প্রতি গৃহে স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়া নিবার জন্য কেন্দ্রীভূত প্রচারকার্য, গ্রামে জাতীয় সৈনিক দল গঠন, আদালতের দ্বারস্থ না হইয়া সালিসী দ্বারা বিরোধ মিটানো, বিলাতী দ্রব্য— বিশেষত কাপড় ও লবণ বর্জন করা, যে স্থানে সম্ভব আইন অমান্য করা— এই-সমস্ত বিষয়ে কর্মীদিগের মধ্যে কোনোপ্রকার মতবিরোধ থাকিতে পারে না। চলুন, আমরা এ-সমস্ত বিষয়ে সর্বান্তঃকরণে আমাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করি। তাহা হইলেই এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা নিশ্চয় আমাদের ঈপ্সিত উদ্দেশ্যের সন্নিকটবর্তী হইব।

লাহোর-কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা বড়ো কাজ হইয়াছে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা অবধি গত ৪৪ বৎসর যাবৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণের যে আন্তরিক মনোভাব মূর্ত

করিবার চেষ্টা চলিতেছিল লাহোর-কংগ্রেসে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই সাফল্যলাভের কারণ লাহোর-কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মতো নেতাকে উক্ত আদর্শের সমর্থকরূপে পাইয়াছিল এবং ঐ আদর্শ অবিলম্বে গ্রহণের জন্য কংগ্রেস মহলে আদৌ মতদ্বৈধ ছিল না। দেশে মনোভাবের যে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে এবং শীঘ্রই যে জীবনের সকল স্তরে উহা প্রকাশ পাইবে, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

গবর্ণমেণ্ট যদি কোনো বাড়িতে লবণ তৈয়ারি করিতে না দেয়, তাহা আইন অমান্য করিবার একটা ভালো সুযোগ প্রদান করিবে। বাড়িতে লবণ তৈয়ারির যে নিষেধাত্মক আইন এদেশে প্রচলিত আছে, পৃথিবীর কোথাও তাহার তুলনা নাই। যতশীঘ্র ইহা বিলোপ-সাধন করিবার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

জনসাধারণের সংগ্রামমূলক মনোভাব উদ্বুদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করা। যখনই দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার হইবে, তখনই তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহার মূলোচ্ছেদ জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একমাত্র এই উপায়েই জনসাধারণের জড়তা দূর করিতে পারা যায় এবং অবিচার, অপমান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তোলা যায়; এইরূপ সংগ্রামের ফলেই জনসাধারণের চরিত্র গঠিত হইবে ও নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে।

১১ জানুয়ারি ১৯৩০

নিবেদন

আজ আমরা অনেকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়া কারাগারের দিকে চলিতেছি। এ অবস্থায় যশোহর জিলা ও বন্দবিলার কথা স্বতই আমাদের মনে উদয় হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, যে-সংকল্প লইয়া বন্দবিলাবাসীগণ প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জয়যুক্ত হন। ইতিপূর্বে মেদিনীপুর জেলাবাসী ঠিক এইরকম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হইয়াছিলেন এবং সরকার বাহাদুর বাধ্য হইয়া মেদিনীপুর জেলা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া লইয়াছিলেন। এখন বাংলার অন্যান্য জেলায় যশোহর জেলার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বন্দবিলাবাসীদের সাধনা সার্থক হইবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বন্দবিলাবাসী পূর্বের ন্যায় নির্ভীকভাবে সমস্ত ত্যাগ ও কষ্ট মস্তকে বরণ করিয়া কাজ করিয়া যান, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ। যশোহর জেলাবাসীদের প্রতি আমার বিশেষ নিবেদন এই যে, তাঁহারা বন্দবিলাবাসীদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত বন্দবিলাবাসী কী করিতে পারেন? পরিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন, বন্দবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমস্ত বাংলায় তথা ভারতবর্ষে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

আলিপুর কোর্ট ২৩ জানুয়ারি ১৯৩০

পূর্ণ স্বরাজ্য দিবস পালন

কলিকাতা নাগরিকগণের প্রতি নিবেদন।

২৬ জানুয়ারি ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবসোৎসব ঘোষিত হইবে। ঐ তারিখের পূর্বেই যে আমাদের প্রতি দণ্ডাদেশ হইল ইহা আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। সম্ভবত সরকার মনে করিয়াছেন যে, আমাদের ২৬ জানুয়ারির পূর্বে কারাগারে নিক্ষেপ করিলে স্বাধীনতা দিবসোৎসব সুসম্পন্ন হইবে না।

আমি কলিকাতার নাগরিকদিগকে নিবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে তাঁহারা যে বিরাট নগরীর অধিবাসী সেই নগরীর মহিমা বজায় রাখিয়া যেন তাঁহারা ঐ উৎসব সম্পন্ন করেন। সে-সময় আমরা থাকিব না সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। বরং ইহাতে আমাদের নাগরিকগণ আরো উদ্দীপিত হইয়া উৎসব সফল করিবার চেষ্টা করিবেন।

২৫ জানুয়ারি ১৯৩০

জনসাধারণের প্রতি আহ্বান

কারাগারে প্রবেশের পূর্বে বাংলার জনসাধারণের প্রতি প্রেরিত বাণী।

বাংলার কংগ্রেস কর্মীদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন দলবদ্ধ হইয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কংগ্রেসের দলে বর্তমানে যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে, ঐগুলি যেন অতল জলে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সরকার নিষ্ঠুর পীড়ননীতি অবলম্বনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সরকার যখন একদিকে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন আমাদেরও স্থির সংকল্প হওয়া আবশ্যক।

সকলে অবগত আছেন যে, বাংলা সরকারের চণ্ডনীতির ফলে জিলায় জিলায় বহু কর্মী দলে দলে দন্ড পাইতেছেন। এই কর্মীগণের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যেমন অর্থের দরকার তেমনি বিজ্ঞ ব্যবহারজীবীরও প্রয়োজন। কংগ্রেস যতদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ না করিতেছেন, ততদিন যদি আমরা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা না চালাই, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে।

আরো একটা বিষয়ের জন্য আমি জনসাধারণের নিকট আমার নিবেদন জানাইতেছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় বলিলেই হয়। এই কমিটি ঋণভারগ্রস্ত। উপরন্তু, কংগ্রেসের বর্তমান কার্য-পদ্ধতি চালাইবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। বন্দীবিলা সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও বাংলার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রক্ষার জন্যও অর্থের প্রয়োজন। আমি দেশ-

বাসীদের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই বিদপসংকুল সময়ে কংগ্রেস কমিটিকে সাহায্য করেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, অর্থের আনুকূল্য পাইলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আমাদের অভাবেও দেশে অনেক কাজ করিতে পারিবেন।

২৫ জানুয়ারি ১৯৩০

শ্রমিকদের কর্তব্য

কারাগারে যাইবার পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কর্মীদিগের প্রতি উপদেশ।

"সহকর্মীগণ, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই একটি বিঘ্নসংকুল পরিচ্ছেদ। সরকারের নিষ্পেষণ যন্ত্র আমাদের পীড়ন করিবার জন্য উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা শ্রমিকদের আন্দোলনে স্নেহ-পরবশ, তাঁহাদের পক্ষে আজ একত্রে সংঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবার অবসর আসিয়াছে। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আমাকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। আমার দুঃখ এই যে, আমি এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতসেবায় আমার সামান্য শক্তিটুকুও ব্যয় করিতে পারিলাম না। সরকারের দমননীতি বাদ দিলেও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সমক্ষে আর-এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বিপদ এই যে, ইউনিয়নের মধ্যে দলবিভেদ দেখা দিয়াছে। এই সংকট-সময়ে আমি সকল ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের তথা কর্মীসাধারণদের অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন একযোগে ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসকে সাহায্য করেন, এবং বিপদের সময় যেন এই প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করেন। কর্মীদের জন্য যাহা করা যায়, তাহা ন্যায়পরতা ও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি একদিন-না-একদিন ভারতের কর্মীবৃন্দ জয়ী হইবেন।

২৫ জানুয়ারি ১৯৩০

কর্পোরেশন হইতে পদত্যাগ

কর্পোরেশনের পদত্যাগ না করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করিয়া কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের উত্তর।

"কলিকাতা কর্পোরেশনের কয়েকজন বিশিষ্ট কাউন্সিলার বন্ধুর নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, পদত্যাগ না করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া আপনারা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আপনারা আমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি আজ কারাবরণে উদ্যত হইয়াছি। এই অবস্থায় এক বৎসর কাল কর্পোরেশনের কাজে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না— ইহাতে আমার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি অবিচার করা হইবে। সুতরাং পদত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। আমি আবার কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইতেছি যে, পদত্যাগ পত্র এ সময়ে প্রত্যাহার করিয়া কোনোই লাভ নাই।"

২৫ জানুয়ারি ১৯৩০

মেয়রের ভাষণ

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ কলিকাতা কর্পোরেশন ভবনে নব-নির্বাচিত মেয়রের সম্বর্ধনা-সভায় প্রতিভাষণ

কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলার মহোদয়গণ,

আমি যখন কারান্তরালে ছিলাম তখন এই মহানগরীর মেয়র পদে আপনারা আমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন। সেজন্য অন্তরের অন্তস্তল হইতে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এই গৃহের প্রতি বিভাগ হইতে আমার সম্পর্কে সদয় মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে— ডেপুটি মেয়রও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। সেজন্যও আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি এমন আত্মম্ভরী বা মূর্খ নই যে ক্ষণতরেও এ কথা ভাবিব যে এই বিপুল মর্যাদা লাভের আমি যোগ্য। আমি এ সম্পর্কে সচেতন যে যদি আমি কোনো গুণের অধিকারী হইয়া থাকি তবে তাহা এই যে আমি আমাদের স্বর্গত নেতা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একজন অনুগত ও একনিষ্ঠ অনুগামী হইতে চেষ্টা করিয়াছি। একজন ভাবপ্রবণ বাঙালীর মতোই তিনি বেহিসাবী ভাবে নিজেকে ক্ষয় করিয়াও জাতির জন্য মশাল জ্বালাইয়াছিলেন। আমি সেই মশালের আলোয় পথ চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার যদি কোনো গুণ থাকিয়া থাকে তবে তাহা এই।

অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারমহোদয়গণ, আমি মনে করি না যে আজ আপনারা আমার নিকট দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে চান। মহাত্মা গান্ধী একসময় "নাগরিক হিসাবে মৃত" বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন আমি তাহাই। গত আট মাস যাবৎ আমি "নাগরিক হিসাবে মৃত" আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ বছর জানুয়ারি মাসে কর্পোরেশনের সম্মুখে যে-সব সমস্যা ছিল এখনো সেই-সব সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। আমরা যদি ঐ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চাই তবে সবচেয়ে ভালো কাজ হইবে প্রাচ্যের এই প্রধানা নগরীর প্রথম মেয়রের প্রথম ভাষণটি অনুধাবন করা। আপনারা ঐ প্রথম ভাষণটিকে পৌর বিষয়ে একটি মতাদর্শের দলিল বলিয়া মনে করিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তাই ঐ ভাষণটির কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিলে আপনারা ধৈর্যচ্যুত হইবেন না বলিয়া আশা করি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন :

"গত দশ বা পনেরো বৎসরে আমি যে মহৎ কাজের ভার লইয়াছি তাহা হইল বহু বিচিত্র স্বার্থবোধসম্পন্ন বিচিত্র সম্প্রদায় -সমন্বিত এক ভারতীয় জাতি গড়িয়া তোলা। এই জাতি হইবে ঐক্যবন্ধ ও ফেডারাল ভিত্তিতে গঠিত। সেই লক্ষ্য লইয়া কাজ করার অনেক অবকাশ কলিকাতা কর্পোরেশনে আছে। আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমার যতদূর সাধ্যায়ত্ত, কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থই এখানে ক্ষুণ্ণ হইবে না, যদি-না সে স্বার্থ সমগ্র সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। সমাজের স্বার্থ বলিতে আমি বলিতে চাই ভারতীয় জাতির ও এই বিশেষ ক্ষেত্রে, কলিকাতার নাগরিকের স্বার্থ।"

আমার মনে হয় এখানে আমরা শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনই পাইলাম না, নাগরিতাবোধ ও রাজনীতির যথার্থ সম্পর্কের পরিচয়ও পাইলাম। তারপর দেশবন্ধু আরো বলিয়াছেন :

"ভারতবাসীর মহান আদর্শ এই যে তাহারা দরিদ্রকে দরিদ্র নারায়ণ

জ্ঞান করে। তাহাদের কাছে ভগবান দরিদ্রের বেশে আসেন। ভারতীয় চিত্তে দরিদ্রের সেবাই ভগবানের সেবা। তাই আপনাদের কার্য যাহাতে দরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত হয় সেজন্য আমি প্রয়াসী হইব। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমি যে কর্মসূচী রচনা করিয়াছি তাহার অধিকাংশ বিষয় দরিদ্রদের সম্পর্কিত— তাহাদের জন্য বাসস্থান, তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা দান ও তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এইগুলি দরিদ্রদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে। কর্পোরেশন যদি এই-সকল কাজে কিয়দংশেও সাফল্য লাভ করে তবে তাহা গৌরবান্বিত হইবে।”

সমাজতন্ত্রের ভিত্তি

তাঁহার এই কথাগুলি আমি বিশ্বাস করি। তাঁহার দর্শনের সারবস্তু এই কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। আধুনিক পরিভাষায় ইহাকেই আমরা সমাজ-তন্ত্রের ভিত্তি বলিতে পারি। আপনারা যদি তাঁহার কর্মসূচী পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হন তবে আপনারা আমার এ মত সম্পর্কে আরো নিঃসংশয় হইবেন নে আধ্যাত্মিক পোশাকে তিনি যাহা বলিয়াছেন আধুনিক ইয়োরোপ তাহাকেই সমাজতন্ত্র বলে। নতুন কর্পোরেশনের সামনে বাস্তব কর্মসূচীরূপে দেশবন্ধু কয়েকটি বিষয় পেশ করিয়াছিলেন :

‘অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ; গরীবদের জন্য বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ; খাঁটি ও শস্তা খাদ্য এবং দুধ সরবরাহ ; পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহের উন্নততর ব্যবস্থা ; বস্তি ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় উন্নততর আবর্জনা-দূরী-করণ ব্যবস্থা ; গরীবদের জন্য বাসস্থান ; শহরতলি অঞ্চলের উন্নয়ন ; উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা , স্বল্পতর ব্যয়ে প্রশাসনিক দক্ষতা।’

তাঁহার নীতি ও কর্মসূচীকে আমি যদি আবার আধুনিক ভাষায় ব্যক্ত করিতে চাই তবে বলিব আধুনিক ইয়োরোপে যাহাকে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ বলা হয়— তাহার নীতি ও কর্মসূচী ছিল তাহারই সমন্বয়। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি ন্যায়, সাম্য ও প্রেম। ইয়োরোপে ফ্যাসিবাদের বর্তমান রূপের সংগে জড়িত আছে দক্ষতা ও শৃংখলা। দেশবন্ধুর আদর্শে আমরা পাইতেছি এ দুয়ের সমন্বয়।

ভদ্রমহোদয়গণ, কর্পোরেশনের সম্মুখে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে সেগুলি হইল শিক্ষা, আবাসন, রাস্তা, চিকিৎসা, জলনিষ্কাশন ও আলোর

ব্যবস্থা। আজ পর্যন্ত এগুলি সম্পর্কে আমরা যাহা করিয়াছি তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। আশা করি আপনারা ধৈর্যচ্যুত হইবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯২৩-২৪ সালে ১৯টি বিদ্যালয় ছিল। এই সময় হইতে আমরা কাজ শুরু করি। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১৮। ইহার মধ্যে ১৩৭টি হইল বালক বিদ্যালয় ও ৮১টি বালিকা বিদ্যালয়। ১৯২৩-২৪ সালে কর্পোরেশন বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৪৬৮ জন। ১৯৩০ সালের ঐ তারিখ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,৫৬০ জনে। উহার মধ্যে ১৫,৫৬২ জন বালক ও ১০,৯৯৮ জন বালিকা। মোট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৬,৮০৮ জন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। কলিকাতায় বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স হইয়াছে প্রায় একলক্ষ বালক-বালিকার, ইহার এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি বালক-বালিকা কর্পোরেশন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে।

১৯২৩-২৪ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ছিল মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। ১৯২৯-৩০ সালে এই ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়াইয়াছে ৯লক্ষ টাকায়। কর্পোরেশন ৫টি মডেল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ; আরো ২টির নির্মাণকার্য চলিতেছে।

কলিকাতায় যে বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ে যাইবার বয়স হইয়াছে তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র বিদ্যালয়ে যায়। কারণ বিদ্যালয়ে যাওয়া স্বেচ্ছাধীন। তাই আমি মনে করি, বিদ্যালয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক করার সময় আসিয়াছে। কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই স্থির করিয়াছে যে ৯নং ওয়ার্ডে বিদ্যালয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হইবে। ৯নং ওয়ার্ড দিয়া আমরা ইহা শুরু করিতেছি কারণ ঐখানে পরিবেশ বিশেষভাবে অনুকূল। এখন বিষয়টি সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় রহিয়াছে। যখন ৯নং ওয়ার্ডে আমরা সাফল্যলাভ করিব তখন সারা কলিকাতায় আমরা বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাইব।

১৯২৭ সাল হইতে শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ শুরু করা হইয়াছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষক ইতিমধ্যেই ট্রেনিং পাইয়াছেন।

আবাসন প্রকল্প

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশন একটি প্রকল্প রচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছিল। কমিটির ১২টি বৈঠক হইয়া গিয়াছে।

তিলজলায় ৪নং পুলের দক্ষিণে ৬০ ফুট চওড়া সেবা রোডের পাশে একটি জমিও পছন্দ করা হইয়াছে। এখানে ৮টি ব্লকের একটি নকশা অনুমোদন করা হইয়াছে। প্রতিটি ব্লকে ৪টি ফ্ল্যাট থাকিবে। জমিসহ প্রতিটি ব্লক নির্মাণের খরচ পড়িবে ১৩,০০০ টাকা। কমিটি ৫২,০০০ টাকায় এইরূপ চারটি ব্লক নির্মাণের সুপারিশ করিয়াছে।

১৯২৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কর্পোরেশন বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য কমিটির কাছে পাঠায়। কমিটি উহার চূড়ান্ত রিপোর্টে নিম্নোক্ত স্থানগুলি সুপারিশ করিয়াছে :

ক. তিলজলায় ৬০ ফুট চওড়া সেবা রোডের পাশে ২১/৪ বিঘা পরিমাণ একখণ্ড কর্পোরেশনের জমি।

খ. মোমিনপুর লেন হইতে যে দালু সরকার লেন বাহির হইয়াছে তাহার পাশে ৩১/৪ বিঘা পরিমাণ একখণ্ড কর্পোরেশনের জমি।

তিলজলার জমিটি সম্পর্কে আগে যে মডেলটির কথা বলিয়াছি তাহা সুপারিশ করিয়া বলা হইয়াছে যে অবিলম্বে ঐরূপ দুইটি ব্লক নির্মাণ করা হউক।

দালু সরকার লেনের জমির ক্ষেত্রে সার্ভেয়ার একটি নকশা প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ নকশায় দেখানো হইয়াছে যে কয়েকটি ব্লক থাকিবে, প্রতিটি ব্লকে ৪টি বাসকক্ষ, ৪টি রান্নাঘর, উভয় দিকে একটি ঢাকা বারান্দা ও একটি আলাদা পায়খানা থাকিবে। নকশাটি অনুমোদিত হইয়াছে। কমিটি সুপারিশ করিয়াছে যে এখনই ঐরূপ ৪টি ব্লক নির্মাণ করা হোক। প্রতিটি ব্লক নির্মাণে খরচ পড়িবে ২৫,০০০ টাকা। কমিটি আরো সুপারিশ করিয়াছে যে প্রকল্পটি সফল হইলে প্রতি বৎসর শ্রমজীবী ও গরীব শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণ খাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

১৯৩০ সালের ১৫ জুলাই তারিখে কর্পোরেশন এই রিপোর্টটি অনুমোদন করিয়াছে ও তৎসহ এই নির্দেশ দিয়াছে যে আগামী বৎসর প্রকল্পটি রূপায়িত করিতে হইবে ও সেজনা আগামী বৎসরের বাজেটে পর্যাপ্ত ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে।

রাস্তা

কর্পোরেশন প্রতি বৎসর পাথরকুচি দেওয়া রাস্তা নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর আরো ৯ হইতে ১০ লক্ষ

টাকা ব্যয় করা হয়। মোটর চলাচল বাড়িতেছে বলিয়া রাস্তাগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করা উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। নতুন কর্পোরেশন গঠিত হইবার বহু আগে একটি কর্পোরেশন কমিটি সমস্যাটি অনুসন্ধান করিয়াছিল। কোন্ কোন্ রাস্তা কংক্রীট ভিত্তিসহ পুনর্নির্মাণ করিতে হইবে তাহার একটি তালিকা ঐ কমিটি প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই সময়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কমিটি হিসাব করিয়া বলিয়াছিল যে ঐ প্রকল্পের জন্য খরচ পড়িবে ২১ লক্ষ টাকা। রাস্তা নির্মাণ কাজটির উত্তরোত্তর বিশেষীকরণ ঘটিতেছে। অবিলম্বে এই সমস্যাটির মোকাবিলা কর্পোরেশনকে করিতে হইবে।

চিকিৎসা

নতুন কর্পোরেশন হইবার পর হইতে ইহা চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটাইতেছে। ১৯২৩-২৪ সালে মাত্র ৭টি কর্পোরেশন ডিস্পেন্সারি ছিল। ঐ সময় চিকিৎসাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল বার্ষিক ৩,৬০,০০০ টাকা। উহার মধ্যে ভিক্ষাদান-গৃহগুলির জন্য মঞ্জুরি ও প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ কর্মের জন্য ব্যয়ও ধরা ছিল। ১৯২৮-২৯ সালে ব্যয় হইয়াছে ৭,২০,০০০ টাকা ও বর্তমান বছরের বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে ৮¾ লক্ষ টাকা। কর্পোরেশনের এখন ১৩টি ডিস্পেন্সারি আছে। তন্মধ্যে একটি য়ুনানি ডিস্পেন্সারি ও তিনটি হোমিও-প্যাথিক ডিস্পেন্সারি। ঐ তিনটিতে শুধুই হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালগুলিতে কর্পোরেশনের দান ১৯২৩-২৪ সালে ছিল ১১৮,০০০ টাকা ; এখন উহা হইয়াছে ৪ লক্ষ টাকা।

পয়ঃপ্রণালী

কর্পোরেশন স্পিল রিজার্ভার প্রকল্প গ্রহণ করে নাই। কারণ উহার জন্য বহু অনাবশ্যক ব্যয় হইত। পরিবর্তে কর্পোরেশন দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে। প্রকল্প দুইটি প্রস্তুত করিয়াছেন ডঃ বি. এন. দে। তাঁহাকে এই উদ্দেশ্যে বিশেষ অফিসাররূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। একটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য আভ্যন্তরীণ জল নিষ্কাশন, আর-একটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাহিরের দিকে জল সরাইয়া দেওয়া।

বর্তমান পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা অচল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে আলোচনা

ও তর্ক-বিতর্কে অনেক কালক্ষয় হইয়াছে। তাই নতুন প্রকল্প কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

আগামী কয়েক বৎসর কর্পোরেশনের এইটিই হইবে মুখ্য কাজ।

আলো

কর্পোরেশন উক্ত বিশেষ অফিসার-কর্তৃক প্রস্তুত একটি প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছে। কেন্দ্রীয় পৌরভবন, হগ স্ট্রীট বিল্ডিং ও হগ মার্কেটে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ ঐ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইহা যথেষ্ট ঔৎসুক্য সঞ্চার করিয়াছে। আমার ধারণা ইহা কার্যকরী হইলে কর্পোরেশনের বার্ষিক বিদ্যুৎ বিল খাতে ৭০,০০০ টাকা ব্যয় কমিবে।

কর্পোরেশনের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে যথাশীঘ্র প্রকল্পটি কার্যকর করার চেষ্টা করাই লাভজনক হইবে।

অনেক কিছু করিতে হইবে

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি যাহা বলিলাম তাহা হইতে আপনারা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে ১৯২৪ সাল হইতে নতুন কর্পোরেশন এই মহানগরীর সবচেয়ে জরুরী সমস্যাগুলি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন রহিয়াছে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা বলিতেছি না যে যাহা হইয়াছে তাহাতে আমরা আত্ম-তৃপ্ত আছি। বরং বিপরীত পক্ষে, আমি বিশ্বাস করি যে রাস্তা, শিক্ষা, আবাসন ও বিশেষত নবসংযোজিত এলাকাগুলির উন্নয়ন ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কে অনেক কিছুই করা বাকি আছে। এই-সব সমস্যার গুরুত্ব ও গভীরতা আমরা যত বেশি উপলব্ধি করিব সমগ্র শহর ততই লাভবান হইবে।

কোনো স্বার্থই ক্ষুণ্ন হইবে না

ভদ্রমহোদয়গণ, এইভাবে মাঝে মাঝে এমন শঙ্কা ব্যক্ত হইয়াছে যে নতুন কর্পোরেশন মহানগরীর কোনো কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিবে। এরকম শঙ্কার পক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমার বিশ্বাস, এই ভবনের সকলেই এ প্রশ্নে একমত যে এ মহানগরীর সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে। এই ভবনের ইউ-রোপীয় সদস্যদের আমি এ কথা বলিতে পারি যে চৌরঙ্গীর স্বার্থ আমরা ক্ষুণ্ন

করিব না। আমরা বুঝি, চৌরঙ্গীতে যে অবস্থা বর্তমান তাহার সঙ্গে আহিরীটোলার অবস্থার পার্থক্য আছে। কিন্তু চৌরঙ্গীর অবস্থাকে আহিরীটোলার অবস্থায় নামাইয়া আনা আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের আদর্শ আহিরীটোলার অবস্থাকে চৌরঙ্গীর অবস্থায় উন্নীত করা।

আমাদের মুসলমান বন্ধুদের তরফ হইতেও এ আশংকা মাঝে মাঝে ব্যক্ত হইয়াছে যে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের স্বার্থও আমাদের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে। আমার সম্পর্কে এ পক্ষের কিছু বন্ধু সদয় মন্তব্য করিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ দিতেছি। আমার বন্ধুদের আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে ১৯২৪ সালের ১৬ জুলাই আমি একটি বিবৃতি দিয়াছিলাম যাহাতে চাকরিতে নিয়োগ ব্যাপারে মুসলমানদের দাবি সম্পর্কে আমি আমার মতামত দিয়াছিলাম। আমি ইচ্ছা করিয়াই ও পূর্ণ দায়িত্ববোধ-সহ সে বিবৃতি দিয়াছিলাম। আজ এই মেয়রের আসন হইতে আমি এ কথা বলিতে প্রস্তুত যে সেই বিবৃতির প্রতিটি কথাই আমি এখনো মানি। সেই বিবৃতিতে যে নীতি ঘোষিত হইয়াছিল তাহা কতদূর কার্যকর করিতে পারিব তাহা শুধু আমার উপর নির্ভর করিবে না, এই ভবনের উপরও নির্ভর করিবে। আমি এবং এই ভবনে কংগ্রেস পার্টি, আমরা এই মহানগরীর বাসিন্দা সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়পূর্ণ আচরণ আন্তরিকভাবে করিব।

জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন যে আমি গত জানুয়ারি মাসে কাউন্সিলার পদ ত্যাগ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে ইহা 'রাজনৈতিক ভণিতা' মাত্র। তিনি যাহাকে 'রাজনৈতিক ভণিতা' বলিয়াছেন সেরূপ কোনো ব্যাধি আমার আছে বলিয়া আমার জানা নাই। রাজনৈতিক প্রশ্নে আমার নির্দিষ্ট মতামত আছে ও আমার প্রত্যয়ে আমি আন্তরিক। কিন্তু সেজন্য আমার এই ভবনের বন্ধু আমার পূর্বোক্ত কাজকে যে 'রাজনৈতিক ভণিতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহার কোনো যুক্তি নাই। তাঁহার অভিযোগের উত্তরে আমি কেবল এই কথাই বলিব যে আমার পদত্যাগের সময় এই ভবন হইতে ও আপনাদের কাছ হইতে আমি বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। গত জানুয়ারি মাসে আমার পদত্যাগের পক্ষে উহাই পর্যাপ্ত হেতু ছিল।

আপনাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছি সেজন্য আনন্দিত। ইতিপূর্বে আমি আপনাদের মধ্যে ছিলাম মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার রূপে ও কাউন্সিলার রূপে। এবং আপনারা যে উচ্চতম সম্মান দিতে পারেন তাহা

আপনারা আজ আমাকে দিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিয়া আমি যে শুধু আনন্দ পাইয়াছি তাহাই নয়, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিয়াও আমি আশা করি যে আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় তাহা উদ্‌যাপিত হইতে পারিবে।

স্বাধীন ভারত

কোনো সন্দেহ নাই যে ভারত একটি বিপ্লবের বেদনার মধ্য দিয়া চলিতেছে। হইতে পারে যে ইহা অহিংস বিপ্লব, কিন্তু ইহা বিপ্লব তো বটে। আমরা বর্তমান প্রশাসনিক রূপের আমূল পরিবর্তন চাই। আমার কথা বলিতে পারি যে আমার মনে যে স্বপ্ন আছে তাহা হইল ন্যায়, সাম্য ও প্রেমের বিশ্বজনীন নীতির উপর ভিত্তি করিয়া একটি সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-কাঠামো গঠন করা।

নতুন ভারত

বন্ধুগণ, সমগ্র জাতি আজ নতুন ভারত গঠনের কাজে যোগ দিয়াছে। কেহ কি বলিতে পারেন যে কলিকাতা মহানগরীর জীবনযাত্রা সমগ্র জাতির জীবনধারা হইতে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সম্ভব? আপনারা যদি আমাদের জাতীয় জীবনকে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও প্রেমের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চান তবে কলিকাতা মহানগরীর জীবনযাত্রাও কি এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলা উচিত হইবে না? ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে কোনো একান্ত বিরোধ আছে তাহা আমি মনে করি না। বিশ্ব এমনই বিশাল যে আমাদের উভয়েরই এখানে স্থান সঙ্কুলান হইবে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তাহারাও অন্তরে অন্তরে আমাদের ইচ্ছার আন্তরিকতা স্বীকার করে। আমরা সেদিনের কামনা করি যেদিন ভারত স্বাধীন হইবে ও বিশ্ব শান্তি লাভ করিবে। আমরা শুধু ইহাই বলিতেছি যে ভারত স্বাধীন না হইলে সারা বিশ্বে শান্তি আসিবে না।

নারী প্রতিষ্ঠান

২২ অক্টোবর ১৯৩০ নারী শিক্ষা সমিতি -পরিচালিত বিদ্যাসাগর বাণী ভবন নামক বিধবাদের আবাস পরিদর্শন উপলক্ষে বিবৃতি।

কয়েকদিন আগে বাণীভবন পরিদর্শন করিয়া আমি তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। নারী শিক্ষা সমিতির সহ-সচিব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক এবং বাণীভবনের ভারপ্রাপ্ত মহিলারা আমাকে ভবনটি ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মহৎ ও নিঃস্বার্থ কাজের ফল দেখিয়া আমি সুখ ও গর্ব অনুভব করিয়াছি। কয়েক বছর আগে আমি যখন বোম্বাই ও পুণার 'সেবা সদন' দেখিতে যাই তখন সেখানে তরুণী বিধবাদের যেভাবে দেখাশোনা করা হয় ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহা দেখিয়া কলিকাতায়ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠুক ইহা আমি চাহিয়াছিলাম। তখন আমার জানা ছিল না যে কলিকাতায় ইতিমধ্যেই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে ও উহা ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে। বাণী-ভবনের কর্তৃপক্ষ প্রযুক্তিবিদ্যার উপর জোর দিয়াছেন যাহাতে পরে দরকার হইলে ভবনের বাসিন্দারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারেন। আমাদের নারী জাগরণের কাজ এখনো বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই। আমি জানি যে বাণীভবনের মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পক্ষে সহায়ক হইবে ও আমাদের জাতীয় প্রগতিরও অনুকূল হইবে। যাহারা এই পবিত্র মানবিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই ও এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

অ্যাডভান্স পত্রিকার অপপ্রচারের জবাব

২৯ অক্টোবর ১৯৩০ সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

আমার কারামুক্তির পর হইতে অ্যাডভান্স পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার চালাইয়া আসিতেছে। উহার কটূক্তিবর্ষণ আমি এতদিন উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু উহার শেষতম অপপ্রচার এমন হইয়াছে যে তাহার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করিতে পারি না। অ্যাডভান্স বলিয়াছে যে গত ২৬ অক্টোবর রবিবার আহিরীটোলার সরস্বতী ক্লাবের সভায় আমি যখন সভাপতিত্ব

করিতেছিলাম তখন শ্রোতৃবৃন্দ দাবি করেন যে অমৃতসরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের গ্রেপ্তারের দরুন সভা মুলতবী করিয়া দেওয়া হোক। অ্যাডভান্স বলিয়াছে যে আমি বিধান দিই যে সভায় যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহা শেষ পর্যন্ত চালাইতে হইবে। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ অবিলম্বে সভার সমাপ্তি ঘোষণা দাবি করায় সভা বন্ধ হইয়া যায়।

প্রকৃত ঘটনা হইল এই যে সরস্বতী সমিতির বার্ষিক সভায় আমি সভাপতিত্ব করিতেছিলাম। ড্রিল, শারীরিক ব্যায়াম-কৌশল, লাঠি খেলা ইত্যাদি সেখানে দেখানো হইতেছিল। আলোচনার কোনো বিষয়ই কর্মসূচীতে ছিল না। দুই ঘণ্টা যাবৎ সভার কাজ চলিয়াছিল। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সভার কাজে কেহ সামান্যতম বাধা দেয় নাই বা কোনো গণ্ডগোল হয় নাই।

সরস্বতী সমিতির বার্ষিক সভায় আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ আমি জানিতেই পারি নাই যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ যদি উহা জানিয়াও থাকেন আমি ঐখানে থাকা কালে আমাকে তাহা জানান নাই। অ্যাডভান্সে প্রকাশিত সংবাদ আগাগোড়া বানানো। প্রতিবেদকের কল্পনাশক্তি প্রশংসাযোগ্য কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠার অভাব ঘটিয়াছে।

অ্যাডভান্স আমার বিরুদ্ধে যে প্রচার চালাইতেছে তাহার অপরাপর দিক সম্পর্কে আমি কিছুই বলিব না। শুধু এইটুকু বলিব যে উহার সব প্রচারই মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত। কারামুক্তির পর আমি কাহাকেও আঘাত দিই নাই। তৎসত্ত্বেও অ্যাডভান্স যে মনোভাব দেখাইতেছে তাহা বোঝা সম্ভব নয়। অ্যাডভান্সের প্রচারের ফলে গোষ্ঠীবিশেষ বা কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু জাতীয় স্বার্থ উহাতে কণামাত্র সিদ্ধ হইবে না। বর্তমান আন্দোলনেরও উহাতে কোনো লাভ হইবে না। আর আমি কারামুক্তির পর হইতে কংগ্রেস ও কর্পোরেশনের জন্য যে কাজ করিতেছি তাহা বিচারের ভার আমি জনসাধারণকেই দিতেছি।

মেয়রের প্রতিভাষণ

৬ নভেম্বর ১৯৩০ পাবনা মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক কলিকাতা-কর্পোরেশনের মেয়রকে সম্বর্ধনার উত্তর।

পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—

ইতিপূর্বে একবার আপনাদের শহরটি পরিদর্শনের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। কিন্তু এবারের ভ্রমণ আর সেবারের ভ্রমণ! কি বিশাল পার্থক্য! তখন যুদ্ধ ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু আজ সমগ্র জাতি এক ভয়ংকর সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমাদের সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম, তবু ইহা একটি মহাশক্তির সংগে সংগ্রাম। সেই শক্তি তাহার সকল সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের আঘাত করিতে প্রস্তুত। আমাদের জাতির ইতিহাসের এই সংকটলগ্নে আমি আপনাদের মধ্যে আসিয়াছি এবং আপনারাও আমাকে বিপুল সম্বর্ধনার দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে যে সম্বর্ধনা দিয়াছেন তাহা যে একজন ব্যক্তিকে দিয়াছেন ইহা ভাবিবার মতো দম্ভ আমার নাই। আমি জানি আমি যে-আদর্শের পূজারী আপনারাও সেই একই আদর্শের পূজারী। আমি ঐ আদর্শকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তাই আপনারা আমাকে এই সম্বর্ধনা দিয়াছেন। আপনারা আমাকে উপলক্ষ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শকে সম্মান জানাইয়াছেন। বাংলার তরুণ ও কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের স্মারক এই সম্বর্ধনা। আমি চিরদিন নিজেকে বাংলার একজন তরুণ ও কর্মী বলিয়া মনে করিয়াছি। আজিকার সম্মান তাহাদের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান বলিয়া আমি মনে করি।

বিজয় সুনিশ্চিত

বিজয়ের পথ সম্মুখে প্রসারিত। তবু সে পথ এখানে-সেখানে, মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন্ কর্মপন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক সে সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। কেননা সত্য আমাদের পক্ষে, ন্যায় আমাদের পক্ষে। কোনো জাতিই অপর জাতিকে চিরদিন পরাধীন রাখিতে পারে না। কিন্তু আমরা একদিন যাহা হারাইয়াছি আবার তাহা ফিরিয়া পাইতে হইলে আমাদের পর্যাপ্ত মূল্য দিতে

হইবে। এবং যেদিন আমরা উপযুক্ত মূল্য দিব সেইদিনই আমরা আমাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইব।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

ইংরেজ জাতি আমাদের বোঝে, কিন্তু এমন ভাব দেখায় যে যেন বোঝে না। আমরা তাহাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া দিতে চাই যে আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিলে আমরাও কাহারো সংগে বিবাদে প্রবৃত্ত হইব না। সন্দেহ নাই যে আমরা জাতীয়তাবাদী। কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদীও বটে। আমার কথা বলিতে পারি যে আমি বিশ্বাস করি, কোন জাতি স্বাধীন না হইলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীর অধিকারী হইতি পারে না। বিশ্বের মুক্তি ভারতের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ একটিমাত্র জাতিও বন্ধনদশায় থাকিবে ততক্ষণ আন্তর্জাতিকতাবাদ বিকাশলাভ করিতে পারিব না। শুধু যে দাস জাতিই দুঃখ ভোগ করে তাহা নয়, যে জাতি উহাকে দাসে পরিণত করিয়াছে সে অধিকতর দুঃখ ভোগ করে। বিশ্বের মংগলের জন্য আমরা সকল জাতির স্বাধীনতা চাই। পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার উহাই একমাত্র পথ।

জীবন অবিভাজ্য

মানবজীবন এক অবিভাজ্য সমগ্র। ইহাকে খণ্ড খণ্ড জল-অচল ভাগে ভাগ করা যায় না। ভাগ ভাগ করিয়া আমরা ইহাকে বিবেচনা করিতে পারি না। পৌর জীবন, রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক জীবন পরস্পর সম্পর্করহিত অংশরূপে দেখা চলে না। পৌর জীবনের অন্তস্তল হইতে একটি মহান আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া না উঠিলে উহা সুন্দর হইতে পারে না। স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সে আদর্শ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

এ দেশের ইংরেজরা বলেন যে পৌর জীবন ও রাজনৈতিক জীবন স্বতন্ত্র রাখা উচিত। কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের দেশেই তাহা করা হয় নাই। কারণ তাঁহারা জানেন যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনই একটি ঐক্যবন্ধ সমগ্রতার পরস্পরসম্বন্ধ অংগবিশেষ। এরূপ কোনো অংগের সমুন্নতি ঘটাইতে হইলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে জাতীয়তাবাদের অবিভাজ্য ভাব দ্বারা পরিপূরিত করিতে হইবে। এই কারণেই আমরা দেখি যে ইংলন্ডে শ্রমিকদল শুধু

পার্লামেন্ট দখল করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, পৌর ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও উহার প্রভাব বাড়াইয়া চলিয়াছে। তাই ইংরেজরা যখন আমাদের বলেন যে রাজনৈতিক জীবন হইতে পৌর জীবন পৃথক রাখা উচিত তখন আমরা স্পষ্টই বুঝি যে তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয় হইতে কথাটি বলিতেছেন না, ইহা তাঁহাদের একটি কূটনৈতিক চাল মাত্র।

বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে সংহত করা

যে ভাব আজ সারা দেশকে আলোড়িত করিতেছে জাতির কার্যধারার সকল ক্ষেত্রে তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে। নিজের কথা আমি ইহাই বলিতে পারি যে আমি যতক্ষণ কারাগারের বাহিরে থাকিব ততক্ষণ বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে সংহত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আমি ইহাও বলিতে পারি যে এই বিষয়ে আমি কিয়ৎ পরিমাণ সাফল্যও অর্জন করিয়াছি। এ কথা সত্য যে এই আন্দোলনের অধিকাংশ নেতাই এখন জেলে আছেন। তাই যাঁহারা কারাগারের বাহিরে আছেন তাঁহাদের উপরই বৃহত্তর দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। আমরা যতক্ষণ কারাগারের বাহিরে থাকিব ততক্ষণ আমাদের যথাসাধ্য করিয়া যাইতে হইবে।

জাগ্রত আত্মপ্রত্যয়

যে জাতির আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ একবার জাগ্রত হইয়াছে সে জাতিকে চিরতরে দাবাইয়া রাখা যায় না। আমাদের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদাবোধ অবশেষে পরিপূর্ণ জাগ্রত হইয়াছে। আমরা যে বিজয় লাভ করিব সে সম্পর্কে তাই কোনো সংশয় নাই। যুক্তির সাহায্যে এ কথা হৃদয়ংগম করা যাইবে না। ইহা বিশ্বাসের প্রশ্ন। আত্মপ্রত্যয়ই সকল শক্তির উৎস।

বর্তমানে দেশে যে ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তকে সেই ভাব জারিত করিয়া তুলুক। যখন তাহা ঘটিবে তখন আমরা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে উহার পরিপূর্ণতা ও প্রকাশ দেখিতে পাইব। আমরা যখন সেই আন্তরপ্রেরণা দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইব তখন পৌর জীবনের সমস্যাগুলিও সহজেই সমাধান করিতে পারিব। সেই আন্তরপ্রেরণা ভিন্ন পৌর উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র কি পশ্চিমের দান

জনৈক গভর্নর একদা বলিয়াছিলেন যে এ দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের ভাবধারা পশ্চিমের দান। আমরাও উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু এখন আমাদের চোখ খুলিয়াছে। এখন আমরা দেখিতেছি যে বুদ্ধদেবের আমল হইতে এ দেশে শুধু গণতান্ত্রিক সরকারই নয়, যাহাকে আমরা পৌর সরকার বলি তাহাও বর্তমান ছিল। জয়সওয়ালের মতো প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের ঐতিহাসিক গবেষণা ও রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়ামের মতো স্থানে রক্ষিত সাক্ষ্য প্রমাণে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারত গণতান্ত্রিক ও পৌর শাসনের সঙ্গে প্রাচীনতম কাল হইতে পরিচিত আছে। পৌর প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিভাষা তাই আমাদের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে পাওয়া যায়।

জাতীয় আদর্শের প্রতীক গান্ধীজী

গৌরবময় অতীতের অধিকারী এই প্রাচীন জাতির বন্ধন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহা যে এতদিন স্থায়ী হইয়াছে তাহার কারণ আমরা স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে পারি নাই। মহাত্মা গান্ধী আমাদের নেতা। কিন্তু এ কথা মনে করার মতো ভুল কেহ যেন না করেন যে বর্তমান আন্দোলন কোনো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি। ইহা সমগ্র জাতির আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে জাতি তাহার আদর্শ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইয়াছে। তাই জাতি তাঁহাকে নেতারূপে বরণ করিয়াছে।

স্বাধীনতার প্রভাত

প্রাতঃসূর্য যেমন দীর্ঘ নিশার অবশেষে মেঘখণ্ডগুলিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় আমরাও তেমনই সত্বর উষার অরুণোদয় দেখিতে পাইব। আমাদের দীর্ঘকাল-পোষিত দাসত্ব তখন প্রভাতের 'কুয়াশা'র মতো দূরীভূত হইবে। জাতির ললাটে স্বাধীনতার সূর্য তাহার বিজয়চিহ্ন আঁকিয়া দিবে।

প্রশ্ন-উত্তর

৯ নভেম্বর ১৯৩০ কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে বঙ্গীয় জনসংঘ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় কয়েকটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন : লাহোর-কংগ্রেসের পর আপনি কী করিয়াছেন ?

উত্তর : লাহোর হইতে আমি ফিরিয়া আসার পরই আমি কারারুদ্ধ হই।

প্রশ্ন : কারামুক্তির পর আপনি কী করিয়াছেন ?

উত্তর : আমার নিজের কাজ সম্পর্কে বলিয়া বেড়াইবার অভ্যাস আমার কোনোদিনই নাই। ভবিষ্যতেও আত্মপ্রশংসা কোনোদিন করিব না বলিয়া আশা রাখি। আমার স্নেহপরায়ণ দেশবাসী ও ভাবী কালই আমার কাজের বিচার করিবে। আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াই তৃপ্ত থাকি, অন্যরা আমার কাজের বিচার করুন ইহাই আমি চাই।

প্রশ্ন : আপনার সম্পর্কে কোনো গুপ্ত রহস্য আছে কি ?

উত্তর : আপনি যে ইংগিত করিতেছেন তাহা খোলাখুলি বলুন। (প্রশ্নকর্তা একখানি মুদ্রিত কাগজ হইতে কিছু পড়িয়া নীরব হইলেন।) আমার উপাধি বসু— গুপ্ত নয়। আমার কোনো গুপ্ত ব্যাপার নাই। আমার জীবন খোলা বইয়ের মতো। বিশ্বের কাছে বা আমার স্বদেশবাসীর কাছে গোপন করার মতো আমার কিছুই নাই। আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি দিক জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত।

প্রশ্ন : আপনি লাহোরে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলি বর্জন করিতে বলিয়াছেন, অথচ নিজেই কর্পোরেশনে কেন প্রবেশ করিলেন ?

উত্তর : আইনসভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা ইত্যাদি সম্পূর্ণ বয়কটের জন্য লাহোরে আমি প্রাণপণ খাটিয়াছিলাম। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আমি বলিয়াছিলাম যে আংশিক বয়কটের কোনো অর্থ নাই। আমি বিশ্বাস করি, হয় সকল সংস্থা বয়কট করা হোক, নতুবা সকল সংস্থা দখল করা হোক। উহাই ছিল স্বরাজ্য দলের নীতি। আমি ও আমার দল লাহোরে পরাস্ত হয়। কংগ্রেস আইনসভা বয়কট করার অথচ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সংস্থাগুলি দখল করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সেই নীতি অনুসারে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কলিকাতায় পৌর নির্বাচনে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত লয়। লাহোরে যদি আমার প্রস্তাব গৃহীত হইত তবে কলিকাতায়

পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসীতে কংগ্রেসীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিত না। তাহা ছাড়া, লাহোর হইতে ফেরার পর ও কারারুদ্ধ হইবার ঠিক আগে আমি অপর একজন ব্যক্তির অনুকূলে কর্পোরেশন হইতে পদত্যাগ করি। ১৯৩০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলারদের সাধারণ নির্বাচনে বা ১৯৩০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত অল্ডারম্যান নির্বাচনে আমি প্রার্থীরূপে অংশ লই নাই। শ্রীসেনগুপ্ত-সহ আরো কয়েকজন ঐ নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীসেনগুপ্ত যদি বারবার বাংলার কংগ্রেস সংগঠনকে অমান্য না করিতেন তবে আমি কর্পোরেশনের কাছাকাছিও আর আসিতাম না। আমি ইহা দেখিয়া দুঃখিত যে প্রশ্নকর্তা যদিও নিজেকে কংগ্রেসী বলিতেছেন তবু তিনি খবর রাখেন না যে লাহোর-কংগ্রেস পৌর সংস্থা বা অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থা বয়কট করার প্রস্তাব লয় নাই।

প্রশ্ন : লাহোরে স্বাধীনতা-প্রস্তাব গ্রহণের পর আপনি আনুগত্যের শপথ কিভাবে লইলেন ?

উত্তর : আমি ব্যক্তিগত মহলে ও প্রকাশ্যে বরাবরই বলিয়াছি যে, যে শপথ লওয়া হয় তাহা সাংবিধানিক শপথ! আয়ার্ল্যান্ডের রিপাবলিকান পার্টি এই আনুগত্যের শপথ লইবার পর আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টে বসিয়াছেন। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্টরা শপথ লইবার পর হাউস অফ কমন্সে বসিয়াছেন। আমি বারবার প্রকাশ্যে বলিয়াছি— লাহোরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেও বলিয়াছি যে— সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ও দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে আনুগত্যের শপথ লইয়াও আইনসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থায় প্রবেশ করিতে আমি রাজি আছি। আমার নীতি বরাবরই সংগতিপূর্ণ। উপরন্তু, আমার প্রশ্নকর্তাকে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মেয়ররূপে চারবার আনুগত্যের শপথ লইয়াছেন কিনা ও গতবার যদি তিনি পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হইতেন তবে আবার আনুগত্যের শপথ লইতেন কি না।

প্রশ্ন : শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যখন কারাগারে রহিয়াছেন সেই সময়ে আপনি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন কেন ?

উত্তর : গত এপ্রিলে এই মর্মে একটি লিখিত চুক্তি হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এপ্রিলে মেয়র নির্বাচিত হইবেন, কিন্তু তিন মাস পর পুনর্বার নির্বাচনের সময় উপস্থিত হইলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মেয়র নির্বাচিত

করিতে হইবে। শ্রীসেনগুপ্তের দল এই পবিত্র চুক্তি ভংগ করিয়াছেন। যদি শ্রীসেনগুপ্তের দল তাঁহাকে ষষ্ঠবার মেয়র নির্বাচিত করার চেষ্টা না করিতেন ও উহা করিতে গিয়া লিখিত পবিত্র চুক্তি ভংগ না করিতেন তবে আমি কর্পোরেশনের কাছাকাছিও আসিতাম না। মেয়র পদে ভদ্রলোক-বিশেষের কায়েমী স্বত্ব থাকিতে পারে না। এপ্রিল মাসে যখন চুক্তি হইয়াছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন ভদ্রতা ও সৌজন্যবশত মেয়র পদে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যাই হোক, তিন মাস পর, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কারাগারে আছেন এই যুক্তিতে আবার তাঁহাকে মেয়র পদে নির্বাচনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। সেজন্য অপকৌশলের আশ্রয়ও লওয়া হইয়াছিল এবং এ কথাও প্রচার করা হইয়াছিল যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জেলে যাইতে ভয় পান ও সেজন্য কংগ্রেস দল কর্তৃক মেয়র নির্বাচিত হইবার পক্ষে তিনি অনুপযুক্ত। ডাঃ রায় জেলে গিয়াছেন। আমি জানিতে চাই, সেই-সব নির্ভীক ব্যক্তিরা, যাঁরা ডাঃ রায়ের নামে অপবাদ দিয়াছিলেন ও এমন-কি প্রকাশ্যে তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায় ?

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টিতে এপ্রিল মাসে উভয় গোষ্ঠী যে আপস-মীমাংসায় পৌঁছিয়াছিল শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দল তাহা লংঘন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। কংগ্রেস যখন আমাকে মেয়রপদের জন্য প্রার্থীরূপে দাঁড় করাইল তখন সে সিদ্ধান্তও তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দল কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয়, মনোনীত ও মুসলিম ভোটের সাহায্য লইয়াছে ও প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টা যখন সফল হইল না তখন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ-এর অনুকূলে নিজ নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন যে অন্তত আমি যেন মেয়র হইতে না পারি।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বারবার লংঘন করিয়াছেন। লাহোর-কংগ্রেসের পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বাংলা কংগ্রেসের বিবাদ সম্পর্কে তদন্ত করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিলে প্রথমেই তিনি জানিতে চান যে উভয় পক্ষ আপস-মীমাংসায় রাজি আছে কিনা। আমার পক্ষ আপস-মীমাংসায় রাজি ছিল। এমন-কি আমি ও শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায় এ কথাও বলি যে আপসের পক্ষে সহায়ক হইলে আমরা উভয়েই যথাক্রমে প্রাদেশিক কংগ্রেস

কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করিতে রাজি আছি। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কোনোরকম আপসে আসিতে অস্বীকৃত হন ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও রায় দাবি করেন। তিনি বলেন যে ঐ রায় যেরূপই হোক-না কেন তিনি তাহা মানিয়া লইবেন। পণ্ডিত মতিলাল আমার পক্ষের অনুকূলে রায় দেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কি তাহা মানিয়া লইয়াছেন? বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পৌর নির্বাচনে যে-সব প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহের প্রথম পদক্ষেপ। এপ্রিল মাসে অল্ডারম্যান নির্বাচনের সময় তিনি আবার বি. পি. সি. সি.-র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এক দল প্রার্থী দাঁড় করান। গত জানুয়ারি মাসে আমি যখন জেলে যাই তখন আমি কংগ্রেসের সকল কর্মীদের ঐক্যসাধনের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যখন রেঙ্গুন গেলেন তখন তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ধ্বংস করিয়া ফেলার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। যখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইয়াছিল তখন জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ঐ আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত হইবে। এই নির্দেশ সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত "বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদ" —এই নাম লইয়া একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করেন। গত এপ্রিল মাসে বি. পি. সি. সি. শ্রীসেনগুপ্তকে অল্ডারম্যান পদ দিতে চাহেন। তাঁহাদের শর্ত ছিল এই যে শ্রীসেনগুপ্তকে অপরাপর সদস্যদের সঙ্গে বি. পি. সি. সি.-র প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিতে হইবে। আবার গত আগস্ট মাসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের অনুকূলে পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। তাঁহারও শর্ত ছিল এই যে শ্রীসেনগুপ্তকে বি. পি. সি. সি.-র প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিতে হইবে। (অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ রায়ের পত্র দ্রষ্টব্য)। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের দল এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে গত বারো মাসে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বারবার কংগ্রেসকে অমান্য করিয়াছেন ও কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি লঙ্ঘন করিয়াছেন। দেশবন্ধু বাংলায় যে কাজ করিয়াছিলেন তাহার অনেকটাই তিনি এইভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন ও বাংলায় কংগ্রেসকর্মীদের সামনে বিশৃঙ্খলার নজীর স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এই যে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের মনোভাব

দেখাইয়াছেন তাহার মোকাবিলা করা ও বাংলায় কংগ্রেসের মর্যাদা, সম্মান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সংকল্প লই। জেলে থাকাকালে বিগত অল্ডারম্যান-নির্বাচনের আগে আমি বারবার শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে বলিয়াছিলাম যে বাংলায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে দুইটি আইন অমান্য কমিটি মিলাইয়া একটি করা হোক ও মেয়রপদের ব্যাপারে গত এপ্রিল মাসে যে আপস-আলোচনা হইয়াছিল তাহা মানিয়া লওয়া হোক ও পুনর্নির্বাচনের সময় ডাঃ রায়কে মেয়র করা হোক। শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিলেন যে তিনি মেয়র পদের জন্য পুনরায় প্রার্থী হইবেন ও শেষ পর্যন্ত লড়িবেন। প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে কারামুক্ত হইবার পর তাঁহার প্রথম কাজ হইল বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ। ইহার ফলে বাংলায় অনৈক্য স্থায়ী হইল। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিতে ঐক্য স্থাপনের কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নাই।

পরিশেষে আমি বলিব যে কংগ্রেস যে-কোনো ব্যক্তির চেয়েই বড়ো। আমি যদি কখনো কংগ্রেসকে লঙ্ঘন করিয়া আমার ব্যক্তিগত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করি ও কংগ্রেসের ভিতর সকল শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া দিই তবে কংগ্রেস হইতে আমাকে বহিষ্কার করাই উচিত হইবে। ঘটনাক্রমে আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। আগামী নির্বাচনে অপর কেহ সভাপতি নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু সভাপতির পদে যিনিই বসুন দলীয় শৃঙ্খলা তাঁহাকে বজায় রাখিতেই হইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যিনিই বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন— তিনি যত জনপ্রিয় বা খ্যাতনামা হোন-না কেন— কঠোরভাবে তাঁহাকে দমন করিতেই হইবে। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন আপনারা কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হোন।

জাতীয় ক্রীড়া : সন্তরণ

১৫ নভেম্বর ১৯৩০ কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জাতীয় সন্তরণ অ্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিকী সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু যখন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন তখনো তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বোধন করিতে তরুণদের আহ্বান উপেক্ষা করেন নাই। দেশবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে আরো শক্তিশালী ও নির্ভীক করিয়া তোলা। সংগঠন ছাড়া তাহা সম্ভব নয়। এই সংগঠনগুলিকে যদি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা না করা হয় তবে স্বাধীনতা ও প্রগতির সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার যোগ্য করিয়া মানুষকে গড়িয়া তোলা যাইবে না। বলা হইয়া থাকে ইংলন্ড যত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে তাহার অনেকগুলি বিজয়ের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল ইটন ও হ্যারোর খেলার মাঠে। কথাটির মধ্যে সত্য আছে।

অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে ধরনের শিক্ষা দেয় এখানে তাহা দেওয়া হয় না। রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গাফিলতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন ও সমিতির প্রয়োজন আছে। প্রধানত এই-সব সংগঠনের মাধ্যমেই আমাদের সামাজিক ও জাতীয় কর্মধারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

সন্তরণ আমাদের দেশে জাতীয় ক্রীড়া হইয়া উঠিবে। সন্তরণ শিখাইবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে যথেষ্ট ভালো কাজ করা হইবে। আমার অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক কাজে ব্যয়িত হইয়া থাকে। তব এই-সব সংগঠনের উন্নয়নের জন আমি যথাসাধ্য করিয়া থাকি।

বসু-ব্রেইলসফোর্ড সাক্ষাৎকার

২০ নভেম্বর ১৯৩০ কলিকাতায় ব্রিটিশ নেতা এইচ. এন. ব্রেইলসফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ব্রেইলসফোর্ড : মি. বসু, আমি শুনিয়াছি যে আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে এমন-কি, যদি অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দানের কথা ঘোষণা করাও হয় তবু আপনি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগ দিবেন না।

বসু : হাঁ।

ব্রেইলসফোর্ড : আমি কি জানিতে পারি কেন ?

বসু : তিনটি কারণে :

১. অর্থনৈতিক দিক হইতে দেখিলে, এমন-কি, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলেও আমরা গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে থাকিব এবং ব্রিটেনের সে প্রভুত্ব আমাদের দেশের স্বার্থের অনুকূল হইবে না। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা পাইলে বিদেশী শোষণের মোকাবিলা করার পক্ষে বেশি শক্তি ও সামর্থ্য আমরা লাভ করিব। ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলে তাহা হইবে না।

২. রাজনৈতিক দিক হইতে দেখিলে, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলে ইংলন্ডের সংগে আমাদের যে ধরনের সম্পর্ক রাখিতে হইবে সেই সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আমরা কী লাভ আশা করিতে পারি তাহা আমি বুঝি না।

৩. মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে দেখিলে, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলেও আমাদের দেশবাসীর মনে হীনমন্যতাবোধ থাকিয়া যাইবে, উহা আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে বাধাস্বরূপ হইবে।

ব্রেইলসফোর্ড : আপনি কি মনে করেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বলিতে এখন যাহা বুঝায় সেই অর্থ অনুসারে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইলেও আপনার আশংকা-মতো এমন হীনমন্যতাবোধ থাকিয়া যাইবে যে তাহাতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন বাধাপ্রাপ্ত হইবে ?

বসু : হাঁ। অংশত, দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসনাধীন থাকার ফলে ও অংশত, বর্তমান-প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশী শাসকদের সুকৌশলে যে ভাবধারা প্রচারিত হয় সাধারণভাবে হীনমন্যতাবোধ দূর হইয়া মনুষ্যত্ব-বোধের স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশ আমাদের দেশে ঘটিবে না।

ব্রেইলসফোর্ড : আপনি যদি এইভাবে সমস্যার বিচার করিয়া থাকেন তবে

আপনার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখিতেছি ইহার ফলে সংগ্রাম অনির্দিষ্ট কালের জন্য দীর্ঘায়িত হওয়া অনিবার্য। এ বিষয়ে আমার মতামত খোলাখুলি বলিতেছি। আমার মনে হয় লাহোরে দলের নেতারা আর-একটু সাহস অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ এই বৎসরের মধ্যেই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করিতে পারিত। তবে যতই হোক, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইবে। তবে হ্যাঁ, স্বাধীনতার কথা যদি বলেন তবে আরো বহু বৎসর আপনাদের সংগ্রাম চালাইতে হইবে ও পরিণামে রক্তাক্ত যুদ্ধও হইবে।

বসু: হাঁ, সে সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন আছি। কিন্তু রক্তাক্ত যুদ্ধ কেন অনিবার্য হইবে আমি বুঝিতেছি না। অন্তত তত্ত্বগত দিক হইতেও বলা চলে যে হিংসার প্রয়োগ ছাড়াও সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে বিদেশী শাসনকে পুরোপুরি ভাঙিয়া দেওয়া যায়। আমি যতদূর জানি রাশিয়ায় হিংসাত্মক ঘটনার বিশেষ আশ্রয় না লইয়াই সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল। কারণ জনগণ ও সৈন্যবাহিনী সোভিয়েতের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। ফলে প্রতি-বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রিপাবলিক উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল তখনই রক্তপাত ও সন্ত্রাস দেখা দিয়াছিল। ফলত তত্ত্বগত দিক হইতে অন্তত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব।

(ঈষৎ হাসিয়া) আপনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন আমি কেন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সব প্রস্তাব বাতিল করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপর জোর দিতেছি। কিন্তু আমি কি আপনাকে প্রশ্ন করিতে পারি, আপনারা যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে রাজি থাকেন তবে স্বাধীনতার দাবি মানিতে আপনারা রাজি নন কেন? ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে ইহাতে আপত্তি কোথায়?

ব্রেইলসফোর্ড: ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিব যে সমগ্র ভারতবর্ষ যদি চায় তবে স্বাধীনতার অধিকার আমি স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু এ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দেশের বহুসংখ্যক মানুষের মতামত আমি জানি: তাহাতে আমি বলিতে পারি যে ভারতের স্বাধীনতা উভয় দেশের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়াই আসিতে পারে। তাহা ছাড়া ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ও স্বাধীনতার মধ্যে এতদূর পার্থক্য নাই যে তাহার জন্য এত যন্ত্রণা ও রক্তপাত সহ্য করিতেই হইবে। বাস্তব দিক হইতে বলিতে গেলে, আমি আমার যে ভারতীয় বন্ধুরা স্বাধীনতার দাবি করিতেছেন তাঁহাদের

অনুরোধ করি যে এই পর্যায়ে ঐ দাবি লইয়া তাঁহারা যেন পীড়াপীড়ি না করেন। তাহা করিলে ইংলণ্ডে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হইবে। সেখানে কড়া রক্ষণশীলদের প্রভাব এখন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু আলোড়নের সুযোগে তাহারা আবার তাহাদের পূর্বতন প্রভাব ও ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবে।

ছাত্রদের প্রতি

২৩ নভেম্বর ১৯৩০ পাবনা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে শারীরচর্চা প্রদর্শন ও সম্বর্ধনার জবাবে প্রদত্ত ভাষণ।

ছাত্র ও যুবকরা আমাকে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছ সেজন্য আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিতেছি। তোমরা যে সুন্দর ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছ আমি তাহার প্রশংসা করিতেছি। তোমরা ভুলিয়ো না যে তোমাদের পূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিতে হইবে। নবীনতর প্রজন্মের সর্বাংগীণ বিকাশের জন্য তোমাদের কাজ করিতে হইবে। তোমাদের স্বাগত ভাষণে তোমরা বলিয়াছ যে তোমাদের কর্মসূচী কী হইবে তাহা যেন আমি বলিয়া দিই। তোমরা মুক্তি-পাগল হইবে ও অন্যদের মুক্তিপাগল করিয়া তুলিবে— ইহাই তোমাদের কর্ম-সূচী। যখন তোমাদের হৃদয়ে মুক্তিপিপাসা জাগিয়া উঠিবে তখন কর্মসূচী স্থির করা তোমাদের পক্ষে কণ্টকর হইবে না। তোমরা কি জাগিয়া উঠিবে? তাহা হইলে তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত কর্তব্যপথ তোমরাই আবিষ্কার করিয়া লইতে পারিবে। আমার আশা এই যে ইতালির মাৎসিনি ও বাংলার আদর্শ-বাদী দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টান্ত তোমরা ভুলিবে না। রাশিয়া, চীন, ইতালি ও জাপানের যুবকরা যাহা করিয়াছে তোমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। হয়তো সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোটা তরুণতর প্রজন্মকে আত্ম-বলিদান দিতে হইবে। ইহাতে তোমাদের ভয় পাইবার কিছু নাই। ব্যক্তির মৃত্যুবরণেই জাতির জীবনরক্ষা সুনিশ্চিত হইতে পারে। তোমরা কাজ করিতে, কণ্ট ভোগ করিতে, ত্যাগ স্বীকার করিতে ও আবশ্যক হইলে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হও। তোমরা আত্মবিশ্বাসী হও ও দেশবাসীর উপর আস্থা রাখ। বিশ্বাসের বলে পর্বত পর্যন্ত টলিতে পারে।

ভারতবর্ষ এতদিন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথ অনুসরণ করিয়াছে। তাই

শোচনীয় অধঃপতন ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশে এমন সব মহাবীর জন্মিয়াছেন যাঁহারা জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দেশ আজ ব্যক্তিতান্ত্রিক বিকাশ চায় না। দেশ চায় সমষ্টিগত সাধনা। তাই ছাত্র ও যুবকদের এখন সংগঠিত শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিতে হইবে। জাতীয় বাহিনীর পুরোভাগে আগাইয়া আসিয়া তোমাদের স্থান লইতে হইবে।

ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট

৩০ নভেম্বর ১৯৩০ খুলনার সাতক্ষীরা শহরে প্রদত্ত ভাষণ।

ভারত এখন বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। কিন্তু ইংরেজ-আমলের আগে এ অবস্থা ছিল না। বরং সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশ হিসাবেই তাহার খ্যাতি ছিল। তাহার ঐশ্বর্য ও অপরাপর সম্পদের খ্যাতিতে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ আকৃষ্ট হইত।

ভারত আজ যে চরম দারিদ্র্যাবস্থায় নীত হইয়াছে উহা একদিনে ঘটে নাই। গত দেড় শত বৎসরে ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

বর্তমানে ভারতে ৯১০ কোটি টাকা মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য ভারতে আমদানী করা হয়। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ টাকা ভারত হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। আগে ভারত যখন জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে স্বয়ম্ভর ছিল তখন এই বিশাল পরিমাণ অর্থ দেশের ভিতরেই থাকিত। ল্যাংকাশায়ারে উৎপাদিত বস্ত্রের কাটতির জন্য এদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করা হইয়াছে। এখন আপনাদের চোখ খুলিয়াছে। ব্রিটিশ বস্ত্র কঠোরভাবে বয়কট করুন। ভারতের দেশজ বস্ত্রশিল্প তাহার ফলে পুনরুজ্জীবিত হইবে। সন্দেহ নাই যে ইহাতে আপনাদের কষ্টভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আপনাদের বহুবিধ ক্লেশভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া স্বরাজের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে।

শ্রমিকদের প্রতি

১ ডিসেম্বর ১৯৩০ বজবজ তৈল ও পেট্রোল শ্রমিকদের সভায় সভাপতির ভাষণ।

ব্যাবসা-বাণিজ্যে যে মন্দা আসিয়াছে সেজন্য আপনারা নৈরাশ্যগ্রস্ত হইবেন না। বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই মন্দা আসিয়াছে। তাহার প্রভাব এখানেও পড়িতেছে। প্রায় সব কোম্পানিই, এমন-কি, টাটা ও বার্মা অয়েল কোম্পানিও লোক ছাঁটাই করিতেছে। এ পরিস্থিতিতে আপনারা আপনাদের ইউনিয়নকে শক্তিশালী করুন। আপনাদের মালিকরা আশ্বাস দিতেছেন যে তাঁহারা শ্রমিক অফিস খুলিবেন ও আপনাদের স্বার্থ দেখিবেন, অতএব আপনারা আপনাদের ইউনিয়নগুলি ভাঙিয়া দিন। এ আশ্বাসে ভুলিবেন না।

পাটের বাজারে মন্দা আসিয়াছে। সেজন্য আপনাদের ভ্রান্তিই দায়ী। কংগ্রেস হুঁশিয়ার করিয়া বলিয়াছিল যে অত্যধিক পাট উৎপাদনের প্রয়োজন নাই। আপনারা সেই কথায় কান দেন নাই। ফলে এখন চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হইয়া পড়িয়াছে।

ছাত্রদের প্রতি

৭ ডিসেম্বর ১৯৩০ চুয়াডাঙ্গা টাউন হলে ছাত্রসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আদর্শের নিরন্তর অনুসরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেই জীবনের মৌল সত্য ও তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। তোমাদের আদর্শ কী? সমগ্র ভারতের অখণ্ড ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর শাশ্বত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এক নূতন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাই তোমাদের আদর্শ।

সব কাজের পিছনেই একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই। তোমরা যে পরাধীন এই তীব্র বোধ ও স্বাধীনতা লাভের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষাই তোমাদের সেই উদ্দেশ্য। দাসত্ববোধের জ্বালা যে অনুভব করিয়াছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাগল করিয়া তোলে। সে কাহারো আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না, কোনো সুচিন্তিত কর্মসূচীর জন্যও বসিয়া থাকে না। দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া বা থামিয়া থাকা যৌবনের ধর্ম নয়। অনিবার্য কঠোর সংকল্প ও চরম আত্মত্যাগ করাই যৌবনের ধর্ম।

তোমাদের আদর্শ ন্যায়সংগত ও যুক্তিযুক্ত। তাই তোমাদের আদর্শ জয়-যুক্ত হইবেই। ভারত স্বাধীন হইবে কিনা প্রশ্ন তা নয়। স্বাধীনতার মূল্য দিতে যে মুহূর্তে ভারত প্রস্তুত হইবে সেই মুহূর্তেই ভারত স্বাধীন হইবে। স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারে যুবকরাই। সে মূল্য দিতে তোমরা অগ্রসর হও।

রাইটার্স বিল্ডিংসে আক্রমণ

১০ ডিসেম্বর ১৯৩০ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের অভিযানে কর্নেল সিম্পসন নিহত ও মি. জে. ডবলু. নেলসন আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা।

অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ—

এই সভায় যে প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে তাহা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রূপেই নয়, এই প্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতা রূপেও আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির কাছে কংগ্রেসীদের মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বলার জন্য কয়েকটি কথা বলা আমার কর্তব্য।

সোমবার যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। এ দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে কংগ্রেসী কর্মসূচী কংগ্রেসী নেতারা পুরাপুরি প্রভাবিত করিতে পারেন নাই। সেই ব্যর্থতা স্বীকার করার উদ্দেশ্যেই আমি এই কথাগুলি বলিতেছি।

ঐ ঘটনা আমাদের সকলকেই মর্মাহত করিয়াছে। ঐ ঘটনা কেন ঘটিল তাহার গভীরতর হেতুসমূহ আবিষ্কার করার জন্য প্রথম সুযোগেই আমাদের প্রয়াসী হইতে হইবে। আমাদের মনের উত্তেজনা কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইলেই আমরা ইহা করিতে পারিব বলিয়া আমি আশা করি। এই ঘটনাগুলির জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের বিপথগামী যুবক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে না। যে সত্যটি এখন প্রকট তাহা হইল আজিকার ভারত স্বাধীনতা চায় এবং অচিরেই তাহা পাইতে চায়। আর একটি সত্য এই যে এদেশে এমন লোক আছে— তাহাদের সংখ্যা যাহাই হোক-না কেন— যাহারা কংগ্রেসের কর্মসূচী অনুসরণ করিয়াই যে স্বাধীনতা পাইতে

চায় তাহা নয়, আবশ্যক হইলে যে-কোনো মূল্যে ও যে-কোনো পন্থায় তাহারা স্বাধীনতা পাইতে চায়।

কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচী কী তাহা কংগ্রেস বারবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব জানে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অহিংসায় অংগীকারবন্ধ। কিন্তু কেন মহাত্মা গান্ধী হইতে শুরু করিয়া সাধারণ একজন গ্রামের কংগ্রেস কর্মী পর্যন্ত সকলের যথাসাধ্য প্রয়াস সত্ত্বেও এই দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মন ও বিচারধারাকে প্রভাবিত করিতে পারা যায় নাই? আমাদের এ ব্যর্থতার কারণ এই যে কংগ্রেসের কর্মসূচীর সাহায্যে এখনো স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পরিণামে ভারত একদিন স্বাধীন হইবেই। কিন্তু একমাত্র কংগ্রেসের কর্ম-সূচীই যে দেশবাসীর অনুসরণযোগ্য তাহা যতক্ষণ ঐ কর্মসূচীর সাফল্য দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারি ততক্ষণ সকল দেশবাসীকে কিভাবে অহিংসা ব্রতে দীক্ষা দেওয়া যাইবে তাহা তো আমি বুঝিতেছি না।

আরো একটি বিষয় আমি আপনাদের কাছে পেশ করিব। গত দুই বৎসর যাবৎ সরকার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন দেশবাসীর মনের উপর তাহার বিশেষ কোনো প্রভাব পড়িয়াছে কিনা তাহাও আমি আপনাদের বিবেচনা করিতে বলিব। যে-সকল অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে আমি সেগুলির কথা বলিতেছি। আমি জেলে থাকা কালে সরকারের কয়েকজন দায়িত্ব-শীল প্রতিনিধির সংগে খোলাখুলি আলোচনা করার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের স্পষ্টভাবে এ কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম যে এইভাবে একের পর এক যদি অর্ডিন্যান্স জারি হইতে থাকে, যদি জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যদি প্রেস অর্ডিন্যান্সের মতো অর্ডিন্যান্স চাপাইয়া দেওয়া হইতে থাকে ও তাহার ফলে প্রকাশ্য কাজকর্মের সব পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে কংগ্রেস নেতারা এ কথা কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে তাঁহাদের কর্মসূচীই একমাত্র ফলপ্রদ কর্মসূচী। এই সব অর্ডিন্যান্সের ফলে স্বাধীনতার স্পৃহা দমিত হইবে না— কেননা উহা দমন করা অসম্ভব— কিন্তু ইহার একমাত্র ফল দাঁড়াইবে আন্দোলনকে গোপন পথচারী করিয়া দেওয়া। আমি দুঃখিত যে আমার মন্দতম শংকাগুলি এখন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। আমি প্রত্যেককে— তিনি আমার স্বদেশবাসী হোন কিংবা ইংরেজই হোন, আশ্বস্ত করিতে পারি যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও

সহজতম পথ হিসাবে অহিংসার পথই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সাময়িক বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদের দেশবাসী এই পথ আঁকড়াইয়া থাকিবে ও এই পথ অনুসরণ করিয়া নিকট ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জন করিবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যসাধন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যুবকদের নিন্দা করিয়া বা বিপথগামী অভিহিত করিয়া প্রস্তাব পাস করাইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না বলিয়া আমি আশা করি। যে-সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহার পশ্চাতে যে গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক হেতু আছে তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

স্কটিশ চার্চ কলেজ শতবার্ষিকী

১২ ডিসেম্বর ১৯৩০ স্কটিশ চার্চ কলেজ শতবার্ষিকী উৎসবে প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে ভাষণ।

ইতিহাসে যত ধর্মপ্রচারক-সম্রাটের কথা জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে সম্রাট অশোকই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য জগতে ভারতের ধর্মের সুমহান বাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। সেই ঘটনার পর বাইশ শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে ভাবধারার গতিপথ পালটাইয়াছিল। পাশ্চাত্য হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন একটি প্রাচ্য ধর্মের প্রচারকগণ। সঙ্গে তাঁহারা আনিয়াছিলেন খ্রীস্টের বাণী ও মানব মুক্তির বাণী। তখন আমাদের প্রাচীন দেশে রেনেসাঁসের যুগ উদিত হইল। আমাদের চিত্তে অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগিয়াছে ও আমাদের মন সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেই জাগরণের শত বৎসর পূর্তি উৎসব আজ আমরা আনন্দের সঙ্গে পালন করিতেছি।

যাঁহারা সে জাগরণে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। চিন্তার রাজ্যে আমরা বিপ্লবের সন্তান। সে যুগে শিক্ষার যে আলো জ্বালানো হইয়াছিল আজ তাহা পূর্ণতর রূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে; আজ সহজতরভাবে ও অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যকেই শুধু নয়, আমাদের মনেরও গভীর প্রদেশ জানিতে বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারি। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও আমরা এখন পূর্ণতর রূপে অনুধাবন করিতে পারি।

স্কটিশচার্চ কলেজ শতবার্ষিকী। ১২ ডিসেম্বর ১৯৩০

কলিকাতা কর্পোরেশন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩:

নানা কার্যক্ষেত্রে জড়িত থাকিয়া আমরা সকলেই সচেতন বা অচেতনভাবে আমাদের প্রতি কর্মে, এই কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহার প্রভাব অনুভব করিতেছি। সৌভ্রাতৃত্বের যে অদৃশ্য বন্ধন সহানুভূতি ও ভালোবাসায় আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে আমরা তাহাও অনুভব করিতেছি। আজ পর্যন্ত বহু বন্ধুত্বের যে যোগ উজ্জ্বল রহিয়াছে তাহা প্রথম এখানেই সূচিত হইয়াছিল।

সুখের বিষয়, আমাদের কলেজের শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া আমরা নিজেদেরই অভিনন্দন জানাইতেছি। কারণ আমরা এ কথা ভুলিতে পারি না যে আমাদের লইয়াই এই কলেজ এবং আমরাও এই কলেজের। আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে এই কলেজের এই প্রথম শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অপেক্ষা ইহার দ্বিতীয় শতবার্ষিকী উৎসব অধিকতর ঔজ্জ্বল্য-সহকারে পালিত হইবে।

চলচ্চিত্র শিল্প

১৯ ডিসেম্বর ১৯৩০ কলিকাতা চিত্রা সিনেমা হলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কলিকাতার মেয়র রূপে প্রদত্ত ভাষণ।

আপনারা হয়তঃ জানেন আমি কদাচিৎ সিনেমা দেখিতে যাই। গত কয়েক বছরে আমি কয়েকবার মাত্র ছবি দেখিতে গিয়াছি এবং তাহাও দেশী ছবি। এই সিনেমা হল ও যে ছবিটি এখানে প্রদর্শিত হইবে তাহা দেশী উদ্যোগ ও প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আপনারা ইতিমধ্যেই জানিতে পারিয়াছেন, কাহার অর্থে ও উদ্যোগে এই প্রদর্শনী গৃহটি নির্মিত হইয়াছে। আমাদের বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত চলচ্চিত্রটি এখানে প্রথম প্রদর্শিত হইবে। আমাদের দেশজ প্রতিভা ও উদ্যমের স্মারক হইবে 'চিত্রা'। শ্রীকান্ত-চরিত্রের জটিল সৌন্দর্য, শক্তি ও মহিমাও আমরা অনুভব করার সুযোগ পাইব।

আমাদের সিনেমা হলগুলিতে আজকাল খুব ভিড় দেখা যায়। অনেক সময়ই চলচ্চিত্র নিরর্থক, এমন-কি, ক্ষতিকর হইয়া থাকে। সমস্যা হইল, চল-

চিত্রকে কিভাবে সার্থক করা যায়। আপনারা জানেন, অন্যান্য দেশে, বিশেষত রাশিয়ায় চলচ্চিত্রকে শিক্ষাপ্রদ করা হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এদেশের সেন্সর বোর্ড জাতির প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে অক্ষম ও সেজন্য চলচ্চিত্রের মান যথাযথ বিচার করিতে পারে না। আমরা যদি এমন একটি বোর্ড পাইতাম যাহা আমাদের রুচি বুঝিতে সক্ষম ও আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন সহানুভূতির সংগে বিচার ক᳞ মতো কল্পনাশক্তির অধিকারী তাহা হইলে আমাদের দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের উহা সাহায্য করিতে পারিত।

আমাদের দেশবাসীর কর্তব্য জাতীয় শিল্পরূপে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সাহায্য করা। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে বাঙালীরা এ বিষয়ে প্রয়াসী হইয়াছে। আমি আশা করি আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটিবে। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি এই হলটির নির্মাতাদের আপনারা পরামর্শ ও সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা সাহায্য করিবেন। আমি এখন হলটি উন্মুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে নূতন শক্তি

২৭ ডিসেম্বর ১৯৩০ হাওড়া জেলার শাঁকরাইলে জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

ইংরেজ রাজত্বের ১৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাই এখন হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। ভারতের কি কোনো উন্নতি হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন্ দিকে? যদি ভারতের উন্নতি না হইয়া থাকে তবে আমাদের কর্তব্য কী?

ভারতে প্রতিভার অভাব নাই। বর্তমান অবনত অবস্থা সত্ত্বেও ভারত কবি, মনীষী, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়াবিদ, কুস্তিগীর, ব্যবসায়ী প্রভৃতির জন্ম দিয়াছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের বর্তমান কীর্তি যদি এতখানি হইয়া থাকে তবে ভারত স্বাধীন হইলে তাহার কীর্তি কত-না বেশি হইবে।

স্বাধীনতার অর্থ হইল মানুষ হিসাবে স্বাধীন রূপে বাঁচিবার ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের স্বাধীনতা। সমাজের বিশেষ কোনো অংশের সে স্বাধীনতা

থাকলে চলিবে না, সমগ্র সমাজের সে স্বাধীনতা থাকা চাই। স্বাধীন ভারতকে এ দেশের জনসাধারণের সকল অংশ ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হইল জ্বলন্ত মুক্তি-পিপাসা। এই মুক্তি-পিপাসায় আত্মার প্রতিটি কোণ ও জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আকুল হইয়া ওঠা চাই। স্বাধীনতার এই পিপাসার সংগে সংগে আরো যাহা চাই তাহা হইল যে বন্ধন আমাদের জীবন ও আত্মাকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছে সে বন্ধনের জন্য বেদনা ও অপমানবোধ। স্বাধীনতার আকাংক্ষা ও বন্ধনের বেদনা একই মানসিক অভিজ্ঞতার দুই দিক।

বিশ্বের সংগে ভারতের কোনো কলহ নাই। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন স্বাধীন ভারতও তেমন স্বাধীন হইতে চায়। ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে অন্তর্নিহিত বা একান্ত বিরোধ কিছু নাই। বর্তমান সংঘর্ষের হেতু হইল ভারতীয়দের তাহাদের অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা। যখন উহা প্রত্যর্পিত হইবে তখনই এই সংঘর্ষের অবসান ঘটিবে। বিশ্বের সংগে তখন ভারতের শান্তির সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। বর্তমান সংগ্রামের জন্য ভারতীয়দের দায়ী না করিয়া ইংরেজদেরই দায়ী করা উচিত।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ন্যায়, সাম্য ও সত্য ভারতীয়দের পক্ষে, তাই তাহাদের আদর্শই জয়যুক্ত হইবে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যাহা ভারতকে তাহার ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে।

প্রশ্ন এই যে, ভারতের স্বাধীনতা আমরা কোন্ পদ্ধতিতে লাভ করিব? বর্তমানে আমাদের কর্মসূচীর প্রধান অংগ হইল বয়কট। বয়কট ফলপ্রদ ও সার্থক করিতে হইলে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। বয়কট ও স্বদেশী— এই দুই আন্দোলন আপনাদের একসংগে চালাইতে হইবে।

১৯২৭ সালে আমার কারামুক্তির পর হইতে আমি দেশবাসীকে কয়েকটি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। প্রথমত আমি কংগ্রেসীদের বলিতেছি যে কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষ উত্তরোত্তর অধিকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। দরিদ্রতমরাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। তাহারা জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন অলীক হইয়া থাকিবে। যদিও সাম্প্রতিক অতীতে কংগ্রেস শ্রমিকদের দিকে ঝুঁকিয়াছে তবু অনেক কিছু করা বাকি আছে। নারী-মুক্তিও চাই। রাজনৈতিক সংগ্রামে নারীর

অংশগ্রহণ আবশ্যক। আমি যখন এ কথা বলি তখন প্রথম প্রথম আমি বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলাম। কিন্তু মা ও ভগিনীরা আমার আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। ফলে এ বছরের আন্দোলনে নারীরা বিরাট অংশ লইয়াছেন। তাঁহারা ঐভাবে অংশ না লইলে এই আন্দোলনের কী পরিণতি হইত তাহা কে বলিতে পারে। অনুন্নত শ্রেণীদের মুক্তির কথাও আমি বলিয়াছি। এই অবহেলিত শ্রেণীগুলি মুক্তির পূর্ব স্বাদ পাইলে তাহারা জাতীয় সংগ্রামে হৃদয়মন দিয়া যোগ দিবে।

আমি দেশবাসীর মনে গভীরতর দায়িত্ববোধ ও জীবন সম্পর্কে গুরুতর মনোভাব জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই-সব বিষয়ে আমি কতদূর সফল হইয়াছি দেশবাসীই তাহা বিচার করিবেন।

আপনারা আমাকে যে স্নেহ ও সম্মান জানাইয়াছেন সেজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার উপর যে এত স্নেহ বর্ষিত হইয়া থাকে সেজন্য আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করি। আমি যে স্নেহ ও সম্মান পাইয়াছি আমি যেন তাহার কিছুমাত্র যোগ্যও হইতে পারি, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বর্তমান আন্দোলন

১ জানুয়ারি ১৯৩১ প্রাদেশিক কংগ্রেসের কমিটি কর্তৃক আয়োজিত এবং মগরা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ভাষণ।

যখন কোনো বিদেশীর হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজেদের বিষয়গুলি আমরা নিজেরাই বন্দোবস্ত করিতে পারিব তখনই আমরা স্বরাজ লাভ করিব। জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজলাভের তৃষ্ণা যখন জাগিয়া উঠিবে তখনই আমরা স্বরাজ পাইব। গত ১৫০ বছর যাবৎ ভারতবাসীরা তাহাদের ভালোমন্দের ভার বিদেশী শাসকদের উপর দিয়া আসিয়াছে। এখন গভীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া তাহারা দেখিতেছে যে তাহাদের দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেশের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, পূর্বে যে শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল তাহা এখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পাশাপাশি অনেক প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহারা দেখিতেছে যে ঐ একই সময়ে জীবনের সকল বিভাগে তাহাদের বিরাট

অগ্রগতি হইয়াছে। এই চেতনার ফলেই তাহারা তাহাদের বিদেশী শাসকদের কাছে তাহাদের এতদিনকার পরিচালনার হিসাব দাবি করিতেছে।

এ দেশে ইংরেজ আগমনের আগে জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর ছিল। শুধু তাহাই নয়, তাহারা এত উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন করিত যাহাতে বিশ্বের অপরাপর দেশের সঙ্গে একটি সমৃদ্ধ বৈদেশিক বাণিজ্য তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বিগত দেড় শত বৎসরের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। উহা এতদূর পরিবর্তিত হইয়াছে যে এখন নিত্য-ব্যবহার্য অতি সাধারণ জিনিসের জন্যও বিদেশ হইতে আমদানীর উপর আমাদের নির্ভর করিতে হয়। ইহার ফলে দেশ রিক্ত না হইয়া যায় না। তাহার অনিবার্য ফল হইল দারিদ্র্য, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও জীবনের অন্যান্য পাপ। আমরা স্বরাজ চাই— যাহাতে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে, আমাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের ব্যাবসা ও বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষমতাও আমাদের হাতে আসে। ইংরেজ জাতি তাহাদের স্বদেশে যে-সব অধিকারের জন্য দীর্ঘকাল লড়াই করিয়াছে আমরা যদি আমাদের দেশে সেই সব অধিকার লাভ করি তাহা হইলে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের কোনো বিবাদ থাকিবে না।

আমাদের দেশবাসীর অনেকের মনে গোলটেবিল বৈঠক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এখন বুদ্বুদ কাটিয়া গিয়াছে। দেশের সকল শ্রেণী বুঝিতে পারিয়াছেন যে গোলটেবিল বৈঠক একটি মায়া ও ভ্রান্তি মাত্র, উহা আমাদের জন্য পাতা ফাঁদ। ইংরেজ রাষ্ট্রনেতারা বিচক্ষণ লোক। গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের যে-সব তথাকথিত প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে তাঁহাদের বেশিক্ষণ সময় লাগে নাই। ইংরেজরা যখন দেখিলেন যে এই লোকগুলির বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা নাই তখন তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার শুরু করিলেন যে সামান্যতম আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ তাহার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া পারিত না।

কিন্তু আমি দুঃখিত যে বর্তমানে দেশে যে আন্দোলন চলিতেছে আপনাদের জেলার নারীসমাজ তাহাতে যথোপযুক্ত সাড়া দেন নাই। এ অবস্থার জন্য পুরুষ কর্মীরাও অনেকাংশে দায়ী। বাংলার অন্যান্য জেলার মেয়েরা জাতীয় কর্মে যোগ দিয়াছেন। এই জেলায়ও তাঁহারা যেন জাতীয় কর্মে অংশ নেন তাহা দেখার ভার পুরুষ কর্মীদের। মহাত্মাজী এই আন্দোলনে

যোগ দিবার জন্য সকলকে আহ্বান জানাইয়াছেন। বাংলার মা ও বোনেরা সে আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়াছেন। বর্তমান আন্দোলনের ইহাই সবচেয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য। হুগলি জেলার নারীসমাজ এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, ইহা বিশ্বাস করিতে আমি অনিচ্ছুক। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কিছুটা উৎসাহ দিলে স্বামী ও ভাইদের পাশে তাঁহারা সানন্দে আসিয়া দাঁড়াইবেন।

সমন্বয়ের নূতন আদর্শ

৮ জানুয়ারি ১৯৩১ চন্দননগর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে প্রবর্তক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

বাঙালীর গত এক শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বাঙালীর প্রতিভা মতবাদের বৈচিত্র্য ও সংঘাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন ও উহাতে সফলও হইয়াছিলেন তাহা বাঙালী জাতির গত প্রজন্মের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের সেই সমন্বয়ের নীতিতে আজ আর কাজ চলিবে না। সামাজিক জীবন জটিল হইয়া উঠিয়াছে, নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের নতুন সমাধান চাই। এই সমস্যার স্বরূপ দেশবন্ধু ও শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন। এই দুই জন মনস্বী পুরুষই স্বামী বিবেকানন্দের অনুসারী; তাঁহারা উভয়েই নিজস্ব রীতিতে দেশের সামনে সেবার ও ত্যাগের আদর্শ রাখিয়াছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই আদর্শ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে।

দেশবন্ধুর আদর্শ এখনো সম্যক উপলব্ধ হয় নাই। ইহার পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। একজন নতুন মহাপুরুষ সেই ব্যাখ্যা দিবেন ও জীবনে রূপ দিয়া দেখাইবেন। আমাদের বর্তমান কর্তব্য হইল সেজন্য জমি প্রস্তুত করা, সেই মহামানবের আগমনের পথ প্রশস্ত করা। আমাদের তরুণ কর্মীদের অনেকের মন নৈরাশ্যবাদে পূর্ণ হইয়াছে। উহা দূর করিয়া বিশ্বাস লইয়া আমাদের বাঁচিতে হইবে ও কাজ করিতে হইবে।

শ্রমিকদের প্রতি

১২ জানুয়ারি ১৯৩১ জামশেদপুরে প্রকাশ্য শ্রমিকসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

আর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। শ্রমিকদের শক্তিতেই নেতার শক্তি। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের শক্তির জোরেই নেতা পথ করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন।

সন্তুষ্টচিত্ত শ্রমিকই শিল্পে পুঁজিপতিদের পক্ষে সম্পদস্বরূপ। বিপরীত পক্ষে, উভয়ের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব শিল্পে ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। পুঁজিপতিরা যদি শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি নজর দেন, শ্রমিকরাও তবে বেশি কাজ করিবে, শিল্পের উৎপাদন বাড়িবে, সকলেরই তাহাতে লাভ হইবে। জামশেদপুরের টিনপ্লেট কোম্পানি বা বজবজের বর্মা অয়েল কোম্পানির কথা ধরুন। ঐ কোম্পানি দুটির মালিকরাই ঐ দুইটি শিল্পে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী।

জামশেদপুরের শ্রমিকরা এখন নিজেদের মধ্যে কলহের আবর্তে পড়িয়াছেন। যদি অবিলম্বে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যেকার মতবিরোধ মিটাইয়া না ফেলা যায় তবে আশা করার মতো কিছু থাকিবে না।

অখণ্ড জীবনের উন্নতি চাই

১৩ জানুয়ারি ১৯৩১ কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটি-কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।

জীবন অখণ্ড সত্য; ফুল যখন ফোটে তখন তাহার সকল পাপড়ি ফোটে। ফুল যখন শুকাইয়া যায় তখন তাহার প্রত্যেক পাপড়িই শুকাইয়া আসে। জীবনও ফুলের মতো। যখন সে জাগে তখন সেই জাগরণের রক্ত-আভা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যক্তিগত জীবনে এই কথা যেমন খাটে, জাতির জীবনেও এই কথা তেমনিই খাটে। আজ আমাদের জাতি নব-জীবনের স্পর্শ পাইয়াছে, সে ভাঙিবার ও গড়িবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইয়াছে। জীবনের লক্ষণ, সৃষ্টি-ক্ষমতা। আজ নবজীবনের আলোকলাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতি অতীতের যাহা-কিছু অকল্যাণকর তাহাকে ধ্বংস করিতে প্রস্তুত

হইয়াছে, সেই ধ্বংসের উপর জাতি নূতন সৌধ গড়িতে চায়। এই ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়াই জাতি জাগিবে।

আমরা Local body-র মধ্য দিয়া কিছু ক্ষমতা পাইয়াছি, কংগ্রেস এইজন্য উহা বর্জন করে নাই। আমাদের বিরোধী যাঁহারা তাঁহারা বলেন, আমরা democracy সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমরা জানি, জাতির জীবনের অনেক বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনের সম্পর্ক ছিল। Local Self-Government একদিন আমাদের দেশেও ছিল; অনেক বিদেশীও এ কথা স্বীকার করেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েত জাতির সম্পদ ছিল— ইতিহাস ইহা প্রমাণ করে। 'ভোট'— এই কথার প্রতিশব্দ পালিতে আছে। চেয়ারম্যান কথার আধুনিক বাংলায় কোনো প্রতিশব্দ নাই— কিন্তু পালিতে আছে "নগরশ্রেষ্ঠী"। নগরশ্রেষ্ঠী কথাটি Chairman কথারই প্রতিশব্দ। আমাদের জাতিস্মর হইতে হইবে— নিজেদের সম্পদকে চিনিতে হইবে। অবশ্য এ কথা আমরা কখনো বলি না, ইংরেজের নিকট হইতে আমাদের শিখিবার কিছু নাই।

সমস্ত মহতী সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে— জাতির মনে আত্মবিশ্বাস। It is faith alone that can create— রুশকে ইউরোপের অন্যান্য জাতি বলিত অর্ধসভ্য। স্বাধীনতা লাভের পর রুশ অনেক বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কারণ তাহাদের কর্মে প্রেরণা জাগিয়াছে।

অন্তরের প্রেরণা জাতি যখন খুঁজিয়া পায়, তখন সে অসীম শক্তি লাভ করে। প্রাণের জাগরণ না হইলে সৃষ্টি হয় না। মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে জাতির জীবনে নব সৃষ্টি অসম্ভব।

মুক্ত হইলে জাতির জীবনে জোয়ার আসিবে, আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। সুযোগ যাহা পাইব তাহার সদ্ব্যবহার করিব। নগর-সেবার মধ্যে সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। মানুষের জীবন অখণ্ড। অখণ্ড জীবনের উন্নতি চাই। যে ভারত আমরা সৃষ্টি করিতে চাই তাহার ভিত্তি হইবে— ন্যায়, সাম্য ও প্রেম।

অনাঘ্রাত কুসুমে দেবপূজা

১৩ জানুয়ারি ১৯৩১ কুষ্টিয়া ছাত্র সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রের উত্তর।

মানুষ যতদিন বে-পরোয়া ততদিন সে প্রাণবান ; ইতালির ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম— স্বাধীনতা লাভের পর সেখানে দেশব্যাপী হতাশার ভাব জাগিয়াছিল। দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ ;— পাথেয় ছিল— দারিদ্র্য, অনাহার, নির্বাসন। কিন্তু সেই পরম দুঃখের মধ্যেও চলার আনন্দ ছিল— যাহাকে পাওয়া হয় নাই তাহাকে পাওয়ার স্বপ্নে মন বিভোর ছিল কিন্তু মুক্তি যেদিন আসিল— সেদিন আদর্শকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজানার পথে চলার আনন্দও লোপ পাইল। অজানা যখন মুঠার মধ্যে আসে তখন জীবনের রস থাকে কোথায় ? ইউরোপের প্রাণ আছে. কারণ অজানার পিছনে তাহাদের অভিসার। তাহারা চলিয়াছে হিমালয়ের উচ্চতম চূড়া আবিষ্কার করিতে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থা জানিতে, যাহা দূরে, যাহা রহস্যে আবৃত— তাহাকে পরিচয়ের ক্ষেত্রে আনিতে ; অজানা হাতছানি দিয়া তাহাদের ডাক দেয় ; গৃহের আরাম, পারিবারিক জীবনের সুখ— কোনো-কিছুই তাহাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়াও রাখিতে পারে না। এই পাগলামির মধ্যে যাহাদের আনন্দ, এই ক্ষ্যাপামির নেশায় যাহারা বিভোর তাহাদেরই প্রাণ আছে, এই পাগলামি চলিয়া গেলে জীবনের গতিবেগ কমিয়া যায়। যে-সব ছেলেমেয়ে শান্তি সুখ পিছনে ফেলিয়া মরণের অভিসারে চলিয়াছে তাহাদের লোকে বলে পাগল। কিন্তু এই পাগল ছেলেমেয়ের দলই জীবনকে ডাকিয়া আনে, অনাঘ্রাত কুসুমেই দেবপূজা হয়।

অবলা অর্থে নারী, এই কথা অভিধান হইতে আমাদের মুছিয়া দিতে হইবে। নারীকে অবলা বলিতে বলিতে সে অবলা হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, মানুষকে স্বাধীনতা দিলে সে উচ্ছৃংখল হইয়া যায়। এই কথা ভুল ; এমার্সন বলিতেন— 'man must live wholly from within'— মানুষকে বাঁচিতে হইবে তাহার অন্তর্দেবতার নির্দেশ মানিয়া। এক পাদ্রী এই কথা শুনিয়া এমার্সনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— মানুষ যদি কেবল নিজের অন্তরের ডাক শুনিয়া চলে, তবে যাহার অন্তর দূষিত, তাহাকে পাপ-পথে যাইতে হইবে। এমার্সন উত্তর দিয়াছেন— "If I am a son of God, I live from God ; if I am a son of devil, I live from devil." আমাদের

মূলে যদি ভগবান থাকেন, তবে আমাদের জীবনও ভগবানের পথেই পরিচালিত হইবে। আর যদি আমাদের জীবনের মূলে থাকে শয়তান, তবে শয়তানের পথেই আমাদের চলিতে হইবে।

জীবনে আমরা দিয়া যাইব, চাহিব না। যে নাম চায় না, যশ চায় না, স্বর্গ চায় না, তার দুঃখ কোথায়? আমরা যখন অন্যের নিকট হইতে কিছু চাই কিন্তু তা পাই না—তখনই আমাদের জীবনে দুঃখ আসে। স্বামিজী বলিতেন, "ফিরে যে বা চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যায়।" ইংরেজরা যতই হিসেবী হোক, যতই পদে পদে লাভ-ক্ষতির বিচার করিয়া চলুক—কাজের বেলায় কিন্তু তাহারা বে-পরোয়া। তাহারা তখন বলে—"Their's not to reason why, their's but to do and die"।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদাবি

২১ জানুয়ারি ১৯৩১ কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে অভিমত।

ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতবর্ষের জনসাধারণের তাহাতে উৎসাহ বোধ করার কারণ নাই। ঐ ঘোষণার ফলে আমাদের স্বাধীনতা মিলিবে না। বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীন হইতে চায়। তাহাদেরই মতো ভারতবর্ষও চায় স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করার অধিকারও প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় স্বীকৃত হয় নাই। আমি যদি বাংলার মন ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি তবে বলিব যে বর্তমান ঘোষণা এতই সামান্য ও অসন্তোষজনক যে বাংলা ইহা গ্রহণ করিবে না। এবং আমি বিশ্বাস করি, এ-বিষয়ে বাংলার যে মনোভাব দেশের অন্যান্য অংশেরও সেই একই মনোভাব।

আমার কথা বলিতে পারি, ভারতের আদর্শ সম্পর্কে আমার বক্তব্য বরাবরই স্ব্যর্থহীন। আমি বরাবরই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করিয়াছি যে ভারতের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা শুধু ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন নহে, ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থেই ও বিশ্বশান্তির জন্যও প্রয়োজন। ভারতীয়দের ও ইংরেজদের মধ্যে যথার্থ কোনো বিবাদ নাই বা থাকা উচিত নয়। ইংরেজরা ইংলন্ডে যে-সকল অধিকার ভোগ করে ভারতীয়রা

স্বদেশে সেই-সব অধিকার যে মুহূর্তে লাভ করিবে সেই মুহূর্তে ভারত ও ইংলন্ডের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন না হয় ততদিন সারা বিশ্বে শান্তি লাভ সম্ভব হইবে না। ১৯২৮ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসে আমি যখন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের পক্ষে সংশোধনী প্রস্তাব আনি তখন পূর্ণ দায়িত্ববোধের সঙ্গেই আমি উহা আনিয়াছিলাম। আমার এই বিশ্বাসও ছিল যে বাংলার মনোভাব আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম; সন্দেহ নাই যে আমার সংশোধনী প্রস্তাব কলিকাতা-কংগ্রেসে পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু এক বছর পর লাহোর-কংগ্রেস সেই একই আদর্শ স্বীকার করিয়া নেয়। কলিকাতায় যাঁহারা আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারাই লাহোরে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বুঝিতেছি না ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই পর্যায়ে কিভাবে সম্মানজনক আপস-মীমাংসার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান প্রস্তাবকে আলোচনার সূত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আমি আশা করি যে আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। আমি সম্মানজনক মীমাংসার বিরোধী নই। বরং এরকম মীমাংসার যতরকম সম্ভাবনা আছে সবই যথাসম্ভব যাচাই করার আমি পক্ষপাতী। কিন্তু মীমাংসার কথাবার্তা শুরু হইবার আগে প্রকৃত হৃদয়-পরিবর্তন হওয়া দরকার। হৃদয়-পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হইবে যদি আলাপ-আলোচনা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ বিধি বলে যতজনকে ডেটিনিউ করা হইয়াছে, অহিংসা বা হিংসা যে অপরাধেই যে রাজবন্দী দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন— তাঁহাদের প্রত্যেককে কারামুক্ত করিতে হইবে। হিংসার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের বেলা আমি বলিব যে হিংসা ও হিংসাত্মক কর্মপদ্ধতিকে যত নিন্দাই করি না কেন, এ কথা তো অগ্রাহ্য করা চলে না যে দুর্ভাগ্যবশত হিংসাত্মক পন্থা যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে স্বদেশের সেবা করার উদ্দেশ্যেই ঐ পথ লইয়াছেন। ১৯২১ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে যাহা করা হইয়াছিল, কম্যান্ডাণ্ট সীন ম্যাকেন, যিনি মৃত্যুদণ্ড পাইয়াছিলেন, তাঁহাকেও মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়— সেই নজীর অনুসরণ করিয়া এখানেও সব রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে-সব ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে সেগুলিও প্রত্যাহার করিতে হইবে, ইহাও আমার বক্তব্য।

আমার আশংকা হয়, যে সরকারের পক্ষ হইতে ক্ষমা ঘোষণার সময় আসিলেও শ্রমিক-আন্দোলনের সংগে যুক্ত থাকার ফলে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাঁহাদের কথা বিবেচনা করা হইবে না। সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব ; কারণ ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে শ্রমিকদেরও অংশ আছে। অতএব মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাও প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে। যথাযোগ্য মনোভাব লইয়া ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা না হইলে আপস-মীমাংসার প্রয়াস ব্যর্থ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।

নাগরিক-দায়িত্ব

২৫ জানুয়ারি ১৯৩১ কালিঘাট ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।

আপনারা প্রথম যখন আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তখন আমি উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ঘটনার বিপর্যয়ে মানসিক শান্তির অনেকখানি ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। পারিবারিক দুর্ঘটনা এবং রাজনৈতিক জীবনের অবস্থা দুই-ই মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহা ছাড়া আগামীকল্যকার ব্যাপারও মনকে অনেকখানি দখল করিয়া বসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে মুক্তিদানের সংবাদ এইমাত্র আমার নিকট আসিয়া পেঁীছিয়াছে। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই ঘটনার সংগে আগামীকল্যকার ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নাই, সুতরাং কিরূপে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহাও চিন্তনীয় বিষয়। ইহা ব্যতীত আজ সংবাদ আসিয়াছে যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর স্বাস্থ্য পুনরায় খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাও গভীর উদ্বেগের বিষয়। এই-সকল কারণে আপনাদের সাহচর্য পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিলাম না।

নাগরিকের সহযোগিতা

কলিকাতায় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। বস্তুত জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত কর্পোরেশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। দেশবন্ধু যখন কর্পোরেশনের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি নানাদিক দিয়া কর্পোরেশনের কাজে নাগরিকদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহ-

যোগিতায় যাহাতে কর্পোরেশনের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেইজন্য বিভিন্ন কমিটিতে বাহিরের লোকও নেওয়া হইয়াছে। কর্পোরেশন তিনটি বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা সুন্দররূপে পরিচালিত হইতে পারে। প্রথম, সদস্যগণের সভা, দ্বিতীয়, কর্মচারীদের কাজ, তৃতীয় নাগরিকদের সাহচর্য। এই তিনের মিলনে কর্পোরেশন পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে পারে।

সমন্বয়

কর্পোরেশনের দুইটি দিক— একটি আমলাতন্ত্র, আর-একটি গণতন্ত্র। এই দুয়ের সমন্বয়ে এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলাই প্রধান উদ্দেশ্য; কেবল আমলাতন্ত্রে কাজের যেরূপ অসুবিধা হয় কেবল গণ-তন্ত্রেও সেইরূপ অনেক সময় কাজ পণ্ড হয়। সুতরাং উভয়ের সমন্বয় চাই।

কর্পোরেশনে কোনো গলদ নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি না। এই-সকল ত্রুটির জন্য ভিতরের লোক যত সজাগ বাহিরের লোক তত সজাগ নহে। ঐ-সকল গলদ দূর করিতে হইলেও আপনাদের সহযোগিতা আবশ্যক।

জল-সরবরাহ বিভাগ

আপনারা অভিনন্দনে অনেক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জল সরবরাহ বিভাগই প্রধান। যে স্কিমে এই বিভাগের কাজ চলিতেছে, তাহা আমাদের নহে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই এই স্কিম হইয়াছিল। আমরা কেবল টাকা যোগাইয়া আসিতেছি। দায়িত্ব আমাদের নয়। এক বৎসর পরে উহা আমাদের হাতে আসিতে পারে। এই বিভাগকে সংস্কার করিবার জন্য ডা. বি. এন. দে যে স্কিম দিয়াছেন, তাহাতে দুই কোটি টাকা কর্পোরেশনের বাঁচিয়া যাইবে। আমরা সেইজন্য তাঁহার নিকট ঋণী।

এ কথা অস্বীকার করি না যে কর্পোরেশনের নিকট কাজ পাইতে হইলে আমাদের আন্দোলন করা দরকার— না-হয় কাজ পাওয়া যায় না। অনেক ওয়ার্ড আছে যেখানে বস্তুত অনেক অভাব-অভিযোগ আছে। সেখানকার অধিবাসীগণ কোনো আন্দোলন না করায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়েরও প্রতিবিধান করা হয় না। এই-সকল বিষয়ে আন্দোলন একান্ত দরকার।

অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে বলিতে চাই, বর্তমানে জলনিকাশের কাজ চলিতেছে। এই কাজ শেষ হইলে আমরা রাস্তার উন্নতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সকল

বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারি। ব্যবসায়িগণের সততা ফিরিয়া না আসিলে আইন বা শাস্তি দ্বারা ভেজাল খাদ্যের প্রতিবিধান হওয়া সুদূরপরাহত।

কাজের অসুবিধা

আমাদের অনেক সময় কাজ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। তার কারণ অনেক সময় স্কিম করিয়া তাহা গবর্নমেন্টের অনুমোদন পাইতে অনেক বিলম্ব হয়। এইজন্য অনেক কাজ পশ্চাতে পড়িয়া যায়। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও গবর্নমেন্টের সম্মতি না পাওয়ায় আমরা কাজ আরম্ভ করিতে পারিতেছি না। এই-সকল কারণে কাজের অনেক অসুবিধা হয়।

সর্বশেষে আমার বক্তব্য, দেশবন্ধুর সময়ে তাঁহার সঙ্গে আপনাদের মধ্যে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই ছিল এক সময়, তখন আমরা দেশবন্ধুর নিকট হইতে অনেক প্রেরণা পাইতাম এবং উৎসাহভরে কাজ করিতাম, তাঁহাকে হারাইয়া বাংলা যে কত অনাথ হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। আমরা এখন কেবল তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য করিয়া যাইতেছি।

লালবাজার হাজতে ব্যবহার

লালবাজার হাজতে বিচারাধীন বন্দীরূপে কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছেন তৎসম্পর্কে আদালতে বিবৃতি।

বিচারাধীন বন্দীদিগকে বাহির হইতে খাদ্য কাপড় ও অন্যান্য জিনিস লইবার সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু গত রাত্রিতে ও আজ সকালে যখন আমার জন্য বাহির হইতে জিনিস পত্র আনা হইয়াছিল, তাহা আমাদের প্রদান করিতে দেওয়া হয় নাই। ফলে গতকল্য বিকাল পৌনে পাঁচটা হইতে আমি স্নান করিতে, কাপড় ছাড়িতে ও খাইতে পাই নাই।

লালবাজার থানায় চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নাই। গতকল্য বিকাল পৌনে পাঁচটা হইতে আমি চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য বার বার বলিয়াছি— কিন্তু সামান্য টিঞ্চার আইওডিন ছাড়া অন্য কিছুই পাই নাই— তাহাও আবার শেষে

ফুরাইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার তাহা আনিতে লোক পাঠাইয়াছিল কিন্তু সে লোক আর ফিরে নাই।

আমি ব্যাণ্ডেজ ও শিলপ চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই পাই নাই। একটি থার্মোমিটার পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ৯৭ ডিগ্রীর বেশী তাপ উঠে নাই। ইহাই লালবাজারের অবস্থা।

আমি সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত তবে লালবাজারের এই অবস্থা যে কোনো গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই লজ্জার বিষয়।

আপনারা কেহ যদি হঠাৎ একবার ঐ স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে আমার সহিত এ-বিষয়ে একমত হইয়া বলিবেন, যদি জগতে কোথাও নরক থাকে, তবে তাহা লালবাজারের হাজত।

২৮ জানুয়ারি ১৯৩১

সন্ধির সর্ত

বড়লাটের সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সন্ধি হইয়াছে তাহার সর্তাবলী প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সন্ধি হইয়াছে তাহার সর্তাবলী সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশের জন্য বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও হিতৈষীগণ আমার কারামুক্তির পর হইতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এরূপ একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনো মত প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিংবা বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বর্তমানে আমি সমস্ত বিষয়ের সহিত পরিচিত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং বিভিন্ন মত জানিবার জন্য বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের সহিত আলোচনা করিতেছি। আমি মনে করি যে, বর্তমান সংকটে বাঙলা—তথা সমগ্র দেশকে কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থায় পরিচালনা করা প্রয়োজন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে এ-বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

সকল রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের অধিবাসীদের উৎসাহিত হইবার মত কিছুই নাই। উহা আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতেছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অন্য পরাধীন জাতি সমূহ যে স্বাধীনতার আকাঙ্খা করে, উহা আমাদিগকে তাহাও দিতেছে না। আমি যদি বাঙলার মনোভাব ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে বলিব যে, বর্তমানে এরূপ অসন্তোষজনক ও অসম্পূর্ণ প্রস্তাব বাঙলা গ্রহণ করিবে না এবং আমার বিশ্বাস, এই-বিষয়ে বাঙলার যে মনোভাব, দেশের অন্যান্য অংশের মনোভাবও তাই।

ভারতের আদর্শ

ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে আমার অভিমত সকল সময়েই এক। আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি যে, পূর্ণ স্বাধীনতা শুধু ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য নহে, ব্রিটিশের মঙ্গল ও জগতের শান্তির জন্যও আবশ্যক। ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে বিরোধ কিছু নাই, অন্তত থাকা উচিত নহে, ব্রিটিশরা ব্রিটেনে যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছেন, ভারতবাসীরা নিজ দেশে যে মুহূর্তে সেই সকল অধিকার পাইবে, সেই মুহূর্তেই ভারতবর্ষ ও ইংলন্ড বন্ধু হইতে পারেন ও হইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে বা কার্যত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে আমি যখন স্বাধীনতার আদর্শের অনুকূলে আমার সংশোধন প্রস্তাব পেশ করি তখন— পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান এবং আমি বাঙলার মনোভাব প্রতিধ্বনিত করিতেছি, এই বিশ্বাস লইয়া পেশ করিয়াছিলাম। কলিকাতা কংগ্রেসে সংশোধন প্রস্তাবটী গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু মাত্র এক বৎসর পরে লাহোর কংগ্রেসে সেই আদর্শই গৃহীত হয়। কলিকাতায় যাহারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন, তাহারাই উহার সমর্থন করেন। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান ঘোষণাকে সম্মানজনক আপসের কথাবার্তা চালাইবার প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে কিরূপে অনুরোধ করা যায় আমি বুঝিতে পারি না।

সম্মানজনক আপস

আশা করি আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। আমি সম্মানজনক আপসের বিরোধী নহি, পক্ষান্তরে ঐরূপ মীমাংসা যাহাতে সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য উপায় উদ্‌ভাবন করা সংগত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু মীমাংসার কথাবার্তার পূর্বে হৃদয়ের প্রকৃত পরিবর্তন চাই। কথাবার্তার আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ঘোষিত হইলে হৃদয়ের পরিবর্তন যেরূপ প্রকাশ পাইবে এমন আর-কিছুতেই নহে। মুক্তি ঘোষণায় বেংগল অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ রেগুলেশনের বন্দী এবং হিংসামূলক অপরাধে যারা দণ্ডিত সকল রাজনৈতিক বন্দীকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। হিংসামূলক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তিদান সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমরা হিংসামূলক কার্যের যতই নিন্দা করি না কেন, দুর্ভাগ্যবশত যাঁহারা হিংসার পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা— তাঁহাদের বিবেচনা মতো দেশসেবা করিতেছিলেন এই বিশ্বাসেই যে ঐ পথের অনুসরণ করিয়াছেন, এই সত্য কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

আয়র্লণ্ডের নীতি

সুতরাং ১৯২১ সালে আয়র্লণ্ডে যে-নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার অনুসরণ এবং তথাকার অন্যান্যদের মধ্যে প্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত কম্যাণ্ডান্ট সীন ম্যাকিয়নের বিষয় আলোচনাপূর্বক ভারতবর্ষেও হিংসামূলক অপরাধে দণ্ডিত বন্দীগণকে মুক্তিদান করা উচিত। আমি আরো জানাইতে চাহি যে, বিভিন্ন স্থানে যে-সকল ষড়যন্ত্রের মামলা চলিতেছে, মুক্তি ঘোষণার সংগে সংগে সেগুলিও প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। মুক্তি ঘোষণার যখন সময় সমুপস্থিত হইবে, তখন যে-সকল শ্রমিক কর্মী জেলে রহিয়াছেন, তাঁহারা উপেক্ষিত হইতে পারেন, এরূপ আমার আশংকা আছে সেই হেতু তাঁহাদের বিষয় আমি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশ আছে ; সেই হেতু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাও প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। উপযুক্ত মনোভাব লইয়া যদি মুক্তি ঘোষণা বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আমার আশংকা যে, আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে।

১১ মার্চ ১৯৩১

ভারতে চাই সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক

করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

প্রিয় বন্ধুগণ,

করাচীতে নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে আমাকে আপনারা আহ্বান করিয়াছেন। আমাকে নির্বাচন করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি আপনারা ভালোবাসা পোষণ করেন বলিয়া এই নির্বাচন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমাদের ইতিহাসের এক পরম লগ্নে আপনারা এই সম্মেলন অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি আশা করি আমাদের সম্মুখে কী কী সমস্যা আছে ও আমাদের কোন্ পথ অনুসরণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে আমি আলোকপাত করিতে পারিব।

প্রাচীনতম কাল হইতে মানবজাতি সুন্দরতর ব্যবস্থার অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছে। যেমন প্রাচ্যে তেমনই পাশ্চাত্যে এই অন্বেষণ চলিয়াছে। শুধু ঋষি ও স্বপ্নদ্রষ্টারাই নন, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়করাও এই অন্বেষণে নিমগ্ন রহিয়াছেন। আদর্শ সমাজ বা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু উহাদের পিছনে যে মূল প্রেরণা তাহা সর্বত্রই এক। প্রাচ্যে মানুষ এক আদর্শ গণরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কখনো কখনো মানুষ চাহিয়াছে যে যে-প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে সে জাত সেই আদিম উৎসে সে ফিরিয়া যাইবে। কখনো কখনো তাহারা চাহিয়াছে যুগযুগান্তের সামাজিক আর্থিক, ও রাজনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া ফেলিতে যাহাতে তাহারা অতীতের ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন ও মহৎ সৌধ গড়িয়া তুলিতে পারে।

এই বিশ্বজনীন মানবিক প্রয়াসের পশ্চাতে যে মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা আছে তাহা হইল প্রচলিত ব্যবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে তীব্র অসন্তোষ ও এক মৌলিক পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই প্রেরণার বলে মানুষ তাহার সম্পূর্ণ অসহায়তাবশত মর্ত্যলোক ও মানব-অস্তিত্বের উর্ধ্বে এক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিয়াছে। সে স্বর্গরাজ্যে মানুষ আদর্শ পরিবেশে আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারিবে। অন্য অনেকে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। স্বর্গ-রাজ্য আমাদেরই ভিতরে আছে ইহা বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা যোগ পূজা গান

ও প্রার্থনার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম সুখ ও শান্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই দুই ভাবধারা লইয়া আমরা এখানে ব্যস্ত নই। আমরা ইহার কোনো ভাবধারাকেই গ্রহণও করিতেছি না, বর্জনও করিতেছি না। আমরা সেই সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা লইয়া ভাবিব যাহা সর্বোচ্চ সুখ আনয়ন করিতে পারে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাইতে পারে, চরিত্র গঠনে সাহায্য করিতে পারে ও সমষ্টিগত মানবের উচ্চতম আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। যে পন্থায় এই লক্ষ্য দ্রুততম সময়ে সাধিত হইতে পারে সেই পন্থার অনুসন্ধানও আমরা করিব।

মানুষ উন্নততর সমাজব্যবস্থার অন্বেষণে যুগে যুগে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়াইয়াছে। ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য চির-অধরা আদর্শের উপর আলোকসম্পাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যুগে যুগে সকল সভ্যদেশে এই যে প্রয়াস দেখা গিয়াছে তাহা আলোচনা করার পক্ষে চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তাহাতে আমাদের অনেক সময় ব্যয় হইবে ও যে অব্যবহিত সমস্যা আমাদের সম্মুখে আছে তাহার লক্ষ্য হইতে আমরা অপসারিত হইব। এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মানুষ প্রগতির তত্ত্ব এখন স্বীকার করিয়া নিয়াছে ও উহার বিপরীত তত্ত্ব যথা আদিম স্বর্গ হইতে মানুষের পতন ঘটিয়াছিল ও তাহার ফলেই বর্তমান অবনতি ঘটিয়াছে— এই তত্ত্ব এখন বর্জন করিয়াছে। এই প্রগতির তত্ত্ব লইয়াই আমরা আলোচনা শুরু করিতে পারি।

সমাজতন্ত্রের অন্তর্বস্তু

যে-সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ মানুষকে কর্ম ও উদ্যমের পথে প্রেরণা দেয় আমরা যদি সেগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে আমরা কয়েকটি সাধারণ মূল সূত্রে উপনীত হইব। কোন্ নীতি ও আদর্শের জন্য জীবনধারণ সার্থক তাহা যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলেও একই ফল পাইব। যে পথই অনুসরণ করা হোক-না আমার মনে হয় যে-সব নীতি আমাদের সমষ্টিজীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত তাহা হইল— ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃংখলা ও প্রেম। এ কথা লইয়া তর্ক করা অনাবশ্যক যে আমাদের সকল কাজ ও সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত ন্যায়। ন্যায়পূর্ণ ও নিরপেক্ষ হইবার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের প্রতি আমাদের

সম-আচরণ করিতে হইবে। সকল মানুষকে সমান করিয়া তুলিতে হইলে সকল মানুষের প্রতি সম-আচরণ করা দরকার। সাম্য আনিতে হইলে স্বাধীনতা দিতে হইবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বন্ধন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে ও নানাবিধ অসাম্যের জন্ম দেয়। অতএব সাম্য আনার উদ্দেশ্যে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক— এই সব রকম বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইবে। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতা বা যা-খুশি-করার অধিকার নয়। স্বাধীনতার অর্থ আইনের অভাব নয়। ইহার অর্থ শুধু এই যে বিদেশীরা যে আইন ও শৃংখলা চাপাইয়া দিয়াছে তাহার বদলে আমাদের নিজেদের প্রণীত আইন ও শৃংখলার প্রবর্তন করা। আমরা যখন স্বাধীন হইব তখনই যে আমরা স্বকীয় উদ্যোগে শৃংখলা স্থাপন করিব তাহা নয়। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কালে উহা করা আরো বেশি আবশ্যক। অতএব ব্যক্তির পক্ষে বা সমাজের পক্ষে জীবনের ভিত্তি রূপে শৃংখলাবোধ আনা দরকার। শোষণ, এই সকল মূল নীতি, যথা, ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও শৃংখলা— ইহাদের মধ্যে অনুস্যূত আছে আর-একটি উচ্চতর নীতি— প্রেম। যদি মানবতার প্রতি ভালোবাসায় আমরা অনুপ্রাণিত না হই তাহা হইলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হইতে পারিব না, বা সকল মানুষের প্রতি সম-আচরণ করিতে পারিব না, স্বাধীনতা চাহিতে পারিব না বা যথার্থ শৃংখলা স্থাপন করিতে পারিব না। তাই আমার মতে এই পাঁচটি নীতি আমাদের সমষ্টিজীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। আরো অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে সমাজতন্ত্র বলিতে আমি যাহা বুঝি এবং ভারতের যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আমি দেখিতে চাই তাহার অন্তর্বস্তু এই পাঁচটি নীতি লইয়াই গঠিত

মানবজাতিকে দিবার মতো বহু শিক্ষা আজ বলশেভিকবাদের আছে। আমি বিশ্বাস করি যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ এমন-একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিবে যাহা বিশ্বকে অনেকাংশে অনুরূপ শিক্ষা দান করিতে পারিবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে একই মাত্রায়, একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতি এবং দেশের ক্ষেত্রে বিমূর্ত ভাবধারা প্রযোজ্য হইতে পারে। রাশিয়ার পরিস্থিতিতে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে বলশেভিকবাদের জন্ম হইয়াছে। ঠিক একই ভাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে সমাজবাদের প্রয়োগে নূতন ধাঁচের সমাজবাদ গড়িয়া উঠিবে। যাহাকে ভারতীয় সমাজবাদরূপে স্বাগত জানানো যাইতে পারে। পরিবেশ, জাতিগত ধাত, সামাজিক-অর্থনৈতিক

পরিস্থিতি— এই বাস্তব অবস্থাগুলিকে কলমের এক খোঁচায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই তথ্যগুলি কোনো তত্ত্বের প্রয়োগ প্রভাবিত করিতে বাধ্য।

একটি সতর্কবাণী

বিদেশ হইতে জ্ঞানালোক ও অনুপ্রেরণার সন্ধানকালে অপর দেশকে অন্ধভাবে অনুকরণ যে বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা যেন আমরা কখনই ভুলিয়া না যাই এবং অপর দেশ হইতে এইপ্রকার জ্ঞানাহরণ করিয়া আমাদের জাতীয় প্রয়োজন এবং প্রতিভা অনুযায়ী তাহা অংগীভূত করিতে হইবে। 'যাহা কাহারো খাদ্য অপরের জন্য তাহা বিষ-সদৃশ'— এই প্রবাদ বহুলাংশে সত্য। সুতরাং, যাহারা বলশেভিকদের তত্ত্ব অন্ধভাবে অনুসরণে প্রলুব্ধ হইতে পারেন, আমি তাহাদের সাবধান করিয়া দিতে চাই। বর্তমানে বলশেভিক মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। মার্কসের গোড়াকার তত্ত্ব হইতেই যে কেবলমাত্র সরিয়া আসা হইয়াছে তাহা নহে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্বে লেনিন এবং অন্যান্য বলশেভিকরা যে মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহাও বর্জিত হইয়াছে। রাশিয়ার তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতি আদি মার্কসবাদ বা বলশেভিকবাদের সংশোধিত পথ গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। রাশিয়ায় যে পদ্ধতি এবং কৌশল গ্রহণ করা হইয়াছিল, ভারতীয় পরিস্থিতিতে তাহা যে উপযোগী হইবে না, এ-কথা বলিতে পারি। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, কম্যুনিস্ট মতবাদের সর্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ইহার প্রয়োগগত পদ্ধতি ও কৌশল সম্ভাব্য বন্ধু ও মিত্রদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া ভারতে ইহার প্রসার স্তিমিত করিয়া দিয়াছে।

আমার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার এই যে আমি ভারতে একটি সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাই। এই সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কী হইবে, তাহা এখনই সঠিক নির্ণয় করা কঠিন— আমরা তাহার মূলগত রূপরেখা মাত্র বিবৃত করিতে পারি।

পূর্ণ, সামগ্রিক এবং অবিমিশ্র স্বাধীনতার বাণীই আমি পৌঁছাইয়া দিতে পারি। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই অর্থাৎ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণহীন একটি স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান আমাদের কাম্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ছিন্ন-সম্পর্ক স্বাধীনতার প্রশ্নে অস্পষ্টতার কিম্বা কোনো মানসিক প্রতিবন্ধকতার স্থান নাই। দ্বিতীয়ত, আমরা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক

মুক্তি চাই, অর্থাৎ, প্রত্যেকের কাজের অধিকার এবং জীবনধারণোপযোগী বেতন চাই। সমাজে অলস ব্যক্তিদের স্থান থাকিবে না এবং সকলেরই সমান সুযোগ থাকিবে। সর্বোপরি সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন, ন্যায্য ও ক্ষমতা-সম্পন্ন সুযোগ চাই এবং এই কারণে উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হওয়া অপরিহার্য হইতে পারে। তৃতীয়ত, আমরা সর্বতোভাবে সামাজিক সমতা দাবি করি— জাত-পাতের, কিম্বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা থাকিবে না, সমাজে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাইবে, স্ত্রী-পুরুষে সমাজগত কিম্বা আইনগত মর্যাদায় কোনো বৈষম্য থাকিবে না এবং সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারের স্বীকৃতি পাইবে। সমাজে যাহারা কোনো-না-কোনোভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত, ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা গোষ্ঠীগতভাবে তাহাদের দিবার মত বাণী আছে, বাণী আছে রাজনৈতিক কর্মী শ্রমজীবী ভূমিহীন বিত্তহীন সর্বহারা সমাজে তথাকথিত অনুন্নত এবং দুর্বলতর নারীদের জন্য। এই বঞ্চিত অত্যাচারিতরাই আমাদের সমাজে চরমপন্থী কিম্বা বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে; আমরা যদি পূর্ণ-স্বাধীনতার বাণী লইয়া তাহাদের সম্বর্ধনা জানাইতে পারি অনতিকালেই যে তাহাদের অনুপ্রেরিত করা যায়, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। যতদিন পর্যন্ত না হৃদয়-উৎসারিত নূতন বাণী এই চরমপন্থী বা বৈপ্লবিক শক্তিপুঞ্জের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তাহাদের জাত না করা যাইবে, ততদিন স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না।

কংগ্রেস নীতি

কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীতে প্রধান দুর্বলতা এই যে— তাহা খুবই অস্পষ্ট এবং সে সম্পর্কে নেতাদের মনেও দ্বিধা রহিয়াছে। উপরন্তু এই কর্মসূচীর ভিত্তি সংগ্রামমূলক নয়, আপসমূলক। এই আপস হইবে জমির মালিকের সহিত চাষীর, পুঁজিবাদীর সহিত শ্রমিকের, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সহিত অনুন্নত শ্রেণীর, পুরুষের সহিত নারীর। বর্তমান ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য এই পারস্পরিক সম্পর্ক যথার্থ হইতে পারে বটে কিন্তু যে বৈপ্লবিক চেতনা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হইবে এই সামান্য মূল্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সমাজে তাহা জাগ্রত করিতে পারিবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। এই বিশাল সমস্যার সমাধানে আমরা কোনো জোড়া-

তালি দিতে চাই না। এ-বিষয়ে আমরা চাই সংগ্রামী জঙ্গী কর্মসূচী। এই প্রারম্ভিক ভাষণে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়া কর্মসূচীর মূল রূপরেখা বিবৃত করিব। গোড়ায় যে পাঁচটি মূলনীতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত হইয়া আমাদের কর্মধারা নিম্নলিখিত দিকে সঞ্চারিত করিতে হইবে :

১. সমাজবাদী কর্মসূচীর অঙ্গরূপে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন
২. কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সহিত যুবশক্তির স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন
৩. জাতিভেদ ও সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার বর্জন
৪. নূতন আদর্শবোধের গ্রহীষ্ণু মানসিকতা তৈরির এবং নূতন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নারীসমিতি গঠন
৫. ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের জন্য প্রবল প্রচার
৬. নূতন ভাবধারা প্রচারের এবং নূতন দল গঠনের জন্য দেশব্যাপী প্রচার
৭. নূতন ভাবধারা এবং কর্মসূচী প্রচারের জন্য নূতন সাহিত্যসৃষ্টি।

সহকর্মী ও বন্ধুদের নিকট আমার আবেদন, নূতন ভাবধারা এবং কর্মসূচী তাহাদের আকর্ষণীয় মনে হইলে তাহারা যেন গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন ইহার ভিত্তিতে তাহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বামপন্থীর ভূমিকায় সংগঠিত হইবেন কিনা। ইহার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথমত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক সুনাম রহিয়াছে তদুপরি পুরুষানুক্রমিক আত্মত্যাগের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। আমার এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে বামপন্থী সংগঠন যদি সঠিকভাবে গড়িয়া ওঠে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অনতিবিলম্বেই কংগ্রেসের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য তাহাদের ডাক পড়িবে। একবার নিজ কর্মসূচী লইয়া এই দল প্রতিষ্ঠিত হইলে, বর্তমান ব্যবস্থার ও কর্মসূচীর বিকল্প স্থান গ্রহণ করিবে।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসি

বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই আশা করিবেন যে আমি শেষ করিবার পূর্বে সরকার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সে-সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে যে ঘটনা গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে সে সম্বন্ধে আমার মন আপনাদের নিকট

অবারিত করিব। সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সংগীদের সাম্প্রতিক উল্লেখই আমি করিতে চাই। ইহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ এবং এ-সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনার জন্য আপনাদের আনুকূল্য কামনা করিব।

ভগৎ সিং মরণের পরপারে প্রস্থান করিয়াছেন। ভগৎ সিং দীর্ঘজীবী হোক। লাহোরে যে মর্মান্তিক নাটক অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহার পরিসমাপ্তির জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণ মাসের পর মাস শংকাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আত্মত্যাগের জন্য অবিস্মরণীয় এবং অবর্ণনীয় বেদনার্ত একটি দৃশ্যপটের উপর অবশেষে যবনিকাপাত হইয়াছে। রুদ্ধশ্বাস শংকাকুল উদ্‌বেগ লইয়া যতীন দাসের পরিণতির অপেক্ষায় যে পরিস্থিতির শুরু, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সে ঘটনা বৈচিত্র্যময় এবং প্রাণবন্ত ছিল, ভগৎ সিং-এর আত্মদানে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই দুইটি বিরল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত প্রশস্তির আনন্দঘন দৃষ্টিতে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকি। যতীন দাসের শবানুগমন যেমন একটি দীর্ঘ বিজয় অভিযানের রূপ নিয়াছিল, তেমনি ভগৎ সিং-এর ফাঁসি সমগ্র জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য পবিত্র উৎসর্গের রূপ নিয়াছে। সুতরাং লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা যে ভারতের অন্তরের অন্তস্তল আলোড়িত করিবে, তাহাতে আর অবাক হইবার কী আছে? আমি আবার বলিতেছি ভগৎ সিং মরণের পরপারে প্রস্থান করিয়াছেন। ভগৎ সিং দীর্ঘজীবী হউন। ভগৎ সিং কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহেন, তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রতীক, যে ভাবধারা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত সঞ্চারিত হইয়াছে। এই ভাবধারা অপরাজেয়। যে অগ্নিশিখা এই ভাবধারা হইতে প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা অনির্বাণ। সুতরাং ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব যে আমাদের মধ্যে নাই, সেজন্য আমরা শোক করি না। মুক্তিলাভের পূর্বে ভারতকে আরো অনেক সন্তানহারা হইতে হইবে। আমাদের শোকার্ত হইবার একটি মাত্রই কারণ তাহা এই যে, ভারতবর্ষের মুখ্য জাতীয় সংগঠন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যে সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন, সে সময়ই তাঁহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। হরকিষণলাল, দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মতো অন্যান্য ভারত সন্তানের ভাগ্যে কী ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং খুবই সংগতভাবে প্রশ্ন করা চলে এই

চুক্তিমূল্য কী, যদি এই ধরনের বৈরীসুলভ আচরণ অব্যাহত থাকে এবং আমাদের সর্বোত্তম বীরদের জীবন রক্ষা করিতে ব্যর্থ হই ?

সন্ধি-চুক্তির স্বরূপ

সন্ধি-চুক্তিপত্রে লেখা নাই যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হইবে না, এই যুক্তি দেখানো যাইতে পারে। এই কথা স্বীকার করিয়াও কি জিজ্ঞাসা করা যায় না সন্ধি-চুক্তির উদ্দেশ্য কী ? সকলেই স্বীকার করিবেন যে গোল টেবিল বৈঠকে আপস আলোচনা শুরু হইবার পূর্বে শান্তির ও শুভেচ্ছার পরিবেশ ফিরাইয়া আনাই চুক্তির উদ্দেশ্য, যাহাতে বিদ্বেষ ও তিক্ততা বর্জন করিয়া শান্ত ও সংযতভাবে আলোচনা চলিতে পারে। মৃত্যুদণ্ড আরোপ ও কার্যকর করিয়া এবং বহু সংখ্যক রাজবন্দীদের জেলে আবদ্ধ রাখিয়া কী সেই পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। গভর্নমেন্ট যদি আক্ষরিকভাবে সন্ধি-চুক্তি অনুসরণ করেন, কিম্বা সন্ধি-চুক্তি অনুযায়ী তাহাদের স্বার্থ কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিয়া লইতে চান, তাহা হইলে আলোচনার বা মীমাংসার সময় ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে এইরূপ আশা করিবার কী কারণ থাকিতে পারে ? কোনো আলোচনার বা মীমাংসার পূর্বে মহাত্মা গান্ধী নিরর্থক হৃদয়-পরিবর্তনের জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই। যে গভর্নমেন্টের আমলাতান্ত্রিক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব অপরিবর্তিত রহিয়াছে, সেই গভর্নমেন্ট কখনো স্বেচ্ছায় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে না। ইহা হয়তো আমাদের বলা হইবে যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলাপ-আলোচনা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস অথবা ভারত সরকারের সহিত হইবে না, এই আলোচনা করিতে হইবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট অথবা ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত। কিন্তু পুলিশের অত্যাচার সংক্রান্ত তদন্তের কিম্বা মৃত্যুদণ্ড মকুবের বিষয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো বৃহত্তর প্রশ্নে সেই গভর্নমেন্ট যে স্থানীয় লৌহ-কঠিন প্রশাসনের ইচ্ছার দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হইবে ইহাই কি আশা করা যায় না ?

গভর্নমেন্টের কোনোই হৃদয়-পরিবর্তন হয় নাই সাম্প্রতিক ফাঁসিগুলি আমার নিকট তাহারই সুস্পষ্ট নিদর্শন। সম্মানজনক আপসের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। স্বরাজের স্বাগত অভ্যুদয়ের পূর্বে আমাদের আত্মত্যাগ ও লাঞ্ছনাবরণের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আয়ার্ল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক

ইতিহাস আমার কথার যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবে। কর্কের লর্ড মেয়র, অলডারম্যান ম্যাক্সুইনী তাহার কারাবাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ অনশন ধর্মঘটকালে মৃত্যুর প্রান্তসীমায় পৌঁছাইলে ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে মহামান্য রাজার নিকট তাহার রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ম্যাকসুইনীর জীবনরক্ষার আকুল আবেদন করা হইয়াছিল। রাজার হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হইলেও নিজ সেক্রেটারির মারফত তিনি ঘোষণা করিলেন তাহার মন্ত্রীরা ক্ষমা প্রদর্শনের বিরোধী হওয়ায়, তিনি কোনোপ্রকার সহায়তা করিতে অক্ষম। ইহার প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রাম গভীরতর তিক্ততার সহিত পরিচালিত হইতে থাকে। কিছুদিন পর উভয় পক্ষই বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। রাজবন্দীদের সার্বিক মুক্তির প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় এবং সিন্-ফিন্ নেতারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতসহ সকল বন্দীর মুক্তি দাবি করে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সীয়ন ম্যাক্কিওন্ ব্যতিরেকে সকল বন্দীদের মুক্তিদানে সম্মত হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সীয়ন ম্যাক্কিওন্কে মুক্তি না দিলে সিন্-ফিন্ নেতারা চুক্তি বাতিল করিবার চরম হুমকি দেন। এই চরম দাবির উত্তরে যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট দেশব্যাপী আন্দোলন সত্ত্বেও টেরেন্স ম্যাকসুইনীর জীবনরক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করে সেই মন্ত্রীসভাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সীয়ন ম্যাক্কিওনকে মুক্তি দান করে। মীমাংসার উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হওয়ায় ম্যাক্সুইনীর মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ জনসাধারণের হৃদয়-পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এবং স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা উন্মোচিত হওয়ায় সীয়ন ম্যাক্কিওনের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল। ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেই নীতিই কী আমরা প্রয়োগ করিতে পারি না ?

বীর ভগৎ সিং এবং তাঁহার সহযোদ্ধারা প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন নাই। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তাঁহাদের সর্বস্বপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র দেশ তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য উদগ্রীব ছিল। যদি সন্ধি-চুক্তি ঘোষিত হইত, যদি শান্তি দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে আত্মত্যাগী বীরদের জীবন রক্ষা পাইয়া জাতীয় জনসাধারণের কাজে নিয়োজিত হইতে পারিত। সমগ্র দেশ সমেত সকল দল ও সকল মতের মানুষ স্ব্যর্থহীনভাবে তাঁহাদের মৃত্যুদণ্ড মকুবের ইচ্ছা প্রকাশ বা দাবি করিয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে সকল রকম চেষ্টা হইলেও, সন্ধি-চুক্তির আলোচনা চলাকালীন ভারতের একমাত্র জাতীয়তাবাদী

সংগঠনরূপে বিপ্লবীদের এবং ভারতে শ্রমিকদলের প্রতি সমর্থন প্রসারিত করিতে পারিত। সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিপ্লবীদের কিম্বা তাহাদের কৌশলের অঙ্গীভূত হইত না। ইহা একটিই মাত্র তাৎপর্য বহন করিত, যেহেতু এই দুইটি পার্টিও তাহাদের নিজ নিজ উপলব্ধি দ্বারা ভারতের মুক্তি সাধনায় ব্রতী তাহাদের সহযোগিতা ব্যতীত স্থায়ী শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস

এই সন্ধিক্ষণে গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে উদার মনোভাব দেখাইলে তাহা এই দুই দলের এবং সমগ্র দেশের উপর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিত। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে উদার মনোভাব দেখাইবার পরও কোনো গোষ্ঠী, দল কিম্বা ব্যক্তির দিক হইতে সাড়া না পাওয়া গেলে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে সেই গোষ্ঠী, বা ব্যক্তি নিন্দার্হ হইত। বিরোধিতা অবসানের মনোভাব লইয়া সংগ্রামী দলগুলিকে নিরস্ত করিতে পারিলে, গভর্নমেন্টের নৈতিক জয় হইত, অন্যথায় বিপুল শক্তি ও সম্পদের অধিকারী গভর্নমেন্টের আদৌ কোনো ক্ষতি হইত না। আর বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, পুনরায় তাহারা অধিকতর যৌক্তিকতা দেখাইয়া নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিত।

গভর্নমেন্ট ভুল করিয়া থাকিলে কংগ্রেসও ভুল করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে সিন্-ফিন দল যেমন সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে কংগ্রেসও সেইভাবে বিপ্লবী এবং শ্রমিক পার্টিগুলির পদ্ধতির সহিত সহমত না হইয়াও তাহাদের দাবির সমর্থন করিতে পারিত। কংগ্রেস তাহাতে ব্যর্থ হইয়া সমগ্র দেশের এবং বিশ্বের দৃষ্টিতে নিজেকে খর্ব করিয়াছে। ভগৎ সিং ও অন্যান্যদের প্রাণদণ্ড মকুবের আবেদন গভর্নমেন্ট নাকচ করিবার পর কংগ্রেস একই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করিতে পারিত।

কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ডগুলি বাতিলের দাবি জানাইলে তাহাদের কোনো ক্ষতি তো হইতই না বরং সমগ্র দেশের দৃষ্টিতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইত এবং সম্ভবত ভগৎ সিং-এর জীবনও রক্ষা পাইত। আর গভর্নমেন্ট তাহাদের দাবি বাতিল করিয়া দিলে, কর্তব্যসাধনের তৃপ্তি ভোগ করিত এবং ভগৎ সিং ও তাঁহার সহযাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয় নাই —কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বা ক্ষোভ কেহ পোষণ করিতে পারিত না।

গান্ধী-আরউইন সন্ধি-চুক্তি

গান্ধী-আরউইন সন্ধি-চুক্তি অত্যন্ত অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। দলিলটির বিষয়বস্তু চুক্তিটি সম্পাদিত হইবার সময় আমাদের শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণার সৃষ্টি করিবে তাহা হইতে আমরা অধিকতর শক্তিশালী ছিলাম। সন্ধি-চুক্তির ত্রুটিমূলক দিনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল :

১. বেঙ্গল অর্ডিনান্সের মতো (বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট) এবং বার্মা অর্ডিন্যান্স— যাহার সাহায্যে বিনাবিচারে কেবলমাত্র সন্দেহবশত বন্দী করা হয়— বাতিল করা হয় নাই।

২. জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত দিবার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে।

৩. পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি— বিশেষভাবে কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত হইবার পর— বর্জন অনুচিত কাজ হইয়াছে। যে-সকল সিপাহীকে রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং যে গাড়োয়ালী বাহিনী নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করিয়াছে, কংগ্রেসের উচিত ছিল তাহাদের পাশে দাঁড়ানো। নিজেদের অনুগতরা নানা অত্যাচারে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট তাহাদের বর্জন করিতে অস্বীকার করিয়াছে, অপরপক্ষে কংগ্রেস নিজেদের অনুগতদের পাশে দাঁড়ায় নাই।

৪. ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের কর্মসূচী কংগ্রেসের ত্যাগ করা উচিত হয় নাই, বিশেষত এই কর্মসূচী যখন আইন অমান্য আন্দোলনের অংশ নহে। গত বছর আইন অমান্য আরম্ভের পূর্বে, স্বাভাবিক সময়ে, ব্রিটিশ পণ্য বয়কট অব্যাহত ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং আইন অমান্য আন্দোলনের পর যে অবস্থা, তাহা আরম্ভের পূর্বের সহিত কোনো তফাত নাই।

৫. লবণ উৎপাদনের বিধানগুলি যথেষ্ট নহে, কারণ একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় লবণ উৎপাদনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

৬. গত বছর আইন অমান্য আরম্ভ হইবার পূর্বে পিকেটিং-এর যে অসুবিধাগুলি ছিল সন্ধি-চুক্তিতে পিকেটিং সম্পর্কে আরোপিত নিষেধ-গুলির বাঁধাবাঁধি পিকেটিং-এর পথে শুধু অন্তরায় সৃষ্টি করিবে না, একেবারে অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

৭. *সর্বশেষে, বন্দীমুক্তির বিধানগুলি অত্যন্ত অসন্তোষজনক।* প্রথমত আইন অমান্য আন্দোলনকারী বন্দীদের এখন পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া

হয় নাই। তারপর সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিপ্লবী এবং শ্রমিকদলের বন্দী-দের মুক্তি দাবি করা যাইবে না। ফাঁসির হুকুমগুলি রদ করা হইবে না--চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা এবং মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার ন্যায় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলাগুলি চলিতে থাকিবে। পাঞ্জাবের সামরিক আইন বন্দীদের রাজবন্দীরা যাঁহারা দশ-বারো বছর যাবৎ কারাবন্দী রহিয়াছেন, তাঁহাদের বন্দী-দশায়ই থাকিতে হইবে। সব শেষে, যদিও কোনো দিকে হীন নহে বাংলার রাজবন্দীরা, যাঁহারা বিনাবিচারে কারাগারে অথবা বন্দীশিবিরে রহিয়াছেন, মুক্তি পাইবেন না। সুতরাং এই ব্যাপক বন্দীমুক্তির মূল্য কি। কংগ্রেস নূতনভাবে হিংসা ও অহিংসাপন্থী বন্দীদের যে স্তরভেদ করিয়াছেন ইহা চমকসৃষ্টির ব্যবস্থা। ১৯২৯-এর দিল্লী ইস্তাহারে এই স্তরভেদ করা হয় নাই, কিম্বা মহাত্মা গান্ধীর প্রখ্যাত ১১ দফায়ও ইহার স্থান ছিল না।

সন্ধি-চুক্তির শর্তাবলীর অসন্তোষজনক স্বরূপ উদ্ঘাটনে অধিকতর যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। দলিলটি পাঠেই বোঝা যায় পরাজিতের মনোভাব লইয়া ইহাতে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার ভাষা কোথাও কোথাও আমাদের আত্ম-মর্যাদা ও সম্মানের পরিপন্থী। যদি সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের সময় আমরা দুর্বল থাকিতাম, আমি বেশি প্রতিবাদ করিতাম না। কিন্তু বাস্তবিকই কি আমরা সে-সময় এতই দুর্বল ছিলাম ? আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

'একটি সম্পাদিত ঘটনা'

কিন্তু সন্ধি-চুক্তি একটি সম্পাদিত ঘটনা এবং কোনো আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গভীরভাবে মনঃসংযোগ করাই আমাদের সম্মুখে প্রশ্নরূপে দেখা দিয়াছে। নেতিবাচক সমালোচনায় সময় নষ্ট না করিয়া কল্যাণকর ইতিবাচক কিছু করা আমাদের কর্তব্য। সন্ধি-চুক্তির শর্ত রচনায় যাহারা দায়ী, মুহূর্তের জন্যও তাহাদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলিতেছি না। ইহা একেবারে চিন্তার বাইরে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য এমন-কিছু করা যাহা জাতিকে এবং জাতীয় দাবিকে শক্তিশালী করিবে। এই কারণে গোড়াতেই আমি নূতন কর্মসূচীর রূপরেখা বিবৃত করিয়াছি, যাহা আমাদের মধ্যে চরমমতাবলম্বীরা আগাইয়া নিয়া যাইতে পারিবে এবং আরো কিছু সংযোজনও করিতে পারিবে। এইপ্রকার কর্মসূচী কংগ্রেস নেতাদের সহিত অকারণ সংঘাত বর্জনে সহায়তা করিবে। যে-সময় সেরূপ সংঘাত জন-

সাধারণকে দুর্বল করিয়া সরকারের শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারে। সর্বোপরি অপরকে সমালোচনা করিতে হইলেও নিজেদের আত্মসংযম ও আত্মশাসন বজায় রাখিতে হইবে। অপরের প্রতি সৌজন্য এবং সংযত আচরণ প্রদর্শন করিয়া আমরা কিছুই হারাইব না বরং আমরা অনেক লাভবান হইতে পারি। আমাদের কর্মসূচীর উপর আস্থা থাকিলে তাহা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগী হইতে হইবে। যদি আমাদের কর্মসূচী সত্যের ভিত্তিতে রচিত হয়, দেশবাসীরা শেষ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিবেই কারণ এই বিশ্বে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের মূল্যবান অনেকটা সময় নিয়াছি কিন্তু আমি শেষ করিয়া আনিয়াছি। আসুন, আমরা অতি গুরুত্বের সহিত, অপ্রতিহত সাহস লইয়া অথচ বিনম্রভাবে আমাদের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হই। স্বাধীন ভারতের, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এবং মুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন আমার আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই জীবনের স্বপ্ন এবং আমার সকল কর্মোদ্যোগের অন্তিম লক্ষ্য। বিশ্বের সংস্কৃতির এবং সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতবর্ষের অনেক কিছু দিবার রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী সেই অবদানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে এবং সমগ্র মানবতার শিক্ষার জন্য বিশ্বের ভাণ্ডারে একটি নূতন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি নূতন গড়নের রাষ্ট্রীয় কাঠামোই হইবে ভারতের সর্বশেষ অবদান। বিশ্ব শিলাভূমির উপর রচিত ইমারতের চাবিকাঠি ভারতবর্ষ এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস অনিবার্য করিয়া তুলিবে। আসুন আমরা সময়োপযোগী কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া তুলি যাহার পরিণতিতে মানবতার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত হইবে।

২৮ মার্চ ১৯৩১

সমাজবাদের দিকে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ

৮ এপ্রিল ১৯৩১ অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে যুবকদের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রদত্ত ভাষণ।

প্রথমত, কংগ্রেস পুনরায় স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিল। দ্বিতীয়ত, গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম দাবি স্থির করিয়া দেওয়া হইল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আদর্শের সহিত অসংগতিপূর্ণ কোনো দাবিই যেন গৃহীত অথবা উত্থাপিত না হয়, প্রস্তাবটি এই লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। তৃতীয়ত, গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে দাবি করা না হইলেও, করাচী-কংগ্রেসে সুস্পষ্টভাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করা হইল। চতুর্থত, এই কংগ্রেসে জাতীয় আন্দোলনে সমাজবাদের দিকে সুস্পষ্ট গতি সঞ্চার করা হইল। তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ মাত্র কিছুসংখ্যক বিত্তবানের জন্য নয়, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। সুতরাং 'দরিদ্রের স্বরাজ' স্থাপনের জন্য দরিদ্রদেরই বেশি পরিমাণে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

যৌবনের প্রভাব

করাচী-কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে বামপন্থী যুবকদের প্রভাব স্পষ্টই দেখা গিয়াছে। খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসে বিরোধিতা না করিলেও, তাহাদের কণ্ঠ বলিষ্ঠভাবেই শোনা গিয়াছে। গোলটেবিলের পরিণাম সম্পর্কে কোনো সংশয় না থাকায় আগামী সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত হইতে হইবে। গভর্নমেন্ট পরিস্থিতির উপর নজর রাখিবে এবং দেশ নিঝুম হইয়া পড়িলে, গভর্নমেন্টের মনোভাব তখনই কঠিন হইয়া পড়িবে। যে-সরকার জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনজন যুবককে ফাঁসি দিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহারা ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া স্বরাজ দিবে না।

কর্মসূচী পালন করো

ইতিমধ্যে যে কর্মসূচী উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা পালন করিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে, বিদেশী পণ্য বয়কট, মদ্য এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য বর্জন করিতে হইবে। সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, কংগ্রেস আইন অমান্য

আন্দোলন স্থগিত রাখিলেও, গোড়াকার অসহযোগ আন্দোলনের নীতি বজায় রহিয়াছে। অসহযোগের ভাবধারা বজায় রাখিতে হইবে, কারণ তাহার মর্মই হইল আত্মনির্ভরতা।

ভগৎ সিং-এর বাণী

জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস সেবকদের স্বাধীনতার মানোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র দেশই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ এবং সেজন্য যে-কোনো পীড়ন, দুঃখকষ্ট এবং সর্বস্বত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত! ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাহার মর্মকথা। বিদ্রোহের যে ভাবধারা দেশের চিত্ত জয় করিয়াছে ভগৎ সিং তাহার প্রতীক বিশেষ।

বিবৃতি

১০ এপ্রিল ১৯৩১ দিল্লী হইতে প্রচারিত বিবৃতি।

করাচী-কংগ্রেস সমাপ্তির পর বাংলা কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি হইবে বলিয়া আমি আশা করি। স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনো অসমাপ্ত রহিয়াছে, সেইজন্য আমাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর করিয়া— যদি আদৌ তাহা থাকে— আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সমবেত সংগ্রাম একটি অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সংগঠনে এই ঐক্যবোধ সঞ্চারিত না হইলে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ফলপ্রসূ হইবে না।

ইহা আনন্দের কথা যে কংগ্রেস-নির্বাচন অচিরেই অনুষ্ঠিত হইবে এবং বাংলাদেশও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠনের সুযোগ পাইবে। বাংলাদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠনরূপে আমি দেখিয়া আসিয়াছি এবং এই সংগঠনের মর্যাদা, সংহতি এবং নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখিবার জন্য আমি সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছি। এই কর্তব্যসাধন আমার পক্ষে সর্বদাই ফলপ্রদ ও সহজ হয় নাই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মর্যাদা, সংহতি এবং নিয়মানুবর্তিতা বজায় না রাখিতে পারিলে সেই প্রদেশে রাজনৈতিক জীবন ও কর্মতৎপরতা পরিচালনা সম্ভব

হয় না। যে-কোনো সময় যিনিই এই সংগঠনের দায়িত্বে থাকুন-না-কেন, তাঁহাকে নির্ভয়ে এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

ইহা বলাই বাহুল্য যে আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মপরিষদ যাহাতে ন্যায্য, অবাধ এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকিবে। কংগ্রেস সদস্য-তালিকাভুক্ত করিতে খাঁটি কংগ্রেস-সেবীদের সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং আশা করা যায় জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিও তাহাদের এলাকায় সদস্য-সংগ্রহের জন্য কংগ্রেসসেবীদের অনুরূপ পূর্ণ সুযোগ দিবে। বি. পি. সি. সি.র কর্ম-পরিষদ পুনর্গঠনে এবং তাহাতে সদস্য মনোনয়নে জেলা কমিটিগুলির এবং এখানে তাহাদের প্রতিনিধিদের মতামতকে সুবিবেচনার সহিত বিচার করা হইবে।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন তদারক করিবার জন্য করাচীতে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট রেফারী মনোনয়নের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। একমাত্র বাংলাদেশ-এর পক্ষ হইতেই এই প্রকার সুপারিশ করা হইয়াছিল, যেন সকল প্রদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাই নিজেদের নির্বাচন নিজেরা সামলাইতে পারে না। মাত্র কিছুদিন পূর্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের পর কার্যত বি. পি. সি. সি. যাহা-কিছু করিয়াছে তাহার সব-কিছু সমর্থন করিবার পর, এই প্রকার অনুরোধ বাংলার প্রতি অবিচার করিয়াছে। সৌভাগ্যের কথা ওয়ার্কিং কমিটি এই অনুরোধ নাকচ করিয়া দিয়াছে এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী আশ্বাস দিয়াছেন যে, বি. পি. সি. সি.র কর্মপরিচালনায় তিনি সাহায্য করিবেন এবং তিনি আশা করেন ওয়ার্কিং কমিটিও এ-বিষয়ে কম যাইবে না।

বাংলায় বি. পি. সি. সি.-ই সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংগঠন— আমি আশা করি এই ভাবনা আমাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করিবে এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কিভাবে আমাদের সেবাবৃত্তি প্রয়োগ করা হইবে। এই সংগঠনই তাহা স্থির করিবে। আমি আশা করি সকলে এই ভাবনায় অনু-প্রাণিত হইলে আমাদের বিরোধ মিটাইয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দাঁড়াইতে পারিব।

আত্মবিলয়ের জন্য তৈয়ারি হও

১৬ এপ্রিল ১৯৩১ লাহোরের ব্র্যাডল্ হলে ছাত্রসভায় করাচী-কংগ্রেস প্রসঙ্গে ভাষণ।

এই ভবনে শেষবারের ভাষণ ছিল যতীন দাস-এর আত্মবিলয়ে জাতীয় শোকচ্ছায়ায়, আর এইবারের সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে ভগৎ সিং-এর মহান আত্মত্যাগের শোকমগ্নতার ছায়ায়। এই দুইটি ঘটনা জাতির আত্মাকে কী পরিমাণ মথিত করিয়াছে, তাহা কোনো বিদেশীর পক্ষে অনুধাবন করা সহজ নহে। ভারতবর্ষ যতদিন পরাধীন থাকিবে ততদিন মাঝেমাঝেই জাতিকে এই প্রকার আঘাত সহ্য করিতে হইবে, ইহার কোনো অন্যথা নাই, দেশের জনসাধারণকে দৃঢ় মন লইয়া এই প্রকার আঘাতের মুখোমুখি হইতে হইবে।

করাচীতে বামপন্থীদের ভূমিকা

করাচীর কংগ্রেস অধিবেশনে বামপন্থীরা বিরোধিতা করিলেন না কেন এই অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। পরিস্থিতি গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, লাহোরের ফাঁসি (ভগৎ সিং-এর) কিম্বা চুক্তির শর্ত (গান্ধী-আরউইন) যতই প্ররোচনামূলক হউক-না-কেন করাচীর সমসাময়িক অবস্থায় বিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে না।

কলিকাতা অধিবেশন ও তাহার পরবর্তীকাল

কলিকাতায় কংগ্রেসের আদর্শ লইয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সেই সময় যুবশক্তি চাহিয়াছিল কংগ্রেসের আদর্শরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করা হউক। এই স্বার্থহীন লক্ষ্যপূরণে তাহারা সংগ্রামের মধ্যে দিয়া কংগ্রেস অধিবেশনকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। কলিকাতায় চরমপন্থী যুবশক্তিদের কিম্বা বামপন্থীদের বিরোধিতার ফলেই নিঃসন্দেহে লাহোর-অধিবেশনে কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু লাহোরে বিরোধিতার কারণ ছিল, কংগ্রেসের গৃহীত কর্মসূচী, বামপন্থীদের দৃষ্টিতে, পূর্ণ স্বাধীনতার জাতীয় আদর্শের সহিত সংগতিপূর্ণ ছিল না—সঠিক হোক কিম্বা ভ্রান্ত হোক বামপন্থীদের মনে এই ধারণাই দানা বাঁধিয়াছিল, দ্রুত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে এই ধরনের সংগ্রামী কর্মসূচীই তাহাদের কাম্য ছিল। স্মরণ থাকিতে পারে যে কর্মসূচী সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব লাহোরে বিষয়-

নির্বাচনী কমিটিতে বাতিল হইয়া প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই একটি সংগ্রামী কর্ম্মসূচী উদ্ভাবন করিয়া অনতিবিলম্বে বামপন্থী অভিযোগ দূর করিয়াছিলেন।

সংগ্রামের সূচনা

অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩০, ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌বোধনের মধ্যে দিয়া সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। তারপরই মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক অভিযান। তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ সকলেরই জানা আছে, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। লাহোর-অধিবেশনের পর কংগ্রেস সংগ্রামী কর্মসূচী গ্রহণ করিলে, সেই অধিবেশনের বাদ-বিসম্বাদ ঐক্যান্ধ সংগ্রামের মুখে দূঢ় হইয়া গেল।

করাচী কী করিয়াছে

করাচীতে যেমন স্বাধীনতার লক্ষ্যে কংগ্রেস পুনরায় আস্থা স্থাপন করে, তেমনি গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে কংগ্রেসের সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। মহাত্মা গান্ধী সেজন্য প্রস্তুতই ছিলেন সুতরাং করাচীতে বিরোধের অবকাশ ছিল না। অবশ্য চুক্তির (গান্ধী-আরউইন) শর্তগুলি প্রথম প্রকাশিত হইলে সরল মানুষের মনে নৈরাশ্য দেখা দিয়াছিল, দেশে আদৌ কোনো উৎসাহের সৃষ্টি করে নাই। মহাত্মা গান্ধীর এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রতি সহজাত আস্থার জন্য জনসাধারণ প্রকাশ্যে তাহাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করে নাই।

বামপন্থীরা কী করিতে পারিত

করাচীতে বামপন্থীদের সম্মুখে তিনটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, তাহারা খোলাখুলিভাবে চুক্তি-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিত এবং সফলও হইত; দ্বিতীয়ত, চুক্তি-প্রস্তাব বাতিল করিতে সচেষ্ট হইয়া বিফল হইতে পারিত; তৃতীয়ত, সরাসরি বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে পারিত। চুক্তি সমর্থনের প্রশ্নে তাহারা কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া স্বপক্ষে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহা নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার সামিল হইয়া তাহাদের পদত্যাগে বাধ্য করিত। সমর্থন-প্রস্তাব কংগ্রেসে বাতিল

হইলে, আইন-অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করিবার দায়িত্ব তাহাদের উপর বর্তাইত। কংগ্রেসের দ্বিধাবিভক্তির এবং সংগ্রাম হইতে নেতৃবৃন্দের সরিয়া যাইবার পর তাহাদের বিপদসংকুল অবস্থায় পড়িতে হইত। এই পথ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা চূড়ান্ত স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হইতেন।

কংগ্রেসের মর্যাদা

আর-একটি বিকল্পও তাঁহাদের সম্মুখে খোলা ছিল। তাঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও চুক্তিটি অনুমোদিত হইতে পারিত। নিঃসন্দেহে তাহা মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিজয় হইলেও, সেই দ্বিধা-বিভক্তি কংগ্রেসকে দুর্বল করিয়া দিত। ফলে ভবিষ্যতে কংগ্রেস নেতাদের কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার সম্পর্কে আমলাতন্ত্র প্রশ্ন তুলিত এবং করাচী-কংগ্রেসে নেতৃত্বর অপসারণ প্রচেষ্টা সম্পর্কিত সাধারণ সদস্যদের আলোচনা তাহাদের স্বপক্ষে নজীর হিসাবে উদ্ধৃত করিত। নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই পথ গ্রহণ করিলে, জনসাধারণের এক বৃহদংশের দৃষ্টিতে সাধারণ সদস্যবৃন্দ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইত এবং সেই নিষ্ফল বিরোধিতা, হঠকারিতা ও নিবুদ্ধিতার পরিচায়করূপে বিদেশীদের, বিশেষভাবে ইংরেজদের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের মর্যাদা খর্ব করিত। এই পদ্ধতির দ্বারা কোনো লাভ হইত না। সুতরাং, বিরোধিতা না করিয়া নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই তাহাদের নিকট একমাত্র বিকল্প পথ খোলা ছিল।

আমলাতন্ত্রের ফাঁদ

কংগ্রেস সদস্যদের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা গভর্নমেন্টের আর বেশি-কিছু কাম্য ছিল না। করাচীতে কংগ্রেস বিভক্ত হইলে তাহারা আমলাতন্ত্রের ফাঁদে পা দিতেন। সেই অবস্থায় তাঁহারা কংগ্রেসের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়া আন্তর্জাতিক সুনামও প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও খর্ব করিতেন। জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রবল দাবির বিরুদ্ধে, কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে, ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের ফাঁসি দিয়া আমলাতন্ত্র বুঝাইয়া দিল যে তাহারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য কতটুকু পরোয়া করে। গভর্নমেন্ট কেবলমাত্র ফাঁসির আদেশ রদ করিবার দাবিই অগ্রাহ্য করে নাই, কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে অশোভন ব্যস্ততার সহিত ফাঁসি দেওয়া হয়। কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির

মতলবেই যে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্তদৃষ্টিসম্পন্নরাই তাহা অনুধাবন করিবেন। কিন্তু কংগ্রেসকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়া তাঁহারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারেন।

বামপন্থীদের প্রভাব

বামপন্থীরা একেবারে রাজনৈতিক বুদ্ধি-বিবর্জিত ছিল, এ কথা বলা চলে না। বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পর তাহারা ঐ সিদ্ধান্তে পেঁছায়। তাহা ছাড়া, চুক্তি যে সাময়িক মাত্র, ইহাও তাহাদের মনে হইয়াছিল। গোলটেবিল বৈঠকের কোনো সুফলও তাহারা আশা করে নাই। সুতরাং কয়েকমাস বাদেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যখন সুনিশ্চিত, তখন দ্বিধাবিভক্তি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া তাহারা মনে করে। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সংগ্রামে বিমুখ হইবেন। ইহা মনে করিলে তাহারা দেশের স্বার্থে বাম ও দক্ষিণের সংহতি অতঃপর নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে ফাটল ধরাইতেন। বামপন্থীদের ভাঙনের জন্য কংগ্রেসে প্রকাশ্য বিরোধিতা সম্ভব হয় নাই, তাহা নহে, সেই পর্যায়ে কংগ্রেসকে দুর্বল না করিবার জন্যই তাহা করা হইয়াছে। যে গভর্নমেন্ট জাতির সমবেত দাবি সত্ত্বেও তিনটি জীবন ধ্বংস করিতে নিরস্ত হইল না, সহজে যে তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে না তাহা দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ। করাচীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে বামপন্থীরা কংগ্রেসের আলোচনায় প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বাধীনতার আদর্শ হইতে কংগ্রেসের স্খলন রোধ এবং গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য নিম্নতম দাবি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে।

বন্দীমুক্তির প্রশ্ন

সকল বন্দীদের কারামুক্তির প্রশ্নে সহিংস ও অহিংস বন্দীদের ভেদরেখা গভীর অসন্তোষের কারণ হইয়াছে— বিশেষভাবে ১৯২৯-এর দিল্লী ইস্তাহারে অথবা মহাত্মা গান্ধীর প্রখ্যাত এগারো দফায় কোনো উল্লেখ না থাকায়। রাজনৈতিক বন্দী বলিতে বিপ্লবী আন্দোলনের বন্দীদেরই বুঝাইত, কেননা তখনো আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয় নাই। করাচীতে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা হইয়াছিল।

সরকার হয়তো এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করিবে না, অথবা, এই দাবির বাস্তব মূল্যও সামান্যমাত্র বিবেচিত হইলেও নিঃসংশয়ে ইহার অসামান্য নৈতিক মূল্য ছিল।

কংগ্রেস ও সমাজবাদ

মৌলিক অধিকারের প্রস্তাবটি সুনিশ্চিতভাবে সমাজবাদী প্রকৃতির। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কতিপয়ের জন্য না হইয়া জনসাধারণের জন্য নিয়োজিত হইবে— করাচীতে কংগ্রেস সর্বপ্রথম সমাজবাদের দিকে পথ দেখাইয়া কার্যত এই ঘোষণা করে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে করাচী-কংগ্রেসে বামপন্থীদের জয়ই সূচিত হইয়াছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর আনুকূল্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও

বর্তমান অবকাশটুকুতে ঘর সামলাইয়া আগামী সংগ্রামের জন্য সকলের প্রস্তুত হইতে হইবে এবং প্রেরণাদীপ্ত সংকল্প লইয়া স্বরাজলাভে আত্মাহুতির জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারতবর্ষে স্থপতি-শিল্পের ভবিষ্যৎ

১৮ এপ্রিল ১৯৩১ বিদায়ী মেয়ররূপে ভাষণ। প্রসিদ্ধ ভারতীয় স্থপতি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি।

ভারতবর্ষ যেমন সাফল্যের সহিত নূতন চিত্রকলা-শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে, প্রখ্যাত স্থপতি শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে আমি ভাবিতাম কবে ভারতবর্ষ তেমনি একটি বিশিষ্ট স্থপতি-গোষ্ঠী গঠন করিতে পারিবে। ইহার অল্প কিছুকাল পরেই পত্র-পত্রিকায় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়িলে তাহার সহিত আমার এ-বিষয়ে আলোচনা হয় এবং যতই তাহার সহিত আলোচনা হইয়াছে, ততই আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

প্রকৃত ভারতীয় বৈশিষ্ট্য -সমন্বিত স্থপতি গোষ্ঠীর অগ্রণী রূপে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যথাসময়ে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। স্থপতি-

শিল্পে তিনি স্বকীয় ধারাকে পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য বৈদেশিক ধারার প্রভাবের সহিত সাঙ্গীকরণ ও বর্তমান কালোপযোগী করিয়া ভারতীয় ও বিশ্ব স্থপতি-শিল্পে নূতন কিছু দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইহা সকলের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় যে ভারতীয় স্থপতি-শিল্পকে জনপ্রিয় করিবার জন্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় প্রচারিত হইবার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের গৃহ-নির্মাণ বিভাগ ক্রমশ অধিকতর পরিমাণে তাহার আওতায় আসিতেছে এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে তাহার প্রবন্ধ সমূহ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।

আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের প্রতি উৎসাহের সহিত নজর রাখিতেছি এবং ভবিষ্যতেও রাখিব। আমি সর্বান্তঃকরণে তাহার সাফল্য কামনা করি। কারণ ভারতীয় স্থপতি-শিল্পের পুনর্জাগরণ এবং বিশ্বসভ্যতার সমৃদ্ধি তাঁহার সাফল্যসাপেক্ষ।

স্বাধীনতার গোপন কথা

১৪ মে ১৯৩১ নোয়াখালি 'দেবালয়' প্রাঙ্গণে প্রদত্ত ভাষণ।

ম্যাটসিনি ও তাঁর সমসাময়িক ইটালির কথা ভাবুন। স্বাধীনতার পথে হাজার রকম বাধাবিপত্তি ইটালির স্বাধীনতার লক্ষ্য হইতে ম্যাটসিনিকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ম্যাটসিনির যৌবনদৃপ্ত হৃদয়ের উচ্ছল স্রোতকে এ-সব রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

বিতর্ক এবং তর্কাতর্কির মাধ্যমে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না; আত্মার উপলব্ধি, সাধনা এবং সফল কর্মযোগে এর বাস্তবিক প্রয়োগ ও মাতৃভূমির বেদীতলে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমেই স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এই শতাব্দীর প্রথম অংশে যে বাংলার যুবশক্তি নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়াছেন তাঁহারাই ভারতীয় জাতির জন্মদাতা এবং তাঁহারা আজও আমাদের মধ্যে জীবিত। ইহাই স্বাধীনতার গোপন কথা, ইহাই জাতির জীবনের পথপ্রদর্শক। যুবকেরা নিঃসন্দেহে মাঝে মাঝে চঞ্চল হইয়া ওঠে, কিন্তু তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই। ইহাই জীবনের লক্ষণ, সত্য-সন্ধানের নির্দেশক। সারা পৃথিবীর যুব-

আন্দোলনের ইহাই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। ভারতবর্ষ এখনো পূর্ণ-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ রূপ দিতে পারে নাই। যুবকেরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছে এবং আমি নিশ্চিত কংগ্রেসও শীঘ্রই তাহা গ্রহণ করিবে।

আমরা জীবনের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা ঠিক একটি প্রদীপের মতো যাহা জ্বালাইলে গৃহের প্রতিটি কোণ আলোকিত হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা মানুষে মানুষে সাম্যের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাশিয়া একটা মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে, আজকের ইটালি আর একটি, এবং ভারতবর্ষও সাম্য ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে তার নিজের ভাষ্য গ্রহণ করিবে। ভারতীয় দর্শন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের শিক্ষা দেয়। উপনিষদ হইতে শুরু করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত ইহাই ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ভিত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের জীবনের আদর্শ। আমাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিবে। আমাদের সম্মিলিত সভ্যতাকে আমরা বিচিত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করিব। ভারতীয় আদর্শ যুদ্ধ নয়, প্রেম, এবং প্রেমই সেই সভ্যতার ভিত্তি। যুবকদের এই বিরাট সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং সেই আদর্শে উপনীত হইতে হইবে। বিভিন্ন যুব ও অন্যান্য সংস্থাগুলি সেই বিরাট নদীরই শাখা যার নাম কংগ্রেস। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যেমন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রদর্শন করিয়াছেন ছোটো প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্যই যেন সেইরকম বিদ্রোহ প্রদর্শন না করে। তাহারা কংগ্রেসেই শক্তি সঞ্চার করিবে।

ইংরেজরা মিস মেয়োর মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে তাহাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় নারীত্ব এক বছরের সংগ্রামে তাহাদের সাহসিকতাপূর্ণ কাজকর্মের মধ্য দিয়া ইহা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে। ভারতীয় স্বাধীনতা মাতা ও ভগিনীর বলিদান চায় এবং তাহা ভিন্ন ভারতীয় জাতিবোধ মিথ্যা।

আমরা দেশবন্ধুর কথা বিস্মৃত হইয়াছি, জাতি-চেতনা হারাইয়াছি. অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম যে কারণ অর্থাৎ যুক্তবঙ্গের ধারণার বিস্মৃতি হইতেই আমরা দলীয় স্বার্থের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছি। ভৌগোলিক ঐক্যই কি যথেষ্ট ? না, অতীতে ভারতীয় জাতিচেতনার উদ্ভবে যে ভাবধারা কার্যকর ছিল তাহাকেই আবার উজ্জীবিত করিতে হইবে। সকলকেই একতাবদ্ধ

হইয়া সমস্ত দৃষ্টিকোণ হইতে পূর্ণ-স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইবে এবং সবচেয়ে বেশি আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী যে ন্যূনতম আত্মোৎসর্গের কথা বলেন তাহা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, কিন্তু যুবকদের পক্ষে আত্মোৎসর্গের পরিমাণ হইবে সর্বাধিক। যুবকদের একটা কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে যাহার পরিণতিতে বলশালী দেহ, উদার হৃদয়, আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতি এবং প্রশস্ত আত্মার অধিকারী হইবে। আমরা হাজার হাজার যতীন দাস চাই, আমরা যুবকদের মধ্যে নিঃস্বার্থ আত্মবিশ্বাস চাই। যৌবনই গড়িয়া তুলিবে ভবিষ্যৎ ভারত যেখানে স্ত্রী পুরুষ, শ্রমিক কিষাণ এবং অন্যান্য সকলেই নিজের নিজের ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

শ্রমিক-আন্দোলনের ঐক্য-প্রচেষ্টা

২০ মে ১৯৩১ বিভিন্ন শ্রমিক-ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে পত্র।

আপনারা জানেন ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত নাগপুরের গত অধিবেশনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে একটা বিভেদ শুরু হইয়াছে যখন কয়েকটি ইউনিয়ন কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়াছে এবং কয়েকটি ইউনিয়ন নিরপেক্ষ রহিয়াছে। এতদিন পর এবং বিশেষত দেশের বর্তমান অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ডামাডোলের মুহূর্তে, সেই বিভেদ অথবা তার কারণ সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া লাভ নাই। বরং এখন সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আপসের সমস্ত সম্ভাব্য পথগুলি খুঁজিয়া দেখা এবং ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য ফিরাইয়া আনাই অবশ্যকর্তব্য— এই উদ্দেশ্যই আমি সাধারণ সম্পাদককে আগামী ৬ জুন কলকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এক সভা আহবান করিতে বলিয়াছি। আমি একই সংগে শ্রমিক-আন্দোলনের স্বার্থে এবং কলকাতায় কংগ্রেসের আসন্ন অধি-বেশনের সাফল্যের জন্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনও আহবান করি যাতে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসা যায়।

এই সুযোগে আমি আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি এবং সহজ সমাধানের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে আপনাদের মতামত আহবান

করি যাতে আলোচনার সুবিধার্থে সমস্ত অভিমত এবং মতামত পূর্বাহ্ণেই গ্রহণ করিয়া সাজাইয়া রাখা যায়।

দলাদলির অবসান

২২ মে ১৯৩১ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির বিবৃতি।

আমি এ কথা ঘোষণা করিতে খুবই আনন্দিত যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ত্রিপুরার কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ যে দলাদলি ছিল আমরা তার অবসান ঘটাইতে পারিয়াছি। উক্ত জেলায় সব দলের কংগ্রেসীদের আস্থা ও বিশ্বাস লইয়া একটা শক্তিশালী কংগ্রেস সংগঠন গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা এখন উজ্জ্বল। যাঁরা এই মিটমাট সম্ভব করিয়াছেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কার্যকরী সমিতির কর্মকর্তা ও সভ্যদের একটা সর্বসম্মত তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তাহা কার্যকর করা হইবে। কুমিল্লার সমস্ত দলের প্রতিই বন্ধু-ভাবে আন্তরিকতার সংগে মিলিত ভাবে কাজ শুরু করার আবেদন জানাইতেছি। যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে অতীতের তিক্ততা ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইবে এবং সব দলের কংগ্রেসীরাই ভাইয়ের মতো কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।

এটা সৌভাগ্যের কথা যে ফরিদপুর ও সিলেটের বিতর্কের অবসানের সংগে সংগেই ত্রিপুরার বিতর্কের অবসান ঘটিয়াছে— এবং সমস্ত দলের সহযোগিতা ছাড়া এই মিটমাট সম্ভব হইত না। সেই-সব দলের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি গভীরভাবে আশা করি যে যদি কোনো জেলায় বাদানুবাদ থাকে তাহা হইলে তা এইরকমভাবেই দ্রুত সমাপ্তিলাভ করিবে এবং আমি সকলের কাছেই এই সুখী সমাধানের জন্যে আবেদন জানাইতেছি।

ভবিষ্যৎ ভারত

মথুরায় অনুষ্ঠিত উত্তরপ্রদেশ নওজওয়ান ভারতসভা সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

আপনাদের মতো দেশপ্রেমিক কর্মী ও স্বাধীনতাপ্রেমীদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসার যে সুযোগ আপনারা করিয়া দিয়েছেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনারা দয়া করিয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার প্রাপ্য নয়— এবং তাহা যোগ্যতা বিচার করিয়া আমাকে প্রদর্শন করা হয় নাই— আমার মতো এক সহকর্মীর প্রতি স্নেহবশতই করা হইয়াছে। এই ধরনের সম্মেলনে যোগ দিলে প্রথমেই যে-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে তাহা হইল— দেশে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামে শ্রেষ্ঠ একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন রহিয়াছে তখন পৃথক একটি নব-যৌবন ভারতসভা আন্দোলনের কী প্রয়োজন? অন্যান্য জরুরী প্রশ্নের যোগ্য উত্তর অনেক সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করিবে এবং অন্যান্য সর্বজনীন সংস্থার সংগে নব-যৌবন ভারতসভার সম্পর্ক নিরূপণ করিবে।

নওজয়ান ভারতসভা আন্দোলন একটা স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাপার নয়, এটা একটা অখিল ভারতীয় আন্দোলন, সম্ভবত বিভিন্ন নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে এর আবির্ভাব, দেশের বিভিন্ন স্থানে এর বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন স্থানে এর সামান্যই পৃথক কর্মসূচী বা কর্মপদ্ধতি। এ-সব সত্ত্বেও এই আন্দোলনের মৌল চরিত্র দেশের সব জায়গায় এক। এই আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে এই আন্দোলনের উদ্ভবের যথেষ্ট যুক্তিসহ কারণসমূহ বর্তমান ছিল।

এই আন্দোলনের পিছনে যে মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপনা দেখা যায় তাহা হইল এক অস্থিরতার অনুভূতি এবং বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে বিরোধের অধৈর্য ও সার্বিক পরিবর্তনের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা। এই মৌল অনুভূতির একটা ধ্বংসমূলক ও একটা গঠনমূলক উৎপাদান আছে। যুবমনে যাহা পুরানো, অনুপযুক্ত, অযোগ্য বা মন্দ তাহা ধ্বংস করিয়া যাহা নতুন, প্রয়োজনীয় বা সুন্দর তাহা গড়িয়া তোলার ইচ্ছা এত প্রবল যে বর্তমান আন্দোলন বা সংগঠন সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে যথোপযুক্ত রূপ দিতে সক্ষম নয়। সেই কারণেই যুবসমাজ একটা আন্দোলন শুরু করার এবং একটা সংগঠন গড়িয়া তোলার

ডাক শুনিতে পাইল যাহার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের ধ্বংসমূলক ও গঠনমূলক মনোভাব এবং আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং কয়েকটি বাধার মধ্য দিয়া কার্যও করিয়া যাইতে হইবে। এর সেই এক দায়িত্ববোধ আছে যাহা যুব-সংগঠনের গড়িয়া ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো থাকে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে মনুষ্যসম্ভব শক্তিতে সারা দেশকে আগাইয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং সেই কারণেই তাহার গতি হইবে শ্লথ। এ ছাড়া, কংগ্রেস প্রধানত একটি রাজনৈতিক সংস্থা; এবং সাধারণত, রাজনৈতিক আবেদন না থাকিলে কোনো ব্যাপারে এই সংস্থা নিজেকে যুক্ত করিতে পারে না।

শেষ কথা হইল, সারা দেশকে সঙ্গে লইতে হইলে কংগ্রেসকে তার নৌকার পালকে ঠিকমতো ছাঁটকাট করিতে হইবে, এবং সব সম্প্রদায়, দল বা মতাবলম্বী-দের ইচ্ছা, স্বার্থ বা দাবিগুলিকে পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে।

চরিত্রে এবং দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক দেশের যুব-সংগঠনগুলি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় চিন্তায় ও কর্মে অনেক স্বাধীন। এই মুহূর্তেই সমস্ত দেশকে তাহাদের সঙ্গে লইবার দরকার নাই, তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল যুবকদের একতাবদ্ধ করা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো তাহাদের দায়িত্ববোধের বোঝাও নাই। এর ফলস্বরূপ তাহারা যত দ্রুত চলিতে চায় তত দ্রুত চলিতে পারে, যত বৈপ্লবিক হইতে চায় তত বৈপ্লবিক হইতে পারে— তাহার জন্যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এই ভয় তাহাদের থাকে না।

মানুষের ইতিহাসে কখনো কখনো দেখা গিয়াছে যে প্রধান সংস্থার একটি চরমপন্থী অংশ নিজেদের একটা সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে যাহার মাধ্যমে ঐ অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাইতে পারে।

দুইটি পৃথক সংগঠন পরস্পর দ্বন্দ্ব এড়াইতে পারে কিনা এবং নিজেদের ও সাধারণভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্য মিলিতভাবে কাজ করিতে পারে কিনা তাহা সম্পূর্ণই সংগঠনগুলির সভ্যদের উপর নির্ভর করে। বর্তমান ভারতে কোনো কোনো অংশে যুব-সংগঠন ও কংগ্রেসী সংগঠনের মধ্যে কোনো বিবাদ নাই— যদিও অন্যান্য অংশে একধরনের দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

যুব-সংগঠন ও কংগ্রেসী সংগঠনের অযথা বিবাদ এড়াইবার দুইটি উপায় আছে— যুব-সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসী সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ

করার ইচ্ছা পোষণ করিতে হইবে এবং কংগ্রেসী সংগঠনগুলিকে যুবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে যেখানে কংগ্রেস সংস্থা যুবকদের হাতে ন্যস্ত বা যারা যুবকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত সেই-সব ক্ষেত্রে প্রায়শই দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়।

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নওজয়ান ভারতসভার মধ্যে কোনো সহজাত বিরোধ নাই। যদি এ-দুইটির মধ্যে কোথাও কোনো বিরোধ বা ভুল-বোঝাবোঝি দেখা যায়, তবে তাহা আমাদেরই তৈরি, এবং দুই পক্ষের সদিচ্ছার সাহায্যে খুব সহজেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটানো যাইবে। যদি কংগ্রেস ও নব-যৌবন ভারতসভার মধ্যে এই বিরোধ ও ভুল-বোঝাবোঝি দূর করা না হয়, তবে আমার মতো পুরোপুরি কংগ্রেসীদের —যারা যুব-আন্দোলনেরও পৃষ্ঠপোষক— অবস্থা প্রকৃতই বড়ো মুশকিলের হইয়া উঠে।

যদি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগে সম্পর্কে নব-যৌবন ভারতসভাকে একটা উপআন্দোলন বলিয়া ধরা হয়, তা হইলে সেটাই আমার মনোভাব প্রকৃত প্রকাশ করিবে। যুব-আন্দোলন সমস্যার পরোয়া করে না। এ শুধু সমাজের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে একতাবদ্ধ করিবে। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনই নয় কারণ এ মনুষ্যজীবনের সব দিক সম্পর্কেই আগ্রহান্বিত এবং এ সম্পূর্ণ নতুন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিচালন-সংস্থার প্রবর্তন করিবে। আজকার ভাসা-ভাসা সমস্যার সমাধান করিয়াই এই আন্দোলন সুখী হইবে না, এ আমাদের জীবনের গভীরতর সমস্যাগুলিকেও গ্রহণ করিবে এবং সেগুলি সমাধান করিতে চেষ্টা করিবে। দুপক্ষের সদিচ্ছা থাকিলে বিনা দ্বন্দ্বে এই-সবই করা সম্ভব।

নওজওয়ানদেরও উপলব্ধি করিতে হইবে যে কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। সে কারণেই এমন কিছু করা উচিত নয় যা ঐ সংস্থার সম্মান নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। সহযোগিতার মনোভাব লইয়া তাহাদের কাজ করা উচিত এবং যদি তাহারা চায় তাহা হইলে তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী বা রক্ষণশীলদের প্রভাবিত করার জন্য তাহার একটা শক্তি হিসাবেও কাজ করিতে পারে।

কংগ্রেসীদেরও নওজওয়ানদের সন্দেহ বা বিরোধের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। তাদের স্মরণ করা উচিত যে নওজওয়ানরা ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধি-

কারী এবং তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও দরদী হওয়া প্রয়োজন। যদি দুপক্ষই এরকম বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভবের দ্বারা উদ্দীপিত হয়— তাহা হইলে আমার নিশ্চিত ধারণা এই দ্বন্দ্ব বা শত্রুতা বা ভুল-বোঝা-বুঝি সহজেই এড়ানো যায়।

করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত নওজওয়ান ভারতসভার গত অধিবেশনে আমি নওজওয়ানদের বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া এবং ইহার বিরুদ্ধে কাজ করা অপেক্ষা তাহাদের কংগ্রেসেরই বামপন্থা হিসাবে সংগঠিত হওয়া উচিত। তাহার ফলে তাহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শক্তি ক্ষুণ্ণ না করিয়া বৃদ্ধিই করিবে। কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে আগাইয়া চলিয়াছে। ইহা গতিশীল সংস্থা এবং সাধারণের মতামতের প্রতি আস্থাবান। এর মহান ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি রহিয়াছে— এবং অতীতে বংশানুক্রমিক বিশাল সব আত্মদানের উপর এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। এর অতীত ও বর্তমান নেতারা প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররাজি যাঁরা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে দেদীপ্যমান। সর্বশেষে আমি কি এই প্রশ্ন করিতে পারি— পৃথিবীর আর কোথায় মহাত্মা গান্ধীর মতো আর-একজন নেতা পাওয়া যায়?

যদি কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অগ্রসর না হইত— যদি কংগ্রেস একটা রক্ষণশীল সংস্থা হইয়াই থাকিত, জনমতের সমর্থনে অপারগ হইত, কংগ্রেসী নেতারা স্বার্থপর হইতেন এবং দেশপ্রেমিক না হইতেন, তাহা হইলে আমি নওজওয়ান বন্ধুদের কংগ্রেসের পন্থার বিরোধী কোনো ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করার উপদেশ দিতাম। কিন্তু ব্যাপার যা ঘটিয়াছে তাহাতে কংগ্রেস নওজওয়ানদের সপক্ষেও যতটা, অন্যদের সপক্ষেও ততটা রহিয়াছে। আমি এমন কথাও বলি যে কংগ্রেস নওজওয়ানদের সপক্ষেই বেশি আছে, কারণ তাহারাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী। সুতরাং সারা ভারতের নওজওয়ানেরা যদি পুরাপুরি কংগ্রেসে যোগদান করেন ও ইহার মাধ্যমে কাজ করেন তাহা হইলে শীঘ্রই কংগ্রেস সংস্থা তাহাদের হস্তগত হইবে।

আমি বলিয়াছি যে নওজওয়ান ভারতসভা সম্মেলন কোনো স্থানীয় বা প্রাদেশিক ব্যাপার নয়। আমি আরো বলিব যে ইহা বিশ্বপ্রপঞ্চেরই প্রতিনিধিত্ব করে— এমন-কি, যে-সব দেশ রাজনীতিগত ভাবে স্বাধীন সে-সব দেশেও যুব-আন্দোলন বর্তমান। তাহার কারণ এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল আমাদের সমস্ত জীবনের পুনর্গঠন— ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়তই।

এবং যতদিন না এই উদ্দেশ্য সফল হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত যুব-আন্দোলনের অস্তিত্ব লোপ পাইবে না।

প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ উন্নততর সমাজব্যবস্থার সন্ধানী। এই অনুসন্ধান সমানভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে চলিয়াছে এবং শুধু ঋষি আর স্বপ্নদ্রষ্টারাই নয়, পরন্তু রাজনীতিবিদ ও রাজপুরুষেরাও ইহার সন্ধানে রহিয়াছেন। আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্পনা বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে— কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে আছে একই তাড়না। প্রাচ্যের লোকেরা ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা আদর্শ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কখনো কখনো লোকেরা প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছে যেখান হইতে উহাদের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে করে— অন্যান্য সময়ে ওরা যুগসঞ্চিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছে অতীতের ধ্বংসস্তূপের উপর মহৎ ও আদর্শ কিছু গড়িয়া তোলার জন্য। আরো ভালো সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধানে মানুষ যুগে যুগে আলো-অন্ধকারের ধূসরিমায় হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য সবই সেই আদর্শের পলায়মান আলেয়ার প্রতি কিছু আলোকসম্পাতের চেষ্টা করিয়াছে।

যুগে যুগে প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশের এই প্রয়াসগুলির অনুসন্ধান ও পঠনপাঠন খুবই চিত্তাকর্ষক হইবে, কিন্তু তাহাতে আমাদের অনেক সময় লাগিবে এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা হইতে আমাদের নজর বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এ কথা বলাই যথেষ্ট যে মানুষ প্রগতির মতবাদ গ্রহণ করিয়া বিপরীত মতবাদ বর্জন করিয়াছে— অর্থাৎ মানুষের পতন ও তাহার পরবর্তী অবনতির মতবাদ বর্জন করিয়াছে। আমাদের আলোচনার সূত্রপাত স্বরূপ এই প্রগতির মতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমরা যদি বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক আদর্শ যাহা যুগে যুগে মানুষের প্রচেষ্টা ও কর্মকে উদ্দীপনা জোগাইয়াছে তাহার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে কয়েকটি সাধারণ সত্যে উপনীত হইব। আমাদের হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া এবং কী নীতি ও আদর্শ আমাদের জীবনকে বাঁচার উপযোগী করিবে সে সম্পর্কে নিজেদের প্রশ্ন করিয়া একই ফল পাইব। যে-কোনো পন্থাই অবলম্বন করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমাদের সম্মিলিত জীবনের ভিত্তি হইবে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা

এবং প্রেম। আমাদের সমস্ত কাজকর্ম ও সম্পর্ক যে একটা ন্যায়বোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এ-সম্পর্কে বিতর্কের প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হইতে গেলে সমস্ত মানুষের সহিত সমান আচরণ করিতে হইবে। মানুষকে সমান করিতে গেলে তাহাদের মুক্ত করিতে হইবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যে-কোনো বন্ধনই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে ও নানারকম অসাম্যের উদ্ভব ঘটায়। সুতরাং সাম্য নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধন এড়াইতে হইবে এবং আমাদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু মুক্তির অর্থ বিশৃঙ্খলা বা যথেচ্ছাচার নয়। স্বাধীনতা বলিতে আইনের বিলোপ বুঝায় না। ইহা বলিতে আমাদের নিজস্ব আইন ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে বাহ্যিক আরোপিত আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিস্থাপন বুঝায়। যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি কেবলমাত্র তখনই যে আমাদের উপর নিজেদেরই আরোপিত শৃঙ্খলার প্রয়োজন তাহাই নহে, পরন্তু যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামরত তখনই ইহার অধিকতর প্রয়োজন। সুতরাং, ব্যক্তি-বিশেষই হউক বা সমাজই হউক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ স্বাধীনতার প্রয়োজন। শেষ কথা হইল, এইসকল মৌল নীতি, যথা, ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা আর একটি উচ্চতর নীতি, যথা, প্রেমের দ্যোতক। মানুষের জন্য প্রেমানুভূতিতে উদ্দীপিত না হইলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ হইতে পারিব না, সকল মানুষকে সমান বলিয়া ভাবিব না, স্বাধীনতার জন্য কষ্ট সহ্য করিতে ও ত্যাগ করিতে পারিব না এবং ঠিক ধরনের শৃঙ্খলার প্রবর্তন করিতে পারিব না। এই পাঁচটি নীতিই, আমার মতে, আমাদের যৌথ জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। আমি আরো বলিব যে এই পাঁচটি নীতিই আমার বুদ্ধিগ্রাহ্য সমাজতন্ত্রের সার বস্তু— সেই সমাজতন্ত্র যাহা আমি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি অদূরভবিষ্যতে ভারত এমন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবে যাহা নানাভাবে পৃথিবীর নিকট শিক্ষণীয় বিষয় হইবে, যেমন বর্তমান কালের মানুষের ক্ষেত্রেও বলশেভিক-বাদের নিকট নানা শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে বিষয়বিবিক্ত নীতিগুলি একই পদ্ধতি, রূপ ও পরিমাণ অনুযায়ী সব জাতি ও দেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে। মার্ক্সীয় নীতি যখন রাশিয়া এবং

রাশিয়ার অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করা হইয়াছিল তখন তাহা বলশেভিকবাদের জন্ম দিয়াছিল। সেইরূপ, সমাজবাদ যখন ভারত ও ভারতীয় অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হইবে তখন তাহা একটি নূতন পদ্ধতি বা ধরনের সমাজবাদের জন্ম দিবে যাহা ভারতীয় সমাজবাদ বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারে। পরিপার্শ্ব, জাতীয় মেজাজ, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এই সমস্তই এক কলমের খোঁচায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সুতরাং তাহারা যে নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা হইতেছে তাহা প্রভাবিত বা পরিমার্জিত করিতে বাধ্য।

বিদেশ হইতে আলোক এবং উদ্দীপনা খুঁজিতে যাইয়া আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমরা অন্যলোকদের অন্ধ অনুকরণ করিতে পারি না এবং কী আমাদের জাতীয় প্রয়োজন ও জাতীয় প্রতিভার উপযোগী তাহা বিচার করিয়া অন্যদের নিকট হইতে আহরিত জ্ঞান আমাদের আত্মীকরণ করিতে হইবে। সেই প্রবাদ বাক্যটিতে প্রভূত সত্য নিহিত আছে: "একের মাংস অন্যের বিষ।" সে-কারণে আমি যাঁহারা বলশেভিকবাদের নীতি ও পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণের বাসনা করেন তাঁহাদের প্রতি সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করিব।

বলশেভিকবাদের নীতি সম্পর্কে আমি বলিব যে বর্তমানে বলশেভিকবাদ এক পরীক্ষামূলক স্তর দিয়া যাইতেছে। মার্ক্সের মূল নীতি হইতেই যে সরিয়া গিয়া অন্যপথ অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাই নহে, পরন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পূর্বকালীন লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক নেতৃবৃন্দের প্রদর্শিত পথ হইতেও দূরে যাওয়া হইতেছে। রাশিয়ায় প্রচলিত অদ্ভুত অবস্থা ও পরিপার্শ্বের জন্যই ভিন্ন পন্থা অনুসৃত হইতেছে যাহা বলশেভিকদের দ্বারা প্রদর্শিত রীতিপদ্ধতির মূল নীতিকে পরিমার্জন করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি বলি যে ভারতীয় অবস্থায় ঐগুলি উপযুক্ত না হইতেও পারে।

ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি বলিতে পারি যে কমিউনিজমের বিশ্বজনীন ও মানবিক আবেদন থাকা সত্ত্বেও, ইহা ভারতবর্ষে তেমন কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই— প্রধানত এই কারণে যে ইহার প্রবক্তারা যে পন্থা ও রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে সম্ভাব্য বন্ধুদের স্বপক্ষে না আনিয়া বিচ্ছিন্নই করা হইয়াছে।

আমি যাহা বলিয়াছি তাহার সারমর্ম ইহাই যে আমি ভারতবর্ষে একটি সমাজতান্ত্রিক গণরাষ্ট্র দেখিতে চাই। সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে কী রূপ লইবে তাহা এই পর্যায়ে বিশদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এই পর্যায়ে

আমরা কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান নীতি ও বৈশিষ্ট্যের একটি খসড়া তৈয়ারি করিতে পারি। আমাকে যে-বাণী দিতে হইবে তাহা এক সম্পূর্ণ, সর্বাতিশায়ী, অবিমিশ্র স্বাধীনতার বাণী। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই, যাহার অর্থ একটি স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠন যাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবে। ইহা সকলেরই পরিষ্কার-ভাবে বোঝা উচিত যে স্বাধীনতার অর্থ হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্নতা এবং এই ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা বা মানসিক দ্বিধা থাকিলে চলিবে না।

দ্বিতীয়ত, আমরা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি চাই। প্রত্যেক মানুষেরই কর্মের এবং জীবনধারণোপযোগী বেতন পাইবার নিশ্চিত অধিকার থাকিবে। আমাদের সমাজে কোনো পরগাছা এবং অনুপার্জিত আয় থাকিবে না। সকলের জন্যই সমান সুযোগ থাকিবে। সর্বোপরি, সম্পদের সম্যক, ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য বণ্টন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদ বণ্টনের কেন্দ্রগুলি অধিগ্রহণও করিতে হইতে পারে।

তৃতীয়ত, আমরা পূর্ণ সামাজিক সাম্য চাই। জাতি বা অনুন্নত শ্রেণীর বলিয়া কিছু থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির একই অধিকার, সমাজে একই মর্যাদা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সামাজিক মর্যাদায় বা আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষে কোনো বৈষম্য থাকিবে না এবং নারী সকল ব্যাপারেই পুরুষের সমান অংশীদার হইবে।

সুতরাং সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি— যাঁহারা কোনো-না-কোনোভাবে উৎপীড়িত বা অত্যাচারিত হইতেছেন—আমাদের একটি নতুন বাণী আছে। রাজনৈতিক কর্মী, বেতনভোগী, ভূমিহীন ও সম্পত্তিহীন প্রলেটারিয়েট, তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী এবং নারীদের প্রতি আমাদের একটি বক্তব্য আছে। এই অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত শ্রেণী— বলিতে গেলে— আমাদের সমাজে র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক উৎপাদনের প্রতিনিধিত্ব করে। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি একটি নূতন বাণী লইয়া তাহাদের অভিনন্দন জানাইতে আগাইয়া যাই— সেই সম্পূর্ণ সর্বাতিশায়ী স্বাধীনতার বাণী— তাহা হইলে তাহারা অচিরে উদ্দীপিত হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে উত্তেজিত করা না যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা পাইতে পারি না, এবং একটি নূতন বাণী যাহা মনুষ্য-জীবনকে নূতন অর্থ ও উদ্দেশ্য জোগায় তাহা শুনাইয়া উৎসাহিত করা

ব্যতীত আমরা আমাদের ভিতরের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে জাগাইতে পারি না।

গত ত্রিশ বৎসরে এবং বিশেষ করিয়া গত দশ বা বারো বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ বহুবিধ পাশ্চাত্য 'ইজম' দ্বারা ভরিয়া গিয়াছে। এই মতবাদগুলির কয়েকটি একান্তই পাশ্চাত্য— সেগুলি পাশ্চাত্য অবস্থাবিশেষের একমাত্র ফসল যে-অবস্থা প্রাচ্যে নাই; অন্যান্য মতবাদগুলি— যেমন সমাজবাদ— ভাসা-ভাসাভাবে পাশ্চাত্য, অর্থাৎ, তাহারা এই অর্থে পাশ্চাত্য যে বর্তমানে পাশ্চাত্যদেশীয়েরা তাহার প্রচার করিতেছে— অথচ বাস্তবিক পক্ষে কোনো-না-কোনোরূপে বা কোনো-না-কোনো নামে সমাজবাদ সমানভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকদের উৎসাহিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য চিন্তার আকস্মিক আবির্ভাব একটি চিন্তাশীল বাতাবরণ এবং কখনো বা চিন্তার বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছে। লোকেরা প্রথমে মনস্থ করিতে পারে নাই কী গ্রহণ এবং কী বর্জন করা উচিত। কিন্তু ক্রমশই আমরা আমাদের আচরণ দেখিতে পাইতেছি এবং এখন আমরা দৃঢ়নিশ্চয় যে যাহা আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও প্রার্থনীয় তাহা শুধু বিদেশাগত কোনো বস্তুর নির্বিচার গ্রহণ নয়, পরন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সংশ্লেষ। এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিশ্বাস ক্রমশই আমাদের মনে দানা বাঁধিতেছে। প্রথমে আমরা বিশ্বাস করিতে চাহিতাম যে আমাদের পছন্দমতো একটি মতবাদ গ্রহণ করার উপরই আমাদের মুক্তি নির্ভর করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ, এখন এমন লোকও আছে বলশেভিকবাদের নামে শপথ গ্রহণ করে এবং সৎভাবে চিন্তা করে, যে যদি আমরা বলশেভিক রাশিয়ায় যাহা বর্তমান তাহা বিশ্বস্তভাবে নকল করিতে পারি— তাহা হইলে ভারতবর্ষকে বাঁচানো যাইবে— এবং আমরা আমাদের অস্তিত্বের অনির্বচনীয় অবস্থায় পৌঁছাইয়া যাইব। কিন্তু এই বিশ্বাস এখন নির্মমভাবে টলিয়া যাইতেছে। প্রথমত, ইহা উপলব্ধি করা যাইতেছে যে কোনো বিমূর্ত মতবাদ জাতির মনোভঙ্গি, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পরিবেশ বিচার না করিয়া সেই জাতি বা জনগণের উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই উপাদানগুলি হয়তো একটি বিশেষ মতবাদকে কোনো দেশ বা জাতির পক্ষে অনুপযোগী করিতে পারে যে-মতবাদ সম্ভবত ভিন্ন অবস্থায় খুবই সফল বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, যে আদর্শগুলিকে আমরা আমাদের সম্মুখে অনুকরণ-

যোগ্য বলিয়া সাধারণত উপস্থাপন করি সেগুলি নিজেদেরই অসম্পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কেহই জানে না সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি কিভাবে সমাপ্তিলাভ করিবে।

এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে আমরা ক্রমশই আমাদের অগ্রগতির মধ্যে মানবিক উপাদানের মূল্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে কোনো মতবাদই আমাদের বাঁচাইতে পারে না যদি-না আমাদের মধ্য হইতে আরো যোগ্য মানুষের উদ্ভব ঘটাইতে পারি। ইহা ইতিহাসেরও অভিজ্ঞতা এবং সেই কারণে আমরা দেখি যে যুগে যুগে কোনো মতবাদ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মহত্তর মানুষেরও অনুসন্ধান চলিয়াছে। কখনো গ্রীক ডায়োজিনিস এক মহত্তর মানুষের অনুসন্ধান করিতেছেন ; কখনো এক ভারতীয় 'গুরু' বা 'অবতারের' সন্ধান করিতেছেন ; কখনো আবার জার্মান নীট্শে এক অতিমানবের সন্ধানী। সুতরাং, আমাদের নিশ্চিত উপলব্ধি করিতে হইবে যে কোনো মতবাদ বা 'ইজম'ই— তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হউক বা আমাদের নিজেদের দেশেই লালন করা হউক— ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে পারে যদি-না আমরা এক মহত্তর ও উচ্চতর ধরনের মানুষ তৈয়ারি করিতে পারি। সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক— সে যাহাই হউক — প্রতিষ্ঠানসমূহ বড়োজোর মনুষ্যত্বের উন্নতিবিধানে সাহায্য করিতে পারে, জীবন এবং উন্নতির জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটাইতে পারে, কিন্তু তাহারা অন্তরের উদ্দীপনার জন্ম দিতে পারে না। এই আন্তর উদ্দীপনাই আমাদের মনুষ্যপদবাচ্য করিতে পারে। এই আন্তর উদ্দীপনা হয় সহজাত, আর নয়তো ইহা আমাদের মধ্যে একটি উন্নততর আত্মা-কর্তৃক সঞ্চারিত অথবা ইহা সংকল্পের তাড়নায়— বাঁচিবার এবং উন্নতি করিবার সংকল্প— নিজের ভিতর হইতেই সঞ্জাত।

নওজওয়ান ভারতসভা আন্দোলন বা যুব-আন্দোলনের সারা দেশ জুড়িয়া কেন্দ্র থাকা উচিত। এই কেন্দ্রগুলিতে, আমাদের ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের টানিয়া লইতে হইবে। যুবক-যুবতী যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মী হইবে তাহাদের শিক্ষার জন্য অবশ্যই ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। এই শিক্ষাকে সর্বতোমুখী এবং আমাদের যুবকদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপযোগী হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠানগুলি ছড়াইয়া না পড়িলে যুব-আন্দোলন কখনোই গড়িয়া উঠিবে না।

যখন এই কর্মীরা শিক্ষিত এবং কর্মক্ষম হইবে, তখন তাহাদের বাহির হইয়া দেশকে সংগঠিত করিতে হইবে। দেশকে সংগঠিত করার জন্য আমি নিম্নরূপ কার্যসূচীর প্রস্তাব রাখিতেছি :

১. সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী অনুযায়ী শ্রমিক কিষাণদের সংগঠন ;
২. কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে যুবক-যুবতীদের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সংগঠন ;
৩. সব রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য ব্যাপক আন্দোলন ;
৪. মহিলাদের মধ্যে সর্বতোমুখী স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা প্রচারের জন্য মহিলা সমিতির সংগঠন ;
৫. দেশে নূতন চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য নূতন সাহিত্যসৃষ্টি ;
৬. যুগের নূতন চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করার জন্য দেশব্যাপী প্রচার।

আমাদের যুবকর্মীরা যথাযথ শিক্ষিত হইবার এবং নূতন চিন্তা পুরা আত্মীকরণের পর আমাদের সমাজের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে জাগাইয়া তোলা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের আজ পর্যন্ত পশ্চাৎপদ শ্রেণীদের জীবনে ও কর্মে উদ্দীপ্ত করা তাহাদের কর্তব্যকর্ম হইবে। আমি নিঃসন্দেহ যে এই নববাণী —এই সাম্যের ও সর্বতোমুখী স্বাধীনতার বাণী— জীবনের নিশ্বাস হিসাবে কাজ করিবে এবং সমগ্র জাতিকে উৎসাহিত করিবে। এবং আমাদের দেশের মতো বিরাট দেশে যে-মুহূর্তে জনগণের মধ্যে স্বাধীন হইবার বাসনা জাগিবে, অমনি দ্রুত তাহারা বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিবে।

বন্ধুগণ, আমি আপনাদের মহামূল্য সময়ের বহুলাংশ নষ্ট করিয়াছি এবং আমি মনে করি যে আমি যথেষ্টই আমার বক্তব্য বলিয়াছি। আপনারা আমাকে আপনাদের নিকট আসিবার এবং ভাব-বিনিময় করিবার যে সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন তাহার জন্য আমি পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি গভীর ও নিবিড়ভাবে আশা করি যে ফিরিয়া যাইবার সময় আমরা নূতন উৎসাহ ও নূতন সংকল্প লইয়া ফিরিয়া যাইব। তাহা হইলেই আমরা আন্তরিকতা ও অবিচল সাহসের সহিত আমাদের কর্তব্য করিতে পারি। এক স্বাধীন ভারতের— সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত ভারতের স্বপ্ন যেন আমাদের যুবকদের আত্মাকে আচ্ছন্ন করে এবং তাহাদের মাতাইয়া তোলে। ভারতের সম্মুখে বিশাল কর্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে— তাহার নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার পর মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। ভারত আজ সারা

পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের মূলকেন্দ্র। ভারতের স্বাধীনতা সে কারণে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্বরূপ। এ কারণে, ভারতকে রক্ষা করিতেই হইবে।

এবং ইহা ছাড়াও, তাহাকে বাঁচাইতে হইবে কারণ পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি ভারতের অবদান ব্যতিরেকে পৃথিবী নিতান্তই দরিদ্র। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সমালোচনা ও ভুল-বোঝাবুঝি হইবার বিপদ সত্ত্বেও আমি সর্বদাই এ কথা বলিয়াছি ও এই মত পোষণ করিয়াছি যে পৃথিবীকে ভারতের নূতন কিছু বা মৌলিক কিছু দিবার আছে এবং সারা পৃথিবীই সেই দানগ্রহণে ব্যগ্র। ভারতবর্ষ পৃথিবীকে সম্ভবত যে শেষ অবদান দিবে তাহা হইল একটি নূতন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং এমন এক রাষ্ট্র যাহা সমগ্র মনুষ্যজাতিকেই শিক্ষা দিবে। বন্ধুগণ, আসুন আমরা জাগিয়া উঠি এবং ভারতকে মুক্ত করিবার সংকল্প গ্রহণ করি— এই বিশ্বাসে আস্থা রাখি যে মুক্ত ভারতের অর্থ হইল মনুষ্যজাতির সংরক্ষণ। 'বন্দে মাতরম্'।

২৩ মে ১৯৩১

আবেদন

১ জুন ১৯৩১ কলিকাতা হইতে প্রচারিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি ও তাহার সমর্থকদের প্রতি নিন্দা ও অপবাদের অভিযান সত্ত্বেও সারা বাংলার কংগ্রেসীরা যেরূপ ভঙ্গিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ছত্রচ্ছায়ায় একত্রিত হইয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আজ পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বঙ্গদেশে ৩২টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাত্র ৬টি জেলায় জেলা-কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি রিটার্নিং অফিসারদের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের নিকট এরূপ সংবাদও আসিয়াছে যে এই ৬টি জেলায় জেলা-কংগ্রেস সমিতির আচরণে যথেষ্ট পরিমাণে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে এবং জেলা-কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বিদ্রোহ সত্ত্বেও ভোটের সময় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা করা যাইতেছে।

কয়েকটি জেলায়, যেমন যশোহরে, মহকুমা ও শাখা-কংগ্রেস সমিতিগুলি জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা আরো দেখা যায় যে উল্লিখিত ৬টি জেলায়, যেমন ঢাকায়, জেলা-কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সমর্থকরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতেছেন এবং নমিনেশন পত্রও দাখিল করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিদ্রোহের পর তাঁহারা হঠাৎ তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়াছেন।

ইতিমধ্যেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যাহাতে উক্ত ৬টি জেলায় নির্বাচনকর্ম সমাধা হয় তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা আরো অর্থবহ এবং লক্ষণীয় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কর্তৃক বিদ্রোহের বৈজয়ন্তী উত্তোলনের মুহূর্তে পর্যন্ত বাংলার ৩২টি জেলার সব কয়টিই প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ মানিয়া চলিতেছিল।

সারা বাংলার কংগ্রেসীদের ও জনসাধারণের প্রতি আমার আবেদন তাহারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে যে গালমন্দ করা হইতেছে তাহা সত্ত্বেও মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখেন। আমি প্রত্যেককেই নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ঋষিসুলভ প্রশান্তি লইয়া তাহার কাজ করিয়া যাইবে এবং প্রদেশের যে-কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পর্কিত কোনো নিয়মভঙ্গের দৃষ্টান্ত ইহার গোচরে আনিলে তাহার বোঝাপড়া করিবে এবং দেখিবে যাহাতে কোথাও কোনোরূপ অভি-যোগের কারণ না ঘটে।

গালমন্দের যে অভিযান চলিয়াছে সে-সম্পর্কে সকলের নিকট আমার নির্দেশ উপদেশ হইল উহা উপেক্ষা করুন যাহাতে ঐরূপ অভিযানে যাহারা ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহারা ঐরূপ করিতে করিতে এক সময় ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

জনসাধারণ আমাদের অতীত কর্ম ও ত্যাগের খতিয়ান দেখিয়া আমাদের বিচার করিবে। আমাদের বিবেক পরিষ্কার এবং আমরা জানি যে স্বার্থান্বেষী দলগুলি যে-গোলমাল করিতেছে তাহা সত্ত্বেও; দেশের হৃদয় সুস্থ এবং দেশ আমাদেরই পক্ষে।

বিশ্বরাজনীতি : ভারতের ভূমিকা

৮ জুন ১৯৩১ বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ।

জাতীয় সংগ্রামে বোম্বাইয়ের উজ্জ্বল অবদান রহিয়াছে। আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি, সুতরাং আমাদের প্রকাশ্য ভাষণে প্রতিটি কথা ওজন করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের একটি গ্রন্থের একটি বাক্য মনে পড়িতেছে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের ভাষায় ভারতবর্ষ তাহার স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প— সম্ভব হইলে ইংলন্ডের সহায়তায় এবং প্রয়োজন হইলে ইংরাজের সহায়তা ছাড়াই। যখন ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবার কোনো চিন্তাই মনে উদিত হয় নাই, ম্যাকডোনাল্ডের সেই সময়কার এই সম্ভাবনাময় উক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভে বদ্ধপরিকর— সম্ভব হইলে ব্রিটেনের সহায়তায় এবং যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই ইংলন্ডের সাহায্য ছাড়াই।

ভারতবর্ষ বিশ্বের চিন্তাকে দখল করিয়া লইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে। বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকে, ইহা সুনিশ্চিত করিবার দায়িত্ব তাহাদের নহে। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ইহা ইতিহাসের যৌক্তিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। সমগ্র বিশ্বে পরাধীন জাতিগুলির মুক্তির জন্য সংগ্রাম চলিতেছে তাহা সকলেরই জানা আছে। বর্তমানে ভারতবর্ষই সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবামাত্র সেই চাবিকাঠি ধুলায় মিলাইয়া যাইবে ; ভারতবর্ষের স্বাধীনতা শৃঙ্খলবদ্ধ মানবিকতার মুক্তি ঘোষণা করিবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের সহিত পৃথিবীর পরাধীন অংশের অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। স্বাধীন ভারত সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো চুরমার করিয়া দিবে। সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জাতি-সংঘ গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

আমাদের ভবিতব্যের পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। অহিংস অসহযোগ কেবলমাত্র কতকগুলি শুষ্ক নীতি নয় বটে কিন্তু এই প্রথম ব্যাপক জাতীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষ এই নীতির

পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করিয়াছে। সেই পরীক্ষার সাফল্যের উপর ইতিহাসের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সহানুভূতি জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছে। বর্তমানে স্বাধীনতার দুর্ধর্ষ সংগ্রামে ভারতবর্ষ নিয়োজিত রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ছাড়া এই সংগ্রাম পরিচালনা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আসলে কী চাই? অন্যান্য দেশের জনসাধারণ যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করে, আমরাও তাহা চাই। আমাদের আদর্শের জয় হইবেই, কারণ ন্যায়বিচার এবং যৌক্তিকতার উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য যোগ্য হইয়া ওঠে নাই এবং সেই কারণে তাহারা পদে পদে ভুল করিবে— ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইংলন্ড ইহা একটি বড়ো যুক্তি হিসাবে খাড়া করিয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় এই যুক্তির উত্তরে বলিব: ভারতবর্ষ ভুল করিবার অধিকার দাবি করিতেছে। ইংলন্ড চায় আমরা জল স্পর্শ না করিয়া সাঁতার কাটিতে শিখি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অধিকারের বিরুদ্ধে ইংলন্ড একটি যুক্তিও দিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রয়োজন ত্যাগ ও নিপীড়ন-বরণ। যে মুহূর্তে ভারতবর্ষ ত্যাগের ও নিপীড়ন-বরণের মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিবে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিবে।

স্বাধীনতা লাভের সংকল্পকে অদম্য করিয়া তুলিতে হইবে। যদি স্বাধীন হইবার সংকল্প দৃঢ়মূল হইয়া ওঠে তবে যে-সাম্রাজ্য একদিনে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এক রাত্রিতেই তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

সন্ধি-চুক্তির তাৎপর্য এই যে যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই। ইহা অতি পরিষ্কার যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার শেষে ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না। সেই সময় আরো উদ্যমের সহিত স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা আমাদের অবশ্যকর্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে।

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

৯ জুন ১৯৩১ বোম্বাইয়ে বাংলার বিরোধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবকে স্বাগত জ্ঞাপক বিবৃতি।

বাংলার বিরোধ একজন সালিশের নিকট প্রেরণের এবং তাহার মীমাংসাই চূড়ান্ত রূপে গ্রহণের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত খুবই সংগত হইয়াছে। পরিস্থিতির বিচারের পর সালিশ ভিন্নতর নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বি. পি. সি. সি.র নির্বাচন পরিচালনা অব্যাহত রাখিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ইতিমধ্যে অধিক-সংখ্যক জেলাতেই সম্ভবত নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। মাত্র ছয়টি জেলায় এখনো নির্বাচন বাকী। নির্বাচন সম্পন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি। নির্বাচন সম্পর্কে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে সালিশ শ্রীযুক্ত অ্যানের নিকট তাহা উপস্থিত করিবার পূর্ণ সুযোগ তাঁহারা পাইবেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই অভিযোগগুলি অনুসন্ধান করিয়া ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন। ওয়ার্কিং কমিটি এ-বিষয়ে দায়িত্বভাগ গ্রহণ করায় আমরা সানন্দচিত্তে সালিশের হাতে তাহা তুলিয়া দিয়াছি।

ওয়ার্কিং কমিটি এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে অতঃপর সংবাদপত্রে কিম্বা বক্তৃতামঞ্চে পারস্পরিক আক্রমণ যেন বন্ধ হয়। দারুণ প্ররোচনা সত্ত্বেও গত এক পক্ষকাল আমাদের পার্টির প্রশংসনীয় সংযত আচরণের জন্য আমি গর্ব বোধ করিতেছি। আমাদের পক্ষে এখন আরো সংযম দেখাইতে হইবে। আমাদের বক্তব্যের ভিত্ এত মজবুত যে অপরপক্ষকে আক্রমণ কিম্বা তাহাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের কোনো প্রয়োজনই নাই। এই ধরনের কৌশল বরং আমাদের সহায়ক না হইয়া ক্ষতিসাধন করিবে। সালিশের কাজের অনুকূল বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশ বাংলায় রচনা করিবার জন্য আসুন আমরা সর্বতো-ভাবে সচেষ্ট হই। ইহা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিলে, সালিশের কাজ সহজতর হইবে এবং সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিকূল বিঘ্নগুলি দূর হইবে।

তিক্ততা দূর করিতে হইবে

বর্তমান তিক্ত পরিবেশ আরো দীর্ঘসময় চলিতে দেওয়া অনুচিত। যদি আমরা দেশকে ভালোবাসি যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় কাজের দায়িত্বে মনঃ-

সংযোগ করিতে হইবে। যদি বাংলাদেশে অদ্য হইতেই বন্ধুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা সম্ভব হইবে। সালিশের সিদ্ধান্ত যাহাই হোক-না-কেন তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলাদেশকে সেই সিদ্ধান্ত আনুগত্যের সহিত মানিয়া লইতে হইবে। সেই পথেই তিক্ত অতীতের উপর ছেদ টানিয়া দিয়া বাংলাদেশে আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারিব।

গুরুতর অভিযোগসমূহ

গোড়া হইতেই আমরা একাধিক কারণে এই সালিশী ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধের, ঘুষের, দুর্নীতি, জালিয়াতি, দালালি ইত্যাদির অভিযোগ আনা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে দীর্ঘকাল জনসাধারণের সেবা করিয়া, বর্তমানে জনমতের আদালতের এইরূপ ঘৃণ্য অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইবে। এ-যাবৎ আমরা পরমসহিষ্ণুতা সহকারে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমরা এখন ন্যায়-বিচার দাবি করিতেছি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সেবায় আমরা অবশ্যই কিছু ত্যাগ, কিছু নিপীড়ন বরণ করিয়া লইয়াছি কিন্তু আমাদের অগণিত সহকর্মীদের তুলনায়— যাহারা শত শত সংখ্যায় আজ বন্দীশালায় আবদ্ধ রহিয়াছেন— আমার ত্যাগ ও নিপীড়ন ম্লান হইয়া যায়। অতীতে যদি ভারতের মুক্তির জন্য কিছু করিয়া থাকি, ভবিষ্যতে আরো করিবার আশা রাখি কারণ যৌবনকাল হইতেই দেশের সেবার জন্য আমরা নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছি। সুতরাং ইহা কি ন্যায্য, ইহা কি সুবিচার, ইহা কি ঠিক যে আমাদের জীবনে জনসেবার এই পর্যায়ে আমাদের বিরুদ্ধে ঘুষের, দুর্নীতির, জালিয়াতি, দালালি ইত্যাদির অভিযোগের কৈফিয়ত দিতে হইবে? আমাদের প্রীতিভাজন দেশবাসীগণ— যাহাদের সেবক আমরা এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিব—এই ঘৃণ্য অভিযোগের হাত হইতে কি আমাদের রক্ষা করিবেন না? কংগ্রেস-কর্মীর পক্ষে কোনো আদালতে প্রতিকারের আশা বৃথা। সুতরাং আমি দেশবাসীর হৃদয়ের নিকট আবেদন করিয়া তাহাদের প্রীতিসিক্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিব।

দেশবাসীর নিকট আবেদন

আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে বলিয়াছি যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত আমাদের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের যেন প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়া জনসেবার কাজে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হয়। অপরপক্ষে, তিনি এই অভিযোগসমূহ সপ্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে আমরা ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণ আশ্রয় ও সমর্থন দাবি করিব। অতীতে আমরা সাধ্যমতো জনসেবা করিয়া আসিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহাই অব্যাহত রাখিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। আমাদের দেশবাসীই বলিবেন তাঁহারা আমাদের সেবা চান কি না। যদি তাঁহারা চান, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহার উপযুক্ত এবং কার্যকর জবাব দিয়া আমাদের প্রতি প্রীতি ও আস্থা ব্যক্ত করিতে হইবে।

যুব লীগ ও কংগ্রেস

১৭ জুন ১৯৩১ বোম্বাই ইয়ুথ লীগের উদ্যোগে ঘাটকোপারে এফ. এম. কাবালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ।

কোনো কোনো যুব লীগ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে। কংগ্রেসের মতন বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে সেখানে অপর কোনো সংগঠনের কী প্রয়োজন— অনেকে এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে আমি বলিব ইয়ুথ লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। নদী যেমন শাখা-নদীসমূহ দ্বারা স্ফীত হয়, তেমনি যুব, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিকদের নিজস্ব সমস্যা লইয়া ছোটো ছোটো সংগঠন কংগ্রেসের অংশরূপে গড়িয়া ওঠে। যুব-শক্তিই জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর। ইয়ুথ লীগের উদ্দেশ্য তাহাদের প্রকৃত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা। স্বাধীনতালাভই জাতির মূল সংকল্প, ইহা করায়ত্ত হইলেই আমাদের প্রত্যেকটি জটিল সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে পারি।

প্রতিটি ভারতীয়ের কংগ্রেসে যোগদানের এবং ইহার কাজে অংশগ্রহণের অধিকার রহিয়াছে। যদি সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের নরনারীদের কংগ্রেসে টানিয়া না আনা যায় কংগ্রেস এক বৃহৎ সংগঠনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে

পারিবে না। ভারতের স্বাধীনতার প্রয়াসে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন সংগঠনগুলি মূল সংগঠন কংগ্রেসেরই সেবায় নিয়োজিত হইবে।

যুবশক্তির শরীর ও মন সুগঠিত করিতে হইবে। অপরপক্ষে কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইলেই চলিবে না। যুবশক্তিকে গ্রামে পাঠাইয়া সেবামূলক কাজের এবং পিকেটিং ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচীর আয়োজন রাখিতে হইবে, কারণ একই ধরনের কর্মসূচী সকলের নিকট আকর্ষণীয় না-ও হইতে পারে। পি. এম. কাবালীর নাম এই সূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বিমান-পরিচালনার মতো কঠিন কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দেশের জন্য প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করিয়াছেন।

স্বরাজের পথে অভিযান

ইয়ুথ লীগ কেবলমাত্র একটি রাজনৈতিক সংগঠনই, আরো অনেক সেবামূলক বিভাগও ইহার সহিত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া তাহারা জাতীয় মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। বৈদেশিক শাসকদের সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাহারা সাফল্যের শীর্ষপর্যায়ে তাহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জাতীয় সরকার থাকিলে আরো কত সাফল্যই না তারা অর্জন করিত। স্বরাজের অভিযাত্রায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন নিঃসন্দেহে জাতির সর্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষা। কারণ ইহা অর্জনের পরই মাত্র তাহাদের সম্মুখে প্রতিটি জটিল সমস্যার সমাধানে তাহারা উদ্যোগী হইতে পারে।

ভারতের মিশন

সার্বিক উন্নয়নের জন্য যুবশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে, তবেই না অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হইবে। শাসক শ্রেণীর চাইতে কোনো অংশেই তাহারা নূতন নহে বরং কোনো কোনো বিষয়ে তাহারাই শ্রেষ্ঠতর। ফ্রান্স ও জার্মানীতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও, সেখানকার জনসাধারণ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সার্থক হয় নাই। এই কারণেই সেখানে সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, বেসরকারী উদ্যোগ সফল হইয়াছে ; তাহার কারণ গভর্নমেন্ট বড়ো-জোর উৎসাহ ও অর্থ জোগাইতে পারে।

নূতন দায়িত্ববোধ যুবশক্তিকে সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধ দান করিবে। ইয়ুথ লীগ আন্দোলনের গোড়াকার লক্ষ্য ও আদর্শ প্রসারিত রহিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস ও ইয়ুথ লীগের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকিতে পারে না। আর এই বিরোধ কোথাও থাকিলে তাহা অজ্ঞানতাপ্রসূত। যত শীঘ্র তাহাদের এ-সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলা যাইবে ততই তাহাদের ও দেশের পক্ষে তাহা মংগলজনক। ভারতবর্ষের একটা মিশন উদ্‌যাপন করিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিয়া সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইবে। অনতিভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সেই স্তরে উন্নীত না হইলে বিশ্ব সেই পরিমাণে রিক্ত হইয়া থাকিবে।

নিয়মানুবর্তিতা : প্রথম ও শেষ কথা

১৯ জুন ১৯৩৯ বাংলার বিরোধ সম্পর্কে কলিকাতায় সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার।

ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার বিরোধ মীমাংসার জন্য শ্রী এম. এস. অ্যানে-কে একমাত্র সালিশ নিয়োগ করিয়াছেন। বর্তমান বি. পি. সি. সি.-র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষীয়রা বক্তৃতামঞ্চেও এবং সংবাদপত্রে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন ঘুষগ্রহণ জুয়াচুরি দুর্নীতি এবং দালালি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। যদি অভিযোগসমূহের মধ্যে জেলা হইতে বি. পি. সি. সি.-র নির্বাচনে নিয়ম-কানুন ভংগের উল্লেখ থাকিত, পরিস্থিতি এত গুরুতর হইত না। এই ধরনের নিয়মকানুন ভংগের নজীর পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে ঘটিতে পারে এবং তাহা নৈতিক অধঃপতনরূপে চিহ্নিত হইবার আদৌ কোনো কারণ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় বি. পি. সি. সি. নিয়মকানুন ভংগের তদন্ত ও মীমাংসা করিত এবং অভিযোগকারীদের ওয়ার্কিং কমিটিতে আপীল করিবার অধিকার থাকিত। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বি. পি. সি. সি.-র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ গুরুতর নৈতিক স্খলনের সমপর্যায়ের। আমি সমবেতভাবে ওয়ার্কিং কমিটিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মা গান্ধী এবং বল্লভভাই প্যাটেলকে বলিয়াছি যে আমি অভিযোগসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তকে স্বাগত জানাইব এবং তাহা প্রমাণিত হইলে আমাদের যেন প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়া জনসেবার কাজে

অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা হয়। অপরপক্ষে বিরোধীরা অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেপরোয়া ও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলেও প্রতিকারের কোনো পথ তাহাদের নিকট উন্মুক্ত নাই। সুতরাং কংগ্রেসেরই উচ্চতর কর্তৃপক্ষেরই উচিত কংগ্রেসকর্মীদের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ানো।

নিয়মানুবর্তিতা : প্রথম ও শেষ কথা

আমি আশা করি বর্তমান অনুসন্ধানের ফলে বাংলার বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। যতদিন কংগ্রেসে থাকিব, শেষ পর্যন্ত নিয়মানুবর্তিতা এবং সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব। বাংলাদেশের মধ্যে যদি নিয়মানুবর্তিতা ফিরাইয়া না আনা যায় বাংলাদেশে জনজীবন-পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং বিগত দশ বছরের কাজ একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গত আঠারো মাস আমরা নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে শীঘ্রই সময় আসিবে যখন বাংলা-কংগ্রেসে সংহতি রক্ষার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা জনসাধারণ প্রশংসা করিবে। যে-কোনো দিন বি. পি. সি. সি.-র পরিচালনায় পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারাই পরিচালনার ভার গ্রহণ করুন-না-কেন, কংগ্রেসীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও সংহতি রক্ষার সমস্যার সম্মুখীন তাহাদের হইতেই হইবে।

বাংলার বিশেষ দুর্ভাগ্য

বিগত দশ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে বাংলা এমনই একটি প্রদেশ যেখানে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধী অপর একটি দল থাকিবেই এবং এই বিরোধীদল যাহাতে ধ্বংসকারী ও সংহতিনাশক না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বিগত আঠারো মাসের মধ্যে বিরোধীরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব লইয়া কংগ্রেস কর্মসূচী কার্যকরী করিবার জন্য সংখ্যাগুরু দলের সহিত সর্বদা সহযোগিতা করেন নাই।

অতীতে যাহাই ঘটিয়া থাকুক-না-কেন, আমি খুবই আশা রাখি যে

বর্তমান সালিশের সিদ্ধান্ত বাংলার সকল কংগ্রেসকর্মীই নিয়মানুবর্তিতার সহিত গ্রহণ করিতে এবং ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সালিশ যেভাবে অমান্য করা হইয়াছিল সেভাবে বর্তমান সালিশের সিদ্ধান্ত অমান্য করা হইবে না। আমি আরো বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশে বিভিন্ন দল (পার্টি) থাকিলেও ভবিষ্যতে তাহারা পরস্পর সহযোগিতা করিয়া চলিবে। বাংলাই একমাত্র প্রদেশ নয়, যেখানে বিরোধ রহিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও তিক্ত বিরোধ রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদেরই একমাত্র প্রদেশ যেখানকার বিরোধীরা সামান্যমাত্র অছিলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ডিঙাইয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া এবং সরাসরি ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আবেদন করেন। আমাদের প্রদেশে আরো এক ধাপ আগাইয়া বিরোধীরা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত অসহযোগিতা এবং খোলাখুলি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

যদি আমরা জয়ী হই

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বিরোধীরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের অবিলম্বে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং এমন-কি কংগ্রেস হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করিতেও বা হইতে পারে। তাহা যতই বেদনাদায়ক হোক-না-কেন, আমাদের গ্রহণীয় আর-কোনো পথ থাকিবে না। ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে দেশসেবার জন্য সব-কিছু ত্যাগ করিয়া এইপ্রকার অপরাধে অভিযুক্ত হইব। কিন্তু আমার সন্দেহ নাই যে এই পরীক্ষা হইতে আমাদের অক্ষুণ্ণ সম্মান এবং নিষ্কলংক চরিত্র লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিব। যদি জয়ী হইয়া আসিতে পারি, আমরা আশা করি সমগ্র দেশ বিরোধের অবসান ঘটাইয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চতুষ্পার্শে একত্রিত হইবে, যাহা প্রদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্রায় দুই বছর জনসাধারণের সেবার যে সুযোগ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, অতঃপর নিরবচ্ছিন্নভাবে সে সেবার সুযোগ আমরা পাইব।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

১৯ জুন ১৯৩১ দেশবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বারাণসী দশাশ্বমেধঘাটে ভাষণ।

দেশবন্ধু স্বাধীনতার জন্য আকুল ছিলেন, তাহা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে, তিনি চাহিয়াছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে সর্বাংগীণ মুক্তি। তিনি অতীত ভারত হইতে অধিকতর গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যে সময় জাতিপুঞ্জের সারিতে ভারতবর্ষ যোগ্য আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্বের সম্মুখে নানাবিধ সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হইবে।

ভারতের বাণী

তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানবমুক্তির কাজে ভারতবর্ষের সুস্পষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে এবং মানবতার প্রয়োজনেই ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইবে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সর্বাংগীণ মুক্তির এবং সর্বজনীন সমানাধিকার ও প্রেমের বাণী প্রচার করিবার পূর্বে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। এই কারণেই দেশবন্ধু মৃত্যুহীন সংকল্প এবং দুর্বার প্রেরণা লইয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার ঘোরতর শত্রুদেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।

বর্তমান যুগের সকল প্রকার আন্দোলনের প্রবাহ— যথা, নারী, যুব এবং শ্রমিক-আন্দোলন— তাঁহার প্রেরণাধন্য হইয়াছে। বর্তমান সংকটে দেশবন্ধুর মতো বিরাট পুরুষের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল।

মৌলিক ঐক্য

যাহারা ভারতবর্ষের জাতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা এবং সামাজিক প্রথার বৈচিত্র্যে বিভ্রান্তির অজুহাতে স্বরাজলাভের অনুপযোগিতা প্রচারে ব্যস্ত তাহাদের জানা উচিত ভারতীয় সভ্যতার একটি মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে, যাহা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অখণ্ড এবং অবিভক্ত সত্তা একই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া এক সংহত চেতনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

দেশবন্ধুর জীবন সমন্বয়ের কাব্যস্বরূপ। এই মহৎ জীবন খণ্ড খণ্ড গণ্ডীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতেও

ইহার বিচার অচল। দেশবন্ধু ভারতীয় সাধনার মৌলিক ঐক্য উপলব্ধি করিয়া, তাহার মর্মবাণীর মূর্ত প্রকাশরূপে বিরাজমান ছিলেন।

শ্রমিকদের প্রতি ঐক্যের আহ্বান

২২ জুন ১৯৩১ বজবজে জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

তেলকলের মালিকদের শ্রমিকদের সহিত ভালো সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। শ্রমিক-ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করিলেও দেশে ব্যবসায়ে মন্দার জন্য বর্তমানে শ্রমিকদের সকলপ্রকার দাবির মীমাংসা সম্ভব নয়। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং সময় আসিবে যখন শ্রমিকদের অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হইবে। শ্রমিক-ঐক্যের জন্য ইউরোপে শ্রমিকরা তাহাদের দাবি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরকম সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

দরিদ্রদের ঐক্যবদ্ধ হইতেই হইবে কারণ ঐক্যই তাহাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। একবার ঐক্যবদ্ধ হইলে দরিদ্র জনসাধারণকে আর কেহ দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

নিপীড়নের পথ

নির্যাতনভোগের মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পেঁছাইব। নিপীড়নে ভয় পাইলে চলিবে না, এই পথেই আমাদের দেশের মুক্তির জন্য আমরা সচেষ্ট হইব। আমাদের দেশের উন্নতি চাই, আমাদের অধিকারের প্রতিষ্ঠা চাই। ভালো হউক মন্দ হউক ভারতবর্ষ ভারতীয়দের দ্বারাই শাসিত হইবে। বর্তমানে যাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে।

কেহ কোনো ভুল করিলেই, তাহার প্রতিশোধ লওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। দেশের মুক্তির জন্য একমাত্র 'অহিংস' উপায়ই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থই সব-কিছু নহে, ঐক্য অর্থ হইতেও শক্তিশালী। জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার উপর বিশ্বাস রাখিলে, তিনিই প্রসন্ন দৃষ্টি রাখিবেন। বিধাতা দরিদ্রের বন্ধু।

শ্রমিক আন্দোলন

১

৪ জুলাই ১৯৩১ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানাইয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন সেজন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি এই মহৎ সম্মানের উপযুক্ত হইবার মতো কোনো কাজ করি নাই তাহা আমি জানি। সুতরাং আমার এই নির্বাচনকে আমি ইতিপূর্বে প্রদত্ত সেবার পুরস্কার রূপে গণ্য করি না কিন্তু আমি ইহাকে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মনীতির স্বার্থে মহত্তর ও পূর্ণতর সেবাকার্যে উৎসাহ ও প্রেরণাদান বলিয়া মনে করি।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হইয়াছিল ১৯২৯ সালের নভেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত শেষ অধিবেশনে। এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০ সালে কিন্তু কয়েকটি অপরিহার্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার পূর্বে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভাপতি রূপে একটি পুরা বৎসর আমার কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু ইহার অধিকাংশ সময় আমি ছিলাম কারাগারে। ফলে কংগ্রেসের নাগপুর-অধিবেশনের পর আমি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গঠনমূলক কাজের কোনো নিদর্শন দেখাইতে পারি কিনা সন্দেহের বিষয়। আমাদের বহু কর্মীর ভাগ্যও ছিল একই প্রকারের।

গত বৎসর এবং এ বৎসরের প্রথম অংশে দেশ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দুর্লভ একটা বিরাট সংকটের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছিলাম। এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়নের উন্নয়নে স্বাভাবিক অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। সুতরাং আমাদের এক বৎসরের কাজের বিবরণ প্রদানে আমাদের উচিত এই গুরুতর বাধার কথা স্মরণ রাখা।

শ্রমিক ও জাতীয় সংগ্রাম

বিগত সংগ্রামে ভারতীয় শ্রমিকগণ কী অংশ লইয়াছিলেন সে প্রশ্ন কখনো

কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়। এই প্রশ্নের জবাবে প্রতিবাদের কোনো ভয় না রাখিয়া আমি বলিতে পারি যে সারা দেশে ভারতের শ্রমিকগণ এই সংগ্রামে একটা বড়ো অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যদি আরো বেশি কিছু না করিয়া থাকিতে পারেন এবং তাঁহারা যদি অনেক সময় সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে কাজ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা তাঁহাদের ইচ্ছার অভাবে নয়—তাহা ঘটিয়াছে তাঁহাদের নিজেদের সংগঠনের অভাবে। আমি জানি যে শ্রমিকদের একাংশের মনে এই অনুভূতি ছিল যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কিংবা মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সহিত তাঁহাদের কোনো সংস্রব থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে অনুভূতি সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র একাংশের মধ্যে এবং ইহা নিশ্চয়ই সারা দেশে প্রভাব বিস্তার করে নাই। আমি বরং বলিব যে বিগত আন্দোলনে যে সাফল্য অর্জিত হইয়াছিল তাহা শ্রমিকদের বিশেষ অবদান ব্যতীত আদৌ সম্ভব হইত না। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের মীরাটের সাথীগণ এবং ভারতের অন্যান্য অংশের সহকর্মীগণ ছাড়াও ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রেলওয়ে ইউনিয়নের শান্তিরাম মণ্ডল এবং চটকল মজদুর ইউনিয়নের নৃপেন চৌধুরীর মতো আরো অনেক সহকর্মী এখনো কারাগারে পচিতেছেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর হইতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট হইয়াছে—যথা জি. আই. পি. রেলওয়ে ধর্মঘট এবং কলিকাতায় গোরুর গাড়ির চালকদের ধর্মঘট। আপনারা এই দুইটি ধর্মঘটের পরিণতির কথা জানেন এবং আমি তাহা উল্লেখ করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। এই পর্যায়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জি. আই. পি. রেলওয়ে কর্মীরা যে বিপদ প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা এখন সংশ্লিষ্ট ভারতীয় রেলওয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ব্যাপক পদ্ধতিতে সর্বভারতীয় রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশনকে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

ভাঙন

গত আঠারো মাসে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিতে ও ব্যাপকতা বাড়িয়াছে এ দাবি আমরা করিতে পারি কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি বরং বলিতে চাই যে এই সময়ে এ আন্দোলন ব্যাহত হইয়াছে। এই ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য অনেক কারণ দায়ী; তবে আমার সামান্য মতানুসারে

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি কারণ হইল প্রথমত নাগপুর অধিবেশনে যে ভাঙন ধরিয়াছিল তাহা এবং দ্বিতীয়ত আইন-অমান্য আন্দোলন-সৃষ্ট গতিপথ পরিবর্তন। আমাদের কিছু সংখ্যক সাথী ভাবিতে পারেন যে ভাঙন আমাদের দুর্বল করে নাই কিন্তু আমি ইহার সহিত একমত হইতে পারি না, কেননা আমার মনে এ-বিষয়ে সংশয় নাই যে অন্তত সাময়িকভাবে আমরা ভাঙনের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহাদের একজন যাঁহারা আন্তরিকভাবে ভাঙনের জন্য দুঃখিত এবং আমাদের পক্ষে যদি ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয় তাহা হইলে আমি আন্তরিকভাবে তাহাকে স্বাগত জানাইব। আর দ্বিতীয় কারণটি সম্বন্ধে বলিতে পারি যে আমার ধারণায় আইন-অমান্য আন্দোলনের আকর্ষণ উচ্চতর ধরনের হওয়ায় সমগ্র দেশের মনোযোগ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। ভিন্ন অবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিত এবং ইহার ফলে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিত কিন্তু এ ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি বাধা পাইয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কর্তৃক সময় সময় ঐক্য গড়িয়া তোলার প্রয়াস করা হইয়াছে। সুতরাং প্রধান কোনো কোনো সমস্যা লইয়া আমরা বিবাদ করিয়াছি এবং এই পর্যায়ে কিভাবে ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে সেগুলি আমি স্পষ্ট করিয়া বলা বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রধান সমস্যাগুলি হইল—

১. বৈদেশিক সংস্থাভুক্তির প্রশ্ন।
২. জেনেভায় প্রতিনিধিত্ব।
৩. ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির বাধ্যতামূলক চরিত্র।

বৈদেশিক সংস্থাভুক্তি

প্রথম সমস্যাটি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, আমাদের এখনো বৈদেশিক সংস্থাভুক্তির প্রয়োজন নাই। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিজের দায়িত্ব নিজেই বহন করুক— এই অবস্থা চলিতে পারে। প্রত্যেকের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে, এমন-কি পৃথিবীর যে-কোনো অংশ হইতে সাহায্য আসিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু আমস্টারডাম কিংবা মস্কোর নির্দেশের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। ভারতকে

তাহার নিজ প্রয়োজন এবং পরিবেশ অনুযায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং যাহা তাহার বিশেষ স্বার্থেরও পোষকতা করিবে।

জেনেভা

জেনেভায় প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আমার আশংকা এই যে উভয় পক্ষই ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আমাদের পক্ষে এ-বিষয়ে সর্বোত্তম পন্থা হইবে খোলা মন রাখা এবং প্রতি বৎসর এ প্রশ্নে একটা সিদ্ধান্তে আসা। আমরা জেনেভায় প্রতিনিধি পাঠাইব কিনা চিরদিনের মতো পূর্ব হইতে সে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখার দরকার নাই। ব্যক্তিগতভাবে আমার জেনেভার উপর কোনো আস্থা নাই। প্রতি বৎসর প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খোলা রাখিলে কোনো কোনো বন্ধু যদি সন্তুষ্ট হন তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রস্তাব

ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাবগুলির বাধ্যতামূলক চরিত্র সম্বন্ধে আমার মত এই যে এ-বিষয়ে আপস চলিতে পারে না। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে ও কাজ চালাইতে হয়, দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সংহতি সম্পাদনের জন্য যদি ইহাকে কাজ করিতে হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের অনুমোদিত সব ইউনিয়নের উপর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিকে বাধ্যতামূলক হইতে হইবে। একটি শিথিল ফেডারেশন রূপে কিংবা সর্বদলীয় সম্মেলনের আকারে ট্রেড ইউনিয়নে কংগ্রেসের অস্তিত্ব হইবে আত্মহননমূলক।

ট্রেড ইউনিয়নের ঐক্যের প্রশ্নে আমার বক্তব্য স্পষ্ট। আমি ঐক্য চাই এইজন্য যে এই পথে আমরা বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী সংগঠন সৃষ্টি করিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি আবার বিবাদ করি এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে এখন জোড়াতালি দেওয়া ঐক্য প্রয়াস করার প্রয়োজন নাই। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জনগণের সম্পত্তি। এই কংগ্রেসে সব ইউনিয়ন যোগ দিতে এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের কার্যালয় যদি কোনো বিশেষ দলের হাতে চলিয়া যায় তাহা হইলে কেহ বৈধভাবে অভিযোগ করিতে পারে না। কাজেই আমি সকল ইউনিয়নকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দিতে এবং ইচ্ছা করিলে কার্যনির্বাহক পরিষদ দখল করিতে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরউইনের মধ্যে যে আপস-রফা হইয়াছে তাহা লইয়া আমাদের কিছু শ্রমিক গভীরভাবে উদ্‌বিগ্ন। আমি এই আপস-রফার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাই না, কেননা তাহা হইবে খানিকটা মরা-কাটা পরীক্ষার সামিল। এই চুক্তি একটি সম্পাদিত বিষয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই পর্যায়ে তাহা আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি। আমরা যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই এবং তাহার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা আমাদের সময় ও শক্তি অধিকতর লাভজনকভাবে ব্যবহার করিতে পারি। গত বৎসর আইন-অমান্য আন্দোলনে সংস্থা হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিশেষ কিছু করিবার ছিল না কিন্তু সামনে যে আন্দোলন আসিবে তাহাতে বৃহত্তর অংশ গ্রহণের পথ খোলা আছে। তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুতি আজ হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

মৌলিক অধিকার

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস করাচী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, যাহা এখন সাধারণ্যে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব বলিয়া পরিচিত। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। এক পক্ষে কেহ কেহ ইহা একেবারে অপ্রতুল ও অসন্তোষজনক বলিয়া ইহার যেমন তীব্র নিন্দা করিয়াছেন তেমনই অন্যেরা আবার ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই দুইটি অভিমতই আমার কাছে একপাক্ষিক বলিয়া মনে হয়। প্রস্তাবটি যতই অসন্তোষজনক হউক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে প্রস্তাবটি পুরাতন ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম। ইহা শ্রমিক ও কৃষকদের কতকগুলি অধিকারের স্বীকৃতি এবং সমাজতন্ত্রের দিকে স্পষ্ট অগ্রগমন সূচিত করে। ইহাতে স্পষ্টভাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে নয়, ইহাতে যাহা অন্তর্নিহিত আছে তাহার মধ্যেই এ প্রস্তাবটির মূল্য। প্রস্তাবের প্রকৃত বিষয়বস্তু অপেক্ষা ইহার সম্ভাবনাই আমার কাছে বেশি আবেদন জানায়। ইহা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক হইয়া উঠিবার পূর্বে প্রস্তাবের বিষয়বস্তুকে আরো সম্প্রসারিত ও উন্নত করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি ইতিমধ্যে এ-বিষয়ে কাজ করিতেছেন— ইহা লক্ষ্য করিয়া আমরা আনন্দিত।

গোল টেবিল বৈঠক

এই দেশের জনগণ এই মুহূর্তে গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান মেজাজ ও মানসিকতার পটভূমিকায় এই বৈঠক হইতে সারবান কিছু উদ্ভূত হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহা ছাড়া, গোল টেবিল বৈঠক যেভাবে সংগঠিত হইয়াছে তাহার ফলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও জনগণের দাবি সম্বন্ধে চাপ সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। বৈঠকের ফল ঘোষিত হইলে জনগণ যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ ব্যবস্থাই তাঁহাদের অবলম্বন করিবার সময় আসিবে। সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে জনগণের উচিত হইবে না সেই মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত নষ্ট করা।

হুইট্‌লি কমিশন

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে হুইট্‌লি কমিশনকে বয়কট করা স্থির হইয়াছিল। সেই কমিশন সবে মাত্র তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। আমাকে যদি যুক্তিবাদীর মতো আচরণ করিতে হয় তাহা হইলে ওই রিপোর্ট পুরাপুরি অবজ্ঞা করাই আমার উচিত। কিন্তু আমি তাহা করিব না। উহা ভালো হউক মন্দ হউক কিংবা ইহার কোনোটাই না হউক, যে চরিত্রের এই দলিল এখন জনগণের সম্মুখে উপস্থিত এবং যেটিকে জনগণ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে ও সমা-লোচনা করিতে বাধ্য হইবেন তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন আমাদের উচিত নয়। আমার প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে একটি বিশেষ কমিশনের রিপোর্টের মূল্য তাহার কাগজে কলমে লিখিত বিষয়ের মধ্যে নয়, শেষ পর্যন্ত ইহা হইতে যাহা উদ্ভূত হইবে তাহার মধ্যে। কমিশনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইবে কিনা— এ প্রশ্ন পথের মানুষও করিবেন। আমরা ভারতীয়রা এই-সব রিপোর্ট এত বেশি দেখিয়াছি যে শুধু রিপোর্ট প্রকাশ করা ছাড়া কোনো কমিশনের নিকট হইতে সুষ্ঠুভাবে ভালো কিছু না পাওয়া পর্যন্ত ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষরূপে সন্দিগ্ধ ও সংশয়াম্বিত হইবার প্রবণতা আমাদের থাকে। আমি এমন কথাও বলিতে পারি যে অতীতে সরকার এই-সব রিপোর্টের ভালো দফাগুলিও কার্যে পরিণত করিতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন কয়েকটি কমিশন পুরাপুরি নিন্দাভাজন হইয়াছে।

বর্তমান রিপোর্ট শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকার্যের সমস্যার উপর বিশেষ জোর দিয়াছে এবং যদিও আমি হুইট্‌লি কমিশন বয়কট করার পক্ষে মত দিয়াছিলাম,

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে এই বিষয়ে সুপারিশগুলি কার্যকর করা হইলে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হইবে। ইহা সত্বেও আমি বলিতে বাধ্য যে কয়েকটি বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সুবিচার করা হয় নাই। আজিকার শ্রমিকগণ কর্মলাভের অধিকার চান। নাগরিকগণের জন্য কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং যেখানে রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, সেখানে তাহার উচিত তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে শ্রমিক-নাগরিককে নিয়োগকারীর খেয়াল-খুশির উপর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না— তাঁহার খুশিমতো তাঁহাদের বেকার হইয়া পথে বসিতে হইবে ও অনাহারে দিন যাপন করিতে হইবে ইহা চলে না। ছাঁটাই-এর খড়্গাঘাতের দরুন দেশের শিল্পজীবন আজ সংকটের সম্মুখীন। আমি নিয়োগকারীদের অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে অনবহিত নই। কখনো কখনো তাঁহাদের পক্ষে পুরাতন কর্মচারীদের বহাল রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে এবং তাঁহারা ছাঁটাই-এর পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেকে সকল দায়িত্বমুক্ত করিতে পারে না। নিয়োগকারীকে ইহা বলিতে হইবে যে তিনি যদি সুদিনে তাঁহার দরিদ্র শ্রমিকদের সহায়তায় সম্পদ সঞ্চয় করিয়া থাকেন তাহা হইলে দুর্দিনে তাঁহাদিগকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। এই ছাঁটাই-এর সমস্যাটির সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে কখনো শিল্পে শান্তি আসিতে পারে না।

বাঁচিবার মতো বেতন

যেমন প্রতিটি শ্রমিক কর্মে নিয়োগের অধিকার দাবি করিতে পারেন তেমনই তিনি বাঁচিবার মতো বেতনের অধিকারও দাবি করিতে পারেন। আজ কি ভারতে কারখানার শ্রমিক বাঁচিবার মতো মজুরি পান? চটকলগুলি ও কাপড়ের কলগুলির দিকে তাকাইয়া দেখুন। ইহারা দরিদ্র ও নির্যাতিত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তাহাদের বিপুল লাভের কোনো অংশ ব্যয় করিয়াছে কি? আমি জানি যে তাহারা বলিবে যে তাহারা সম্প্রতি খারাপ অবস্থায় আছে। কিন্তু ইহা মানিয়া লইয়া আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না তাহারা তাহাদের অস্তিত্বের ইতিহাসে কী পরিমাণ লাভ করিয়াছে, কী পরিমাণ লভ্যাংশ তাহারা ঘোষণা করিয়াছে এবং কী পরিমাণ সংরক্ষিত ধনভাণ্ডার তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে? এই প্রসঙ্গে ভারতীয় রেলওয়ের কথাও আমার

ভোলা উচিত নয়। তাহারা এখন ছাঁটাই-এর খড়্গ প্রয়োগে ব্যস্ত। কিন্তু এখন যাহারা মারাত্মক ছাঁটাই-এর পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের নিশ্চয়ই কিছু কর্তব্য আছে সেই-সব মানুষের প্রতি যাহারা অতীতে তাহাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত করিতে ও সংরক্ষিত ভাণ্ডারের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। আমরা আমাদের চা-করদের বিষয়ও উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা কী পরিমাণ লাভ করিয়াছেন এবং নিজেদের শ্রমিকদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন? ইহা কি সত্য নয় যে অন্তত কতকগুলি এলাকায় এখনো দরিদ্র শ্রমিকরা অমানুষিক অবস্থার শিকার? শ্রমকমিশন তাহা হইলে ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য বাঁচিবার মতো মজুরি ও ভদ্র ব্যবহার পাইবার সুপারিশ করিয়াছেন কেন? তাহারা চটকলে ও বস্ত্রশিল্পে সর্বনিম্ন মজুরির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বনিম্ন মজুরির অর্থ বাঁচিবার মতো মজুরি এ-বিষয়ে আমরা কি নিশ্চিত হইতে পারি?

হুইট্‌লি কমিশন যে-সব বিভিন্ন সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি বিস্তারিত ভাবে পরীক্ষা করার প্রয়োজন আমার নাই। যাহা হউক, আমি মাত্র একটি ছোটো বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই এবং ইহা দৃশ্যত অনুল্লেখ্য হইলেও ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বৃদ্ধিতে ইহার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে "ট্রেড ইউনিয়ন আইনের ২২ ধারা এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যাহাতে এই ব্যবস্থা থাকে যে একটি রেজিস্ট্রিভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের কম-পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ পদাধিকারীকে যে শিল্পের সঙ্গে সেই ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট সেই শিল্পে প্রকৃতপক্ষে কর্মনিযুক্ত হইতে হইবে।" কমিশনের জানা উচিত ছিল যে ভারতে বহিরাগত কিংবা শ্রমিক নন এমন ব্যক্তিদের সাধারণত ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা পদে নির্বাচন করা হয়; তাহার কারণ, যে-সব কর্মী পদাধিকারী হইতে স্বীকৃত হন নিয়োগকারীগণ কর্তৃক তাঁহারা নানা ছল-ছুতায় সাধারণত নিগৃহীত হইয়া থাকেন। সুতরাং কর্মীদের যদি পদাধিকারী হইতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহার দ্বারা নিয়োগকারীদের হাতে তাঁহাদের নিগ্রহ বন্ধ করা যায়। অন্যথায় নিগ্রহের নীতি চলিতে থাকিলে কর্মচারীদের পক্ষে পদাধিকারী হওয়া অসম্ভব হইবে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অসুখ, ছাঁটাই ও বাঁচিবার মতো মজুরির প্রধান সমস্যাগুলি যথোচিতভাবে বিবেচিত হয় নাই। কমিশন

কল্যাণমূলক যে কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বহু বিষয়ে কার্যকর হইলেও এই কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করিবে কে? যে বর্তমান সরকার নিশ্চিতরূপে শ্রমিক-বিরোধী তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা করা যায় কি? সুতরাং শ্রমিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমস্যা। ভারতবর্ষ যে-পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না করে এবং সমাজতান্ত্রিক না হইলেও গণতান্ত্রিক সরকার গড়িয়া তুলিতে না পারে সে-পর্যন্ত এ দেশে শ্রমিক কল্যাণের কোনো কর্মসূচী রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। ইহা রিপোর্ট হইতে পরিষ্কার যে কার্যত প্রতিটি বিষয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকগণ কী করিয়া সরকারী যন্ত্র দখল করিতে কিংবা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সে-বিষয়ে রিপোর্টে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা না করা পর্যন্ত যত রিপোর্টই রচিত হউক তাহাতে শ্রমিকদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না। নূতন সংবিধান প্রসঙ্গে কমিশনের উচিত ছিল প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার সুপারিশ করা। ইহার অতিরিক্ত হিসাবে কিংবা ইহার বিকল্প হিসাবে কমিশন প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য শতকরা হিসাবে নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ সুপারিশ করিতে পারিবেন।

সাথীগণ, আপনারা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা করেন যে আমি আগামী বৎসরের কর্মসূচী সম্বন্ধে কিছু বলি। আমার আশংকা আমি নতুন কিংবা অভিনব কিছু বলিতে পারিব না কিংবা কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ কর্মসূচীও পেশ করিতে পারিব না। আমি খুবই দৃঢ়ভাবে মনে করি যে ভারতে বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল ও অসংগঠিত অবস্থায় আছে। সুতরাং আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম কর্তব্য হইল সংগঠন ও সংহতি সাধনের কাজে আমাদের সকল সময় ও উদ্যোগ নিয়োগ করা। এই কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমরা শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কিছুই করিতে পারিব না। সুতরাং আমরা যদি কায়মনোবাক্যে শুধু এই কাজে আত্মনিয়োগ করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সংগঠনে ও সংহতিসাধনে দ্রুত অগ্রগতি করিতে পারিব। নীচে ১৯২১ সালের আদমসুমারি হইতে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের যে সংখ্যাতত্ত্ব দিলাম তাহা হইতে আমরা যে কার্যের সম্মুখীন তাহার বিশালত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। এই সংখ্যাগুলিকে সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে ইহাদের সঙ্গে মোটামুটি শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি ধরিতে হইবে।

শিল্প	আনুমানিক শ্রমিক
চা আবাদ	৭৫০,০০০
কাপড়ের কল	৩৫০,০০০
চটকল	২৯০,০০০
কয়লাখনি	১৮০,০০০
রেলওয়ে শ্রমিক	১১৮,০০০
সুতা তৈরির কল	৮৩,০০০
মেটাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা	৮২,০০০
ইট ও টালি কারখানা	৭৫,০০০
আটা, ময়দা ও চাউল কল	৫০,০০০
ছাপাখানা	৫০,০০০
লোহ ও ইস্পাত কারখানা	৪০,০০০
পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি	৩৪,০০০

উপরের সংখ্যাগুলি ছাড়াও নীচের সংখ্যাগুলিও চিত্তাকর্ষক হইবে :

রেলওয়ে-পরিবহণ শ্রমিক	১,২৫০,০০০
পথ-পরিবহণ শ্রমিক	২,১৫০,০০০
জল-পরিবহণ শ্রমিক	৭৫৩,০০০

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সম্মুখীন কাজের বিশালত্ব যে কতখানি উপরের সংখ্যাগুলি হইতে সে ধারণা কিছুটা করা যাইবে। সেইজন্যই অন্য কিছু চিন্তা করিবার পূর্বে আমি শ্রমিকদের সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংহতি সাধনের কথা বলিতেছি।

অতীতে সাময়িক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইলেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিতে ও আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। বিভিন্ন চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা কোন্ পথ কিংবা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহারা কখনো কখনো বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। একপক্ষে আছেন দক্ষিণপন্থীরা যাঁহারা সব-কিছুর ঊর্ধ্বে সংস্কারমূলক কর্মসূচী চান। অপর দিকে আছেন আমাদের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা এবং তাঁহাদের যদি আমি ঠিক চিনিয়া থাকি তাঁহারা হইলেন মস্কোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও অনুগামী। এই দুইটি গোষ্ঠীর কোনোটির মানসিকতা কিংবা

অভিমতের সংগে আমাদের মিল হউক বা না হউক, আমরা তাঁহাদের বুঝিতে ভুল করিতে পারি না। এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর-একটি গোষ্ঠী যাঁহারা সমাজতন্ত্রের, পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের ধারক। কিন্তু তাঁহারা চান যে ভারত তাহার নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাইবে এবং তাহা রূপায়ণের পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিবে। আমি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সবিনয়ে এই দাবি জানাই। আমার মনে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই যে ভারতের মুক্তি ও সেইসংগে পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের উপর। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে কিন্তু ভারতকে নিজের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া সমাজতন্ত্র রূপায়ণের নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে হইবে। কোনো তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিতে গেলে আপনি কখনো ভূগোল কিংবা ইতিহাসকে বাদ দিতে পারেন না। এই ধরনের প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। আমি আরো মনে করি যে ভারতের উচিত নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্রের জন্ম দেওয়া। যখন গোটা পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাতিয়াছে তখন আমরাই বা তাহা করিব না কেন? এমন হইতে পারে যে ভারতে যে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইবে তাহার মধ্যে এমন নূতন ও অভিনব কিছু থাকিবে যাহা গোটা পৃথিবীর উপকারে আসিবে।

সাথীগণ, উপসংহারে আমি আপনাদের পুনরায় আমাকে সম্মানে বিভূষিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আন্তরিকভাবে এই আশাও পোষণ করি যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই অধিবেশন ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইবে।

২

৪ জুলাই ১৯৩১ সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বিবৃতি।

অদ্য অপরাহ্নে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন এবং কর্মপরিষদের সভা মুলতুবী রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। ধাপে ধাপে কী পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি তাহা বুঝাইয়া বলিব।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম দিনের বৈঠকে, অর্থাৎ ৩ জুলাই তারিখে, শুরুতেই প্রশ্ন ওঠে যে বোম্বাই-এর গিরনি-কামগার ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কর্মপরিষদে প্রকৃত প্রতিনিধি কে। দুইটি পরস্পর-বিবদমান গোষ্ঠী কর্মপরিষদে এই প্রতিনিধিত্বের দাবি করিতেছিল। সাধারণ সম্পাদক, শ্রীদেশপাণ্ডে নিজ গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিলেও অপর গোষ্ঠীকে তাহা দিতে অস্বীকার করেন। দীর্ঘ সময় উত্তপ্ত আলোচনার পর কোন্ গোষ্ঠীকে কর্মপরিষদে স্থান দেওয়া হইবে, তাহা বিচারের ভার একটি স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটির হাতে দেওয়া হয়। অন্যান্য ইউনিয়নের স্বীকৃতি-নির্ণয়ের ভারও এই কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটি এবং কর্মপরিষদ এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত বহু সদস্য দাবি জানান যে কোনো গোষ্ঠীকেই ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে না। বিষয়টির মীমাংসা সহজ করিবার এবং তিক্ততা এড়াইবার জন্য, এই নীতির সমর্থনে কিছু কিছু নজীরও উদ্ধৃত করা হয়। আমি অবশ্য দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর বঙ্কিম মুখার্জি, ভূপেন দত্ত এবং তাহাদের সমর্থকদের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া অন্য গোষ্ঠীকে বাদ দিয়া, তাহাদের ভোটদানের অধিকার মঞ্জুর করি।

স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটি গঠিত হইবার পর সভা ৪ জুলাই বেলা ১টা পর্যন্ত কর্মপরিষদের বৈঠক মুলতুবী থাকে। সভায় আরো স্থির হয় যে কর্ম-পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে, কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) অনুযায়ী, সকল ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তিসূচক সদস্য-চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলি ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটি গঠিত হইবার মুখে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে একটি সদস্য-তালিকা পেশ করা হয়। ইহার সংশোধনীরূপে অতঃপর আর-একটি সদস্য-তালিকা পেশ করা হইলে তাহা গৃহীত হয়। এই সংশোধনী তালিকা গৃহীত হইলে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠী তাহাদের পরবর্তী আচরণে পদে পদে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আশা করা যায় যে ৪ জুলাই বেলা ১১টা পর্যন্ত কর্মপরিষদের মুলতুবী বৈঠকের পূর্বেই স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া যাইবে। যথাসময়ে কর্মপরিষদের বৈঠক বসিলে স্বীকৃতি-নির্ণায়ক কমিটি জানান যে

ভোরবেলা হইতে সভা করিয়াও তাহাদের কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সুতরাং কর্মপরিষদের সদস্যদের সম্মতিক্রমে পরবর্তী বৈঠকের সময় ৫ জুলাই সকাল ৮টায় নির্দিষ্ট করিলাম।

৫ জুলাই সকালবেলা কর্মপরিষদের বৈঠক বসিলে ইউনিয়নগুলিকে অন্তর্ভুক্তি-সূচক সদস্য-চাঁদা দিতে আহ্বান জানাই। কারণ প্রথমদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলি এই বকেয়া-চাঁদা না দিলে তাহাদের ভোটের অধিকার দেওয়া যাইবে না। জি. আই. পি. রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন বাদে— কর্মপরিষদে যাহাদের চারজন প্রতিনিধির মধ্যে তিনজনই দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত— অবশিষ্টরা তাহাদের দেয় অন্তর্ভুক্তি-সূচক চাঁদা পুরোপুরি পরিশোধ করে। জি.আই.পি. রেলওয়েমেনস ইউনিয়ন তাহাদের দেয় ৬১৫ টাকার মধ্যে মাত্র ৯০ টাকা পরিশোধ করে। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র অনুযায়ী দেয় চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাহারা ভোটদানে অংশ-গ্রহণ করিতে পারিবেন না। দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীকে আরো নমনীয় করিবার জন্য সভায় ব্যক্তিগত আবেদন করিয়া অনিচ্ছুক সদস্যদেরও জি. আই. পি. রেলওয়ে-মেনস প্রতিনিধিদের ভোটদানে অংশগ্রহণে সম্মত করাই। বস্তুতপক্ষে বিরোধ এড়াইবার জন্য দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর স্বপক্ষে যতটা সম্ভব সুযোগ করিয়া দিয়াছি।

সভায় স্বীকৃতি-নির্ণয়ক কমিটির রিপোর্ট উত্থাপিত হইলে আমি নির্দেশ দিই যে গিরনি-কামগার ইউনিয়নের প্রসঙ্গটি সর্বপ্রথম আলোচিত হউক। সভার প্রথম দিন, অর্থাৎ ৩ জুলাই এই প্রসঙ্গটি প্রথম বিবেচিত হইয়া স্বীকৃতি-নির্ণয়ক কমিটিতে পাঠানো হয়। সুতরাং কর্মপরিষদের কাছে উপস্থাপিত হইবার পর সংগতভাবেই এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম গ্রহণ করিতে হইবে। এই অগ্রাধিকার ব্যক্ত করিলে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠী হতাশা বোধ করেন। কোনো কোনো সদস্যর কাছে জানিতে পারি যে স্বীকৃতি-নির্ণয়ক কমিটি গিরনি-কামগার ইউনিয়নের দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর বিপক্ষে এবং অপর গোষ্ঠীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর আশঙ্কা হইল যে গিরনি কামগার ইউনিয়নের প্রসঙ্গটি সর্বাগ্রে বিবেচিত হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদের সভাস্থল ত্যাগ করিতে হইবে এবং কর্মপরিষদে তাহাদের শক্তি আরো হ্রাস পাইবে।

যে-কোনো কারণেই হোক, আমি সভার কার্যপরিচালনার পদ্ধতি বিবৃত

করিবার পরই, দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে রণদিভে সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রস্তাবটি বিধিসম্মত ঘোষণা করিয়া আলোচনা করিতে সম্মতি দান করি। আলোচনা চলাকালীন কয়েক মিনিটের জন্য সভাস্থল ত্যাগ করিয়া নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীখান্দেলকরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। সভায় ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারি যে আমি সভাস্থল ত্যাগ করা মাত্র সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেশপাণ্ডে লাফ দিয়া টেবিলে উঠিয়া শ্রীখান্দেলকরের সভাপতিত্ব করিবার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। শ্রীখান্দেলকার তাহাকে শৃংখলা রক্ষা করিবার আহ্বান জানাইলে শ্রীদেশপাণ্ডে ও তাহার গোষ্ঠী তুমুল হট্টগোল ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, যাহারা অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র, শৃংখলা রক্ষার চেষ্টা করিলে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠী কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। সদস্যদের নিকট শান্ত হইবার আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইলে, আমি সভা মুলতুবী রাখিতে বাধ্য হই। সদস্যদের সহিত পরামর্শ করিয়া বেলা ৩টায় সভার অধিবেশনের সময় ধার্য করি এবং কর্মপরিষদ সময়মতো প্রকাশ্য অধিবেশনের বিষয়সূচী চূড়ান্ত করিতে না পারিলে প্রকাশ্য অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে হইবে বলিয়া জানাই। সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে ইহাও ঘোষণা করি যে বেলা ৩টার সভায় দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে।

যথাসময়ে মুলতুবী বৈঠক আরম্ভ হইলে অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচনার পর অধিক ভোটে বাতিল হইয়া যায়। ইহার পর আমার পূর্বেকার নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে গিরনি-কামগার ইউনিয়নের প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে আলোচনা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠী নানাপ্রকার বাধাসৃষ্টির ও হট্টগোলের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত তাহারা প্রস্তাব করে কর্মপরিষদের সভা মুলতুবী রাখিয়া প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু করা হউক। আমি আপত্তি তুলিয়া বলি স্বীকৃতি-নির্ণয়ন-সূচক কমিটির রিপোর্ট বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রকাশ্য সম্মেলনে উপস্থিত হইবার যোগ্যতা কাহার আছে তাহাই নির্ধারিত হইবে না। তাহা ছাড়া কর্মপরিষদ কোনো প্রস্তাব, বার্ষিক রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ না করায় প্রকাশ্য অধিবেশনে কোনো আলোচ্য বিষয়ই নাই। হট্টগোলকারী সদস্যদের আমি এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিই যে তাহাদের বাধাদান অব্যাহত থাকিলে বাধ্য হইয়া আমাকে কর্মপরিষদের সভা এবং প্রকাশ্য অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে হইবে।

এই সময় দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীর ইশারায় একদল বাহিরের লোক সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের লাঞ্ছিত করে এবং এমন তুমুল হট্টগোল করে যে কার্যপরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে বাধ্য হইয়া কর্মপরিষদের সভা ও প্রকাশ্য অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখিতে হয়।

পরিশেষে বলিতে চাই যে দেশপাণ্ডে-গোষ্ঠীকে নমনীয় করিবার জন্য সভা চলাকালীন সাধ্যমতো সকল প্রকার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু স্বীকৃতি-নির্ণয়ক কমিটি গঠিত হইবার পর তাহারা যে সংখ্যালঘিষ্ঠ তাহা বোধগম্য হইলে কর্মপরিষদের সভা অচল করিবার উদ্দেশ্যে নানা বাধার সৃষ্টি করে। তাহাদের এই আচরণের জন্য আমি দুঃখিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠ অবস্থায় খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা পরাজয় স্বীকার করিবে, ইহাই আশা করিয়াছিলাম। পৃথিবীর কোনো পরিষদের পক্ষেই কার্যপরিচালনা সম্ভব নয়, যদি তাহারা সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী ইহাই সপ্রমাণ করিবে যে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন পণ্ড করিবার জন্য শ্রীদেশপাণ্ডে এবং তাঁহার গোষ্ঠীই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

বিশ্বের প্রতি ভারতের বাণী

১২ জুলাই ১৯৩১ নড়াইলে অনুষ্ঠিত যশোহর জেলা রাষ্ট্রনৈতিক সম্মেলনে ভাষণ।

যাঁহারা আপনাদের সেবা করেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিয়া থাকেন তাঁহাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ এবং কর্মধারা সম্পর্কে আপনাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। নিশ্চয়ই তাহা জানিবার অধিকার আপনাদের রহিয়াছে।

আপনারা জানেন, ইংরেজরা বণিকের পণ্য লইয়া এদেশে প্রথম আসে। কিন্তু রাজদণ্ডের প্রলোভন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে তাহাদের পরিচালনা করে। কিভাবে তাহারা আমাদের শাসকের স্থান দখল করিল, বাংলাদেশবাসী আমরা তাহা সবিশেষ জ্ঞাত আছি। বাণিজ্য করিতে আসিয়া

যাহারা সিংহাসনের দখলদার হইল, তাহাদের সেই পদ্ধতিকে সদুপায় বলা যায় না।

বন্ধুগণ, কত বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি ভারতে আসিয়া শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতিসত্তার অংগীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা জানেন। এই স্বেচ্ছামিশ্রণ আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বহু পরিমাণে উন্নত ও সম্পদশালী করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়দের সহিত মিশ্রণের প্রবণতা অনমনীয় ভাবে রোধই করে নাই, ভারতীয়দের উপর তাহাদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি আরোপ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে, শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারত ইংরাজী ভাষা প্রবর্তন করিবে কিনা এই প্রশ্ন উত্থিত হইলে, রাজা রামমোহন রায় জোরের সংগে বলিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভাষা না শিখিলে আমাদের কোনো বিকাশ বা উন্নতি হইবে না, খাস পাশ্চাত্য-দেশীয়দের নিকট হইতে পাশ্চাত্যধারা না শিক্ষা করিলে আমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিব না।

প্রতিক্রিয়া : স্বাধীনতার জন্য জাতির আকুতি

যথাসময়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জাতি আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য আকুল হইল। কিন্তু সঠিক পথের সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। সমস্যা দাঁড়াইল দেশে অবস্থিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং ধর্মগত গোষ্ঠীগুলির সমন্বয় সাধিত হইবে কিভাবে। ভারত-বর্ষের এই নানাত্ব এবং বৈচিত্র্যের পশ্চাতে কোনো মূলগত ঐক্য আছে কিনা ইহাই প্রশ্ন।

এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া সর্বকালের জন্য সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে সকল ধর্মই একই সর্বশক্তিমান বিধাতার চরণতলে সম্মিলিত হয়। সর্বজনীন পরমতসহিষ্ণুতা এবং প্রেমের ভিত্তিতে ভারতে সকল ধর্মের সমন্বয় ভারতীয় জাতীয়ত্ববোধ বিকাশের স্থায়ী ভিত্তিমূল গড়িয়া তুলিবে।

বহুর মধ্যে এক

এই মূলগত সত্যটি উপলব্ধি করিবার পর জনসাধারণ বুঝিল যে সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন কেবলমাত্র সকল ধর্মে নহে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও—

ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে একটি জাতি সৃষ্টি হইতে পারে। বহুর মধ্যে এক, এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমরা ধর্মীয়, সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিব না। এই-সকল আপাত-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি ঐক্যসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। দৃশ্যত বৈচিত্র্যে প্রতিহত না হইয়া তাহার অন্তরালবর্তী মূলগত ঐক্যের সন্ধান করিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও যৌথজীবন সেই নিরাপদ ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

স্বাধীনতার আদর্শ

ভারতীয় জাতীয়ত্বের নিরাপদ ভিত্ গড়িয়া উঠিলে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিলেন। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে একমাত্র স্বাধীনতার আলো ভারতীয় জীবনকে উদ্ভাসিত করিতে পারে। তাঁহার বক্তৃতাবলী, কবিতা ও রচনার মধ্য দিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন: "স্বাধীনতাই আত্মার সংগীত"। নিঃসংশয়ে বলা যায় বিবেকানন্দ আত্মিক স্বাধীনতার কথাই বলিয়াছিলেন কিন্তু ইহাও তর্কাতীত যে আত্মার জাগরণে জীবনের প্রতিটি স্তরে জাগরণের প্রকাশ ব্যক্ত হইয়া উঠে। একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণের আভা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে সে-মানুষটি যখন অসুস্থ হয়, তাহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাংশু এবং রোগগ্রস্ত হইয়া ওঠে। জাতির পক্ষেও ইহা সমপরিমাণে সত্য। স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাতির জীবনে দৃঢ়মূল হইলে, তাহা জীবনের সকল স্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দের বাণী

স্বাধীনতার এই অঙ্কুরোদ্গত ভাবধারাকে নূতন রূপ ও কাঠামোতে বিন্যস্ত করিবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন: ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত পূর্ণ স্ব-শাসনই আমাদের আদর্শ। ইহা সাহসিকতা-পূর্ণ এবং উদ্দীপনাময় উক্তি। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ প্রাণবন্ত এবং কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। এইভাবে মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত তাৎপর্যে ব্যক্ত হইলে সমগ্র দেশ যেন সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল: "অবশেষে আমার মনের মানুষটিকে পাওয়া গিয়াছে।" বন্ধুগণ, সেই সময় এই সুরে ভারত-

বর্ষের কয়জন নেতা কথা বলিতে সাহসী ছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর পূর্বে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিতে সক্ষম ছিলেন ?

তিনটি স্তর : স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে তিন সুস্পষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায় : স্বদেশী আন্দোলন, বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনই সর্বপ্রথম আরম্ভ হইয়া মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। ভারতীয় জনসাধারণের এক অংশ এই শাসন-সংস্কার করিয়া লইয়া তৃপ্ত থাকে। কিন্তু যুবশক্তি, যাহাদের মনে ইতিমধ্যে স্বাধীনতার বীজ দৃঢ়মূল হইয়াছে, ইহাকে প্রতারণা বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের আদর্শ উদ্‌যাপনের জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

সকলে ক্রীতদাসের সামিল

এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অধ্যায়ের শেষে অসহযোগ আন্দোলনের পর্যায় উপস্থিত হয়। এই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষকে অহিংস বিপ্লব সংগ্রামের পথে উদ্দীপিত করে। ইহা সংগতভাবেই দাবি করা হয় যে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যদি শাসকদের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া লয়, এই সাম্রাজ্য একদিনেই ধ্বসিয়া পড়িবে। একমুঠো ইংরেজ কী করিয়া এত বৃহদাকার দেশকে শাসন করিতে পারে ? ভদ্রমহোদয়গণ, সমগ্র যশোহর জেলা শাসনের জন্য কতজন ইংরেজ এখানে অবস্থান করিতেছে ? এইজন্যই তাহাদের পক্ষে শাসন করা সম্ভব, কারণ আমরা আগ বাড়াইয়া তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকি। আমি বহরমপুর জেলে থাকাকালীন একজন সাধারণ কয়েদীর আত্মীয় এবং বন্ধুবর্গ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। সেই কয়েদীটি তাহাদের বলিয়া দিত 'আমার পরিবারবর্গকে খবর দিয়ো যে আমি এখানে ভালোই আছি। সরকার এখানে ২৫০ জন কয়েদীর উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য আমাকে হাকিম বানাইয়া দিয়াছে।' আসলে তাহাকে কয়েদীদের তদারককারীর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। বন্ধুগণ, এইভাবেই তাহারা আমাদেরই সাহায্য লইয়া আমাদের শাসন করিয়া পদানত করিয়া রাখিয়াছে। পরাধীন দেশে কোনো হাকিম নাই। সকলেই

দাস-মাত্র। জেলের ভিতরেও যেমন, বাহিরেও সেই রকম, একদল দাসের সাহায্যে পদানত দাসদের উপর তাহারা প্রভুত্ব করিয়া থাকে।

সুতরাং, যদি আমাদের দেশবাসী, বিদেশীদের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হইবে। বহু দশক পূর্বে সিলী, টাউনসেন্ড এবং আরো অনেকে বহুপূর্বেই এ কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। টাউনসেন্ড লিখিয়া গিয়াছেন, যেদিন ভারত সহযোগিতা প্রত্যাহার করিয়া লইবে, যে সাম্রাজ্য একদিনে গড়িয়া উঠিয়াছিল এক রাত্রির মধ্যে তাহা অন্তর্হিত হইবে।

বয়কট ও স্বদেশী

আমরা কেবল তাহাদের সেবাই করি না, তাহাদের খাওয়াইয়াও থাকি। আমরা তাহাদের নিকট হইতে ১১০ কোটি টাকার পণ্য ক্রয় করি যাহা ইংল্যান্ড-এর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজন হয়। সেজন্যই আমরা বয়কট এবং স্বদেশীর পথ অবলম্বন করিয়াছি। জাতীয় সংকল্প জাগ্রত না হইলে স্বাধীনতা আসিবে না এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার সংকল্প জাগরূক করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্মের প্রতিটি কর্মসূচীতে অসহযোগ ও বয়কট— এই দুইটি কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকি।

অনুন্নত শ্রেণীদের প্রতি আশ্বাস দান

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুন্নতশ্রেণীদের, শ্রমিকদের এবং কিষাণদের আমাদের সঙ্গে টানিয়া আনিতে পারি নাই। তাহারা চিরদিনই অস্পৃশ্য এবং অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সামাজিক অভিযোগগুলি দূরীকরণে আমাদের ব্যর্থতা, সংগ্রাম হইতে তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের ইহাই প্রশ্ন, স্বরাজলাভের পরও অস্পৃশ্যতা এবং উচ্চবর্গের দ্বারা শোষণ যে অব্যাহত থাকিবে না তাহার নিশ্চিতি কোথায়? সুতরাং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহাদের আশ্বস্ত করিয়া বলিতে হইবে যে অবিচার ও শোষণের অবসান ঘটানো হইবে। যখন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে স্বরাজ আসিলে তাহারা আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করিবে তখনই তাহারা দ্বিধাহীনচিত্তে আমাদের সঙ্গে সংগ্রামে যোগদান করিবে।

স্বাধীনতার সংগ্রাম : নারীমুক্তি অবশ্যই চাই

স্বাধীনতালাভের জন্য নারী-সমাজের মুক্তিও সমভাবে অপরিহার্য। অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কী ছিল তাহা সকলেরই উত্তমরূপে জানা আছে, তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নারী-সমাজকেও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া স্বাধীনতা দান করিতে হইবে। বর্তমান ভারতে গণতন্ত্রের শক্তি বাঁচিয়া আছে, ইহা সৌভাগ্যের কথা। আমি দৃঢ়তার সংগে বিশ্বাস করি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইবে কারণ ইহা বিধাতার অনুপ্রেরিত। বর্তমানে ভারতবর্ষ বিশ্বের ভাবনাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা আমাদের সমর্থন করিতেছে এবং ইহা বজায় রাখিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। আমাদের কর্তব্যসাধন করিলে এবং সময়োপযোগী সাড়া দিলে অবশ্যই আমরা ইহা বজায় রাখিতে পারিব।

বিশ্বে ভারতের বাণী

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়াই বাঁচিয়া আছে। বিশ্ব চায় ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাকুক। তাহার বিশ্বকে এখনো অনেক দিবার রহিয়াছে এবং শিখাইবার রহিয়াছে যে, যে-জাতির বিশ্বের জন্য বাণী আছে, সে কখনো মরিয়া যাইতে পারে না। ইতিহাসে উল্লিখিত কত জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্ধান করিলেও কালের প্রবাহ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষ বাঁচিয়া রহিয়াছে। যদিও ভারতবর্ষ বিশ্বভাণ্ডারে অনেক কিছু দিয়াছে, এখনো ভারতবর্ষের শিক্ষা দ্বারা বিশ্ব উপকৃত হইতে চায়।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিচিত, আমেরিকা, গত বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছে কিন্তু তারও বহুপূর্বে এই দেশেরই এক সন্তান সেই পুরস্কারটি জয় করিয়াছেন। আমাদের গামা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীররূপে পরিচিত, জিসকোকে এক মিনিট সময়ের মধ্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। একইভাবে শারীরিক, মানসিক এবং প্রতিভার ক্ষেত্রেও বিশ্বের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। বর্তমানে ইউরোপ মানবতাবাদের আদর্শের চর্চা করিয়া থাকে কিন্তু পাঁচশত বৎসর পূর্বে আমাদের কবি চণ্ডীদাস তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া এই আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

নূতন সামাজিক-ব্যবস্থার স্বপ্ন

ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মতো ভারতবর্ষও একটি নূতন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবে। মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ বলিয়াই ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমি মনে করি ভারতের বাণী শুধু আধ্যাত্মিকই নয়, তাহা বহু ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে একমাত্র ভারতবর্ষই সমাধান দিবে। আমেরিকাবাসীরা সব চাইতে সভ্য বলিয়া দাবি করে, কিন্তু আমেরিকার নিগ্রোবাসীরা চিরদিনের মতো ক্রীতদাসই রহিয়া গিয়াছে— আমেরিকা নিগ্রো-সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। অতিমানব আদর্শ উপলব্ধিতে একমাত্র ভারতবর্ষই সক্ষম। ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহ পৃথিবীরও সমস্যা বটে। বিশ্বের মুক্তি ভারতবর্ষের মুক্তির উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান হইলে, বিশ্বসমস্যারও সমাধান হইবে। সুতরাং আমি বলিতে চাই: "ভারতবর্ষের পরিত্রাণের তাৎপর্য হইল বিশ্বেরও পরিত্রাণ।"

সংঘাতের জন্য তৈয়ারি থাকো

বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আহূত জনসভায় ভাষণ।

নূতন রাষ্ট্রীয় পতাকা দেশে নবজাগরণের সূচনা বহন করিয়া আনুক, নূতন সংঘাতের পূর্বেই যাহার আগমনের অনিবার্যতা রহিয়াছে। নূতন জাগরণে অনুপ্রেরিত হইয়া প্রতিটি গৃহে অধিকতর উৎসাহ সহকারে কংগ্রেসের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া হউক: কংগ্রেসকে এমন একটি শক্তিতে পরিণত করা হউক যাহাকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না এবং যাহার সম্মুখে সকলের নতি স্বীকার করিতে হইবে।

গভর্নমেন্টের জেদ

মহাত্মা কর্তৃপক্ষের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, এমন-কি সহযোগিতার প্রবল উৎসাহে তিনি এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, যাহা অনেকেই অপছন্দ করিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও অপরপক্ষের দিক হইতে

কোনো সাড়াই পাওয়া যায় নাই। শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের পর হইতে গভর্নমেন্ট তাহাদের বিরামহীন দমননীতি অনুসরণ করিয়া এমন মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, যাহা সত্ত্বেও সহযোগিতার নীতি অনুসরণে কিছুমাত্র আত্মসম্মান-বোধের অভাবই প্রমাণিত হইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়া মহাত্মাজীকে গোল-টেবিল বৈঠক হইতে সরিয়া থাকিতে হইয়াছে, যাহার জন্য অপরপক্ষ সম্পূর্ণ দায়ী।

সংঘাতের জন্য তৈয়ারি থাকো

ওয়ার্কিং কমিটির যে-কোনো কর্মসূচীর জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপন্থার উপর নজর রাখিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র বয়কট যাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে বড়বাজারের একটি বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে। তাহারা বড়বাজারের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে তাহার প্রভাব বাংলাদেশের সর্বত্র, বিহার, ওড়িশা এবং উত্তর প্রদেশেও অনুভূত হইবে। পুজা এবং দেওয়ালীর মুখে তাহারা অবিলম্বে তৎপর না হইল সমগ্র বাজার বিদেশী বস্ত্রে ছাইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই দুর্যোগ তাহাদের এড়াইতেই হইবে। বর্তমানে যাহারা ভয়ংকর বন্যায় কবলিত তাহাদের জন্য সকল প্রকার ত্রাণের ব্যবস্থা, তাহাদের সম্মুখে আর-একটি আশু কর্তব্য।

১৬ আগস্ট ১৯৩১

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ

জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির প্রতি আবেদন।

পতাকা দিবস

১. 'পতাকা দিবস' উদ্‌যাপন সম্পর্কে এ. আই. সি. সি.'র সাম্প্রতিক প্রস্তাবে সকল জেলা এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মাসের শেষ রবিবার, ৩০ আগস্ট সকাল ৭টায় নূতন জাতীয় পতাকা সকল স্তরের কংগ্রেস সংগঠনকে উত্তোলনের নির্দেশ দিয়া 'পতাকা দিবস' উদ্‌যাপনের নির্দেশ দিতেছে। আমি আশা করি

বাংলাদেশে ৩০ আগস্ট 'পতাকা দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হইবে এবং সর্বত্র নূতন জাতীয় পতাকা জনপ্রিয় করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটিতে সাহায্য চাই

২. বাংলা কংগ্রেসের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির সহায়তার জন্য সকল জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি। জেলা কমিটিগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র কলিকাতায়ই কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইবে না। সুতরাং আমি আশা করি যে সমগ্র প্রদেশে স্থানীয় ত্রাণ কমিটি গঠিত হইবে এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত বাংলা কংগ্রেস বন্যা ও ত্রাণ কমিটির তহবিলে তাঁহারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলাগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, তাহা আশা করি না কিন্তু এ-যাবৎ যে-সকল জেলা বন্যা ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ মুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের সংগ্রহ কেন্দ্রীয় তহবিলে পাঠাইতে সচেষ্ট হইবেন, আশা করি।

পিকেটিং-এর প্রস্তুতি চাই

৩. দুর্গাপূজা আগত-প্রায়। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বয়কটে পুনরায় জোর দিতে হইবে। আমি বাংলা কংগ্রেস সংগঠনের নিকট বয়কট অভিযান তীব্রতর করিবার জন্য এবং প্রয়োজন হইলে পিকেটিং আরম্ভ করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

১৭ আগস্ট ১৯৩১

প্রতিবাদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্রের উত্তর।

২২ আগস্ট. ১৯৩১ লেখা আপনার চিঠি আমি পাইয়াছি। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে উপরোক্ত চিঠিতে আপনি নিজের উপর সুবিচার করেন নাই। আমি আপনাকে ইতিপূর্বেই জানাইয়াছি যে কংগ্রেস রিলিফ কমিটির আপনার সভাপতিত্ব সম্বন্ধে ১০ আগস্ট তারিখে অ্যালবার্ট হলের জনসভায়ই আমি

প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই সভায় বলিবার সময় আপনার পাশেই দাঁড়াইয়াছিলাম। সুতরাং আমার বক্তব্য আপনার না শুনিবার কথা নয়। যেহেতু আপনার নিকট হইতে কোনো প্রতিবাদ আসে নাই আমি কী করিয়া অনুমান করিব আপনি কংগ্রেস রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন। গত দশ বছর কংগ্রেস আয়োজিত ত্রাণ কমিটিতে আপনি ও আমি উভয়েই সেবার দায়িত্ব পালন করিয়াছি এবং আপনি সর্বক্ষেত্রেই (কার্যত সর্বক্ষেত্রেই) সভাপতিপদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং, ইহাই স্বাভাবিক যে এই ক্ষেত্রেও আপনাকেই আমরা সভাপতি নির্বাচিত করিব। এই বারই আপনি সর্বপ্রথম সভাপতির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সভাপতিপদ

কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে-অর্থসাহায্যের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে গোড়া হইতেই একই ভাবে সকল স্বাক্ষরকারীদের নামসহ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি আপনাকে সভাপতি নির্বাচিত করিবার পূর্বে আবেদনের খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিবেন যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, রিলিফ কমিটি গঠন করিবার সময় তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ভার কমিটির উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিল। সেই কারণেই একেবারে প্রথমে এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত সকল আবেদনগুলিতে কোষাধ্যক্ষ ও সভাপতির নাম ছাড়াই কেবলমাত্র সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের বাহিরের সংবাদপত্রসমূহে যে সংবাদ পাঠানো হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ আবেদনটি কিম্বা সকল স্বাক্ষরকারীর নাম পাঠানো হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেস রিলিফ কমিটিকে অন্যান্য কমিটি হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত করিবার জন্য আপনার, রামানন্দবাবু, স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ এবং অন্যান্য সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হইয়াছে এবং সেইসঙ্গে সভাপতির নামও দেওয়া হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য এই ধরনের একটি সংবাদের নকল এইসঙ্গে দিতেছি। বাংলাদেশের কথা বলা যায়, আমার মনে হয় আপনি যে কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সভাপতি ইহা সকলেরই জানা। আমার বক্তব্যের সমর্থনে একটি হ্যান্ডবিলের নকল আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহাতে দেখা

যাইবে বি. পি. সি. সি.'র ফ্লাড অ্যান্ড ফেমিন রিলিফ কমিটির সভাপতি-রূপে বর্ণিত ও প্রচারিত আবেদনে আপনি অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

আমি অতীতে কখনো দেশের সেবায় আপনার মূল্যবান অবদান খর্ব করিয়া দেখি নাই এবং আমি তাহা কখনো করিব না। যদিও কংগ্রেস রিলিফ কমিটি আপনার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলে গভীর দুঃখবোধে পীড়িত হইবে তবুও আপনাকে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে সুনিশ্চিত করিতে পারি যে আপনার অসহযোগের ধাক্কা কমিটি সামলাইয়া উঠিতে পারিবে। বেংগল রিলিফ কমিটি সম্পর্কে চিঠিটি বি. পি. সি. সি.'র ফ্লাড এ্যান্ড ফেমিন রিলিফ কমিটির সভাপতির উদ্দেশ্যেই আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আপনাকে আমি ঐ চিঠিটি পাঠাই নাই কারণ আমার মনে সংশয় ছিল আপনি নিজেকে এই কমিটির সভাপতিরূপে স্বীকার করিবেন কিনা।

১৯২২-এর রিলিফ ফান্ড

খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হইবার পর বেংগল রিলিফ কমিটির তহবিল হইতে ব্যয় সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নহে। ১৯২২ সালে খয়রাতি সাহায্য বন্ধ হইবার পর কুটিরশিল্পের প্রসার, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি ইত্যাদির জন্য ত্রাণ তহবিল হইতে ব্যয় একেবারেই অননুমোদিত— আমি দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি, বেংগল রিলিফ ফান্ডের উদ্বৃত্ত বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে ভবিষ্যৎ বন্যা ও দুর্ভিক্ষে ব্যয় করিবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। আপনি অনুগ্রহপূর্বক স্মরণ করিবেন উত্তর-বঙ্গ বন্যার অল্পকাল পরেই চট্টগ্রামের দুর্গতদের ত্রাণকার্যের জন্য সাহায্য বরাদ্দের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত আমাদের সহিত একমত না হইয়া সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা সত্ত্বেও, কমিটি কিছু সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিল।

অন্য খাতে ব্যয়

আমি আপনাকে অনুমান করিতে অনুরোধ করিতেছি এই ধরনের সংকটে বেংগল রিলিফ কমিটি এক লক্ষ টাকার মঞ্জুরী লইয়া উপস্থিত হইলে বাংলা-দেশের পরিস্থিতিটা কি রকম হইত। যদি বেংগল রিলিফ কমিটির রক্ষকবৃন্দ অননুমোদিতভাবে ইহার তহবিল অন্য খাতে ব্যয় না করিতেন তবে বর্তমানে

অবশ্যই তাহা সম্ভব হইত। কেহই এক মুহূর্তের জন্য বলিবেন না যে ডিসপেনসারি ও হাসপাতাল এবং কুটিরশিল্পের প্রসার অবাঞ্ছিত কাজ। আমার বক্তব্য যে উদ্দেশ্যে বেঙ্গল রিলিফ ফান্ড গঠিত হইয়াছিল কমিটির কিম্বা এমনকি ইহার সকল সম্পাদকদের বিনা অনুমোদনে তাহার পরিবর্তে অন্য খাতে সেই তহবিল ব্যয়ের কী অধিকার এই ফান্ড-এর রক্ষকদের ছিল?

মহাশয়, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন যদি আমি বলি যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডা. আই. এন সেন এবং শ্রীযুক্ত নীরেন দত্তর গৌরবোজ্জ্বল ত্যাগের উল্লেখ করিয়া মূল বিষয়টি হইতে আপনি সরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ফান্ড অন্য খাতে ব্যয় করায় যে অন্যায় হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগের উল্লেখ তাহা সংশোধন করিবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন বিষয়-সম্পত্তিহীন ব্যক্তি। যদি আমি বিষয়-সম্পত্তির অধিকারীও হইতাম এবং আমি তাহার সবটাই জনসাধারণকে দান করিতাম, সেই ত্যাগের বলেও বন্যাপীড়িতদের জন্য সংগৃহীত তহবিল হইতে সিরাজগঞ্জের একটি হাসপাতাল নির্মাণের কিম্বা টাঙ্গাইলে কুটিরশিল্প প্রসারের ব্যয়কে সমর্থনযোগ্য করিয়া তুলিতে পারিতাম না। আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে আমি কয়েক বছর পর আমার আপত্তি উত্থাপন করিতেছি। আমার অভিযোগের কারণ, আমার দেশবাসী গভীর দুর্গতির মধ্যে দিনযাপন করা সত্ত্বেও, এখন আমাদের পক্ষে বড়ো রকমের তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সেই কারণেই খয়রাতি সাহায্যদানের জন্য বেঙ্গল রিলিফ ফান্ড-এর উদ্বৃত্ত অর্থ পাইবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। দেশের লোকের নিকট হইতে বর্তমানে বৃহৎ তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হইলে, আমার অভিযোগের কোনো কারণ ছিল না। খাদি প্রতিষ্ঠানকে সাময়িক ঋণরূপে অর্থসাহায্য দিলে আমার কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ সে ক্ষেত্রে যে-কোনো সময় অনুরোধ করিলেই খাদি প্রতিষ্ঠান সে-অর্থ পরিশোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই আমার সকল শক্তি দিয়া এই অর্থ-সাহায্য স্থায়ী দানরূপে যাহাতে না দেওয়া হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইতাম। যদি প্রতিষ্ঠান একটি লোকসানী সংস্থা আমার এই সংবাদ যদি সঠিক হয় তাহা হইলে ত্রাণকার্যের জন্য খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে এই অর্থ ফিরিয়া পাইবার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ।

মহাশয় আপনি বলিয়াছেন যে আপনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নীরেন দত্ত ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তর সহায়তায় বেঙ্গল রিলিফ ফান্ড-

এর তহবিল পরিচালনা করিতেছেন। এই তথ্যের জন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি শ্রদ্ধার সহিত আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, আমি সেই কমিটির অন্যতম সম্পাদক, দুর্ভাগ্যবশত যাহাকে আপনি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

অভাবীদের আবেদন

আপনি বলিয়াছেন যে ১৯২২ সালে খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার পর, রিলিফ কমিটির কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার কিছু স্মরণ নাই, কারণ হয় সেই কাজকর্ম সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহ ছিল না, অথবা আমি সে সময় অন্তরীণ ছিলাম। এই কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে খয়রাতি সাহায্য বন্ধ করিবার পর সম্পূর্ণ দুই বছর আমি জেলের বাহিরে ছিলাম এবং আমি যতদূর জানি ও আমার যতদূর মনে আছে কমিটির অনুমোদন লইয়া অন্য খাতে ফান্ড ব্যবহৃত হয় নাই। আপনি বলিয়াছেন হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাইয়া তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই তথ্যটির উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তহবিল তছরূপের কোনো অভিযোগই আমি কখনো উত্থাপন করি নাই। আমার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির উদ্বৃত্ত ফান্ড অননুমোদিতভাবে অন্য খাতে পরিচালিত হইয়াছে এবং এই কারণেই বর্তমানে অর্থের এত প্রয়োজন সত্ত্বেও পাওয়া যাইতেছে না। এই প্রদেশের বন্যা পীড়িতদের পক্ষ হইতে আমি করজোরে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আপনার সকল প্রভাব বিস্তার করিয়া খাদি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য সচেষ্ট হউন।

এই অনুরোধ আমি আপনাকে করিতাম না (আজ পর্যন্ত করি নাই) যদি দেশের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে খয়রাতি সাহায্যের জন্য বৃহদাকার তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হইত। আপনি আপনার পত্রের সম্পূর্ণ জুড়িয়াই আমাকে ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আপনার বয়স এবং সম্মানের আসনের জন্য, আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার জন্য সেজন্য আমি কিছু মনে করি না।

দেশবন্ধুর অধিনায়কত্ব

কিন্তু একটি বিষয়ে আপনি আমার পরলোকগত নেতার উপর পরোক্ষে কুৎসা করিয়াছেন, যাহার প্রতিবাদে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন না করিয়া পারি না।

দেশবন্ধুর ডাকে সান্তাহার ত্যাগ করিবার জন্য আপনি আমাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন এবং এই ঘটনাটি আপনার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমি গর্বের সহিত বলিতে চাই যে আমার জনসেবার জীবনে আমার নেতার প্রতি সর্বদাই আমি বিশ্বস্ত ছিলাম এবং আমি কখনোই তাহাদের একজন নই, যাহারা পরোক্ষ কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার মর্যাদা কিম্বা প্রভাব খর্ব করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। দেশবন্ধু বারবার তারবার্তা প্রেরণ করিয়া আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছেন। এই তারবার্তার কয়েকটি আপনাকে পাঠাইয়া অনুরোধ করিয়াছিলাম, আপনি যেন দেশবন্ধুর সহিত কথা বলিয়া সান্তাহারে আমার থাকিয়া যাওয়া সম্পর্কে তাঁহার সম্মতি নেন। আমি আপনাকে আরো বলিয়াছিলাম যদি আপনি তাহাতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নিয়মানুবর্তী সৈনিকের মতো তাঁহার আদেশ মানিয়া লইতে হইবে এবং শেষ পর্যন্ত সান্তাহার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

আপনি হয় তাঁহার সহিত বিষয়টির মীমাংসা করিতে পারেন নাই অথবা চান নাই এবং এই কারণেই শেষ পর্যন্ত আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু তথ্যের বিকৃতি করা আপনার পক্ষে অশোভন। আমি হঠাৎ সান্তাহার ত্যাগ করিয়াছি, ইহা সত্য নহে। আমার বিদায় সম্পর্কে অনেকদিন যাবৎই আপনি জ্ঞাত ছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দেশবন্ধুর তারবার্তা পাওয়া সত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত না আমি নিশ্চিত হইয়াছি কাজটি সহজেই অন্য কাহারো তুলিয়া দেওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত আমি সত্যসত্যই সান্তাহার ত্যাগ করি নাই। আমি যেমন জানি, আপনিও তেমনি অবগত আছেন যে বন্যার শুরু হইতেই আমি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি এবং প্রায় একটানা সেখানে বাস করিয়াছি। শেষের দিকে সংগঠনটি পুরোদস্তুর পাকা করা হইয়াছে এবং ডা. আই. এন. সেন ইহার দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত সেনাধ্যক্ষ। আমি সান্তাহার ত্যাগ করিলে তিনি আমার স্থলবর্তী হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কাজ পরিচালনা করেন। আপনি জানেন স্বরাজ পার্টি সংগঠনে দেশবন্ধু আমার সেবামূলক কাজ চাহিয়াছিলেন। আপনি কখনোই এই পার্টির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, যদিও মাঝে মাঝে আপনি অ-কংগ্রেসী, কংগ্রেসবিরোধী এবং অন্যান্য পরিষদীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

স্বরাজ পার্টি সম্বন্ধে আপনার মত যাহাই থাকুক-না কেন, উত্তরবঙ্গে আমার দেশবাসীর সেবার যে সামান্য সুযোগ পাইয়াছিলাম আমি আশা করি

সংগতভাবেই তাহা খর্ব করিবার কোনো চেষ্টা আপনি করিবেন না, এবং স্বরাজ পার্টির সংগঠনে আমার জনসেবার কর্মনিষ্ঠা যুক্ত করিবার দাবি জানাইবার জন্য আমার পরলোকগত নেতার প্রতি পরোক্ষে কোনো কটাক্ষপাত করিবেন না।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই যে একটি নীতিকে ভিত্তি করিয়া আমি যাহা কিছু বলিয়াছি কিম্বা লিখিয়াছি। আমি আশা করি আপনি কখনোই মনে করিবেন না আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে। যদি দুর্ভাগ্যবশত আপনি সে-রকম কিছু মনে করেন, আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করিব।

২৩ আগস্ট ১৯৩১

নীচ এবং ভিত্তিহীন আক্রমণ

ডা. জে. এন. মৈত্রের অভিযোগের উত্তর।

বেংগল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি ত্রাণকার্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিবার পর হইতেই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডা. জে. এন. মৈত্র সযত্নে এই সংগঠনকে হেয় করিতে সচেষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। প্রথমত তিনি আমার উপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু খোলাখুলি আক্রমণের প্রলোভন বেশি দিন এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

কংগ্রেস রিলিফ ফান্ড হইতে যে এক হাজার টাকার ঋণ দেওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে এই ঘটনাটি কাজে লাগাইতে পারিবেন। ঘটনা এই যে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের জন্য রিলিফ ফান্ড হইতে আমি এক হাজার টাকা ঋণ লইয়াছিলাম। সে-সময় রিলিফের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যে উদ্বৃত্ত ছিল তাহা হইতে ঋণ লওয়া হয়। এই ঋণ সেই বছরের অডিট-করা হিসাবে দেখানো হয় এবং বেংগল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সাধারণ বাৎসরিক সভায় তাহা উপস্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সেই হিসাব অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, ডা. জে. এন. মৈত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।

১৯২৯-এর আগস্ট হইতে এই রিলিফ ফান্ডের এই ঋণ পরিশোধের জন্য

কোনো ব্যস্ততা ছিল না। উপরন্তু, এই সময় আমরা অনেকেই এক বছর বা ততোধিক সময়ের জন্য কারারুদ্ধ ছিলাম। এ-বছর রিলিফের কাজ আরম্ভ হইবার পর রিলিফ কমিটির সম্পাদককে আমি জানাইয়া রাখিয়াছি যখনই প্রয়োজন হইবে, তিনি যেন টাকা ফেরত চাহিয়া পাঠান। ডাঃ মৈত্র নিশ্চিত থাকিতে পারেন যে রিলিফ ফান্ড হইতে ঋণ লওয়া অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়া হইবে। নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছে, খোলাখুলিভাবেই এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির পূর্ণ অনুমোদন এবং সম্মতি সহকারে।

উদ্বৃত্ত অর্থ সম্বন্ধে রিলিফ কমিটির সেক্রেটারি ইতিমধ্যে বলিয়াছেন যে উহা নিউ রিলিফ কমিটির হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যদি ডা. মৈত্রের, অথবা জনসাধারণের মধ্যে কাহারো মনে এখনো কোনো সংশয় থাকিয়া থাকে তাহারা অনায়াসে হিসাবের খাতা, পাস বহি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া সংশয় ভঞ্জন করিতে পারেন।

ডা. মৈত্র হয়তো জানেন না যে আমাদের হিসাবের একটা ধারাবাহিকতা আছে। বি. পি. সি. সি.'র জেনারেল ফান্ডের হিসাব এবং রিলিফ কমিটির মতো বিভিন্ন কমিটির সকল প্রকার বিশেষ ফান্ডের হিসাব, প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং পূর্বেকার বছরের হিসাবের জের প্রতি বছর টানিয়া আনা হয়। এই বছর যদি কোনো দুর্ভিক্ষ বা বন্যা না হইত রিলিফ কমিটির হিসাব পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় দেওয়া হইত।

ডা. মৈত্রের পত্রের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে— যাহার দ্বারা তিনি কাদা ছুঁড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন— বি.পি.সি.সি.'র ফ্লাড অ্যান্ড ফেমিন রিলিফ কমিটির সম্পাদক ক্যাপ্টেন দত্ত যোগ্য উত্তর দিয়াছেন। আমার পক্ষে সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

২৭ আগস্ট ১৯৩১

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

'লিবার্টি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

রবিবার সন্ধ্যায় অ্যালবার্ট হলে প্রদত্ত ভাষণের যে বিবরণ 'লিবার্টি'তে বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিবরণের শেষের দিকে কিছু ভুল আছে লক্ষ করিয়াছি। বাংলায় ভাষণ দিয়া এই বিষয়টির উপর ঝোঁক দিয়া বলিতেছিলাম যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিবিধের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে ঐক্য বৈচিত্র্যহীন সেই ঐক্য আমাদের গ্রহণীয় নহে, কারণ সেই ঐক্য হইবে নীরস এবং একঘেয়েমিতে অবিচল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলিয়াছিলাম যে যদিও আমি একজন হিন্দী-প্রেমী এবং বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে হিন্দী-প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং কখনো কখনো হিন্দীতে জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছি, বাংলা বর্জন করিয়া হিন্দীকে তাহার বিকল্পরূপে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। সংশ্লিষ্ট বিবরণটি পড়িলে মনে হয় আমি হিন্দী শিক্ষার বিরোধী এবং এই ধারণা ভুল এবং ভিত্তিহীন। নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি-কর্তৃক সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম। গত তিন বছর যাবৎ আমাদের অনুসৃত পদ্ধতিকে কোনো প্রকার গ্রাহ্য না করিয়া এই বাহিনী আমাদের উপর কতকগুলি পদ্ধতি চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, যদিও আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি এই প্রদেশের প্রয়োজন এবং চাহিদার উপযোগী।

বিবরণের শেষ অনুচ্ছেদে দুই একটি বাক্য আছে, যাহা আমার বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। জাতীয় কর্মতৎপরতার স্তরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিই আমার বক্তৃতায় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সহিত আমার সাম্প্রতিক লেন-দেন-এ আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে বাধ্য করিয়াছে যে বাংলাকে যদি বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে সর্বক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাহার দাবি করা কর্তব্য।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

ব্যয় সংকোচের পরামর্শ

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ জামশেদপুর টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারকে লিখিত পত্র।

আপনারা অবগত আছেন যে শ্রমিকগণ নিজেদের চাকুরি সম্বন্ধে শঙ্কিত হওয়ায় জামাডোবায় আমাদের কয়লাখনিতে শ্রমিক পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। বস্তুত ইতিপূর্বেই প্রায় ১৫০ জন লোককে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে। যে পরিস্থিতিতে পরিচালন কর্তৃপক্ষ কোম্পানির কয়লাখনিগুলিতে ব্যয়সংকোচ করিতে বাধ্য হন তাহা শ্রমিক সমিতি জানে। তথাপি সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার পর সমিতি এই অভিমত পোষণ করে যে কয়লাখনি পরিচালন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত পদ্ধতি দরিদ্র কর্মীদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন করে।

যে-সব কর্মীর উপর ছাঁটাই-এর খড়্গ ঝুলিতেছে এবং যাঁহারা ইতিমধ্যে কর্মচ্যুত হইয়াছেন তাঁহাদের দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে ও সেইসঙ্গে বর্তমান মুহূর্তে কোম্পানির যে ব্যয়সংকোচের প্রয়োজন তাহা সম্পাদনের সর্বোত্তম সম্ভাব্য সূত্র খুঁজিয়া বাহির করার উদ্দেশ্যে সমিতি কোল সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিল। সমিতি কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান মাসের ৬ তারিখে জামাডোবায় কোল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কার্কের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত সমিতি বিবেচনার জন্য তাঁহার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করিয়াছে। কিন্তু পরিতাপের কথা এই যে এগুলির কোনোটিই এখনো মানিয়া লওয়া হয় নাই।

১. যে-সব কর্মীকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে তাঁহাদের পাওনা ছুটির জন্য পূর্ণবেতন দিতে হইবে ;

২. বরখাস্ত কর্মীদিগকে গৃহে যাইবার জন্য রেলের মাশুল ও অন্যান্য সুযোগ দিতে হইবে ;

৩. উদ্বৃত্ত কয়লা বিক্রয়ের জন্য অধিকতর অনুকূল বাজার না পাওয়া পর্যন্ত মালকেরা ও চৈতোদি কয়লাখনিগুলির কয়লা উত্তোলন সীমিত করিতে হইবে— ধরুন, ইহার উর্ধ্বসীমা মাসে ৫০০০ টন হইবে ;

৪. মালকেরায় যাঁহারা সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করেন তাঁহাদিগকে ছাঁটাই-এর পূর্বে নোটিশ দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে নোটিশের বদলে এক সপ্তাহের বেতন দিতে হইবে ;

৫. জামাডোবা কয়লাখনিতে কর্মীদের সংখ্যা না কমাইয়া কিংবা এক সিফ্‌টের কাজ বন্ধ না করিয়া পরিচালন কর্তৃপক্ষকে শুধু উৎপাদন সীমিত করিতে হইবে ;

৬. সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সমস্ত কর্মচারীর বেতন শতকরা ১০ ভাগ কমাইতে হইবে এবং তাহার ফলে প্রতি মাসে প্রায় 4000 টাকার সঞ্চয় হইবে ;

৭. সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী হইবার দরুন সমিতির সহসভাপতি শ্রী এস. বি. সেনকে কিছুদিন আগে জামাডোবা হইতে মালকেরা কয়লাখনিতে বদলি করা হইয়াছিল। তাঁহাকে ছাঁটাই করা উচিত হয় নাই, কেননা তিনি জামাডোবা কয়লাখনির একজন প্রবীণতম কর্মচারী। পক্ষান্তরে তাঁহাকে তাঁহার আদি কর্মস্থল জামাডোবায় স্থানান্তরিত করা উচিত ছিল।

জানা যায় যে পরিচালন কর্তৃপক্ষ সংস্থাগত ব্যয়সংকোচের প্রয়োজন অনুভব করেন। আর সেখানে তাঁহার প্রায় ১৫০ জন লোক ছাঁটাই করিয়া প্রায় 4000 টাকার ব্যয়সংকোচ দেখান সেখানে সমিতির পরামর্শ এই যে যাঁহাদের দৈনিক মজুরি দশ আনা ও তাহারো কম তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন সকল কর্মচারীর বেতন শতকরা দশভাগ কমাইলে এই একই পরিমাণ অর্থ বাঁচিতে পারে। সমিতির অভিমত এই যে সংস্থাগত ব্যয় যেখানে প্রায় 40,000 টাকা, সেখানে সমিতি কর্তৃক প্রদর্শিত উপায়ে বেতন কমাইয়া সকল কর্মচারীর চাকুরি রক্ষা করা যাইতে পরে এবং সমিতির ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি মাসে কয়লার উত্তোলন সীমিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি সিফ্‌টে ছয় ঘণ্টার কাজ হিসাবে তিন সিফ্‌টের কর্মপদ্ধতি চালু রাখা যাইতে পারে।

ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে সমিতির পরামর্শ ন্যায়সংগত ও সমতাভিত্তিক এবং ইহাতে কোম্পানির উপর যেমন অতিরিক্ত বোঝা চাপিবে না তেমনই কর্মীদেরও অনেকটা স্বস্তি মিলিবে। কোম্পানির প্রস্তাবের অর্থ হইল উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাওয়া অবস্থায় কিছু লোকের অনশন মৃত্যু এবং অন্যান্যদের পূর্ণ বেতন ভোগ।

আশা করা যায় যে আপনি সমিতির এই পরামর্শ দয়া করিয়া বিবেচনা করিবেন এবং ছাটাই-এর প্রশ্নে বর্তমানে জামাডোবা কয়লাখনিতে যে অসন্তোষ চলিতেছে তাহা নিরসন করিবেন।

বাংলায় বিরোধ মিটাইতে পদত্যাগ

কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ পত্র।

আমি মনে করি না কোনো দেশপ্রেমিক কংগ্রেসসেবী বর্তমান বিরোধ শুরু হইবার পর হইতে মানসিক আনন্দ ভোগ করিয়াছেন। আমার কথা বলিতে পারি। গোড়া হইতেই আমার অবলম্বিত বিনম্রপথে আমার সাধ্যমতো বিরোধ মিটাইতে সচেষ্ট হইয়াছি। গোড়া হইতেই আমি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনটি উপায়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রথমত, ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের যথাবিধি অনুসরণ না করিয়া যাহারা নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অনিয়মানুবর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে শক্ত হাতে তাহাদের দমন করা। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের কর্মতৎপরতার সকল ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং গোষ্ঠীর মধ্যে আপস-রফা স্থাপন। তৃতীয়ত, অন্য দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে, একটি দলকে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইতে সম্মত করানো।

বিরোধ অবশ্যম্ভাবী

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে এই প্রদেশে যাহারাই কংগ্রেস সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত হইবেন, তাহাদের বিরুদ্ধে একটি দল বা গোষ্ঠী সর্বদাই থাকিবে। অন্তত, গত দশ বছর যাবৎ ইহাই ঘটিতেছে। বর্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মপরিষদের বিরুদ্ধে বিরোধ দানা বাঁধিলে উপরে বর্ণিত প্রথম দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিরোধ মীমাংসার বা উপশমের চেষ্টা হইয়াছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিয়া কোনো সমাধান পাওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ, প্রথমত, বাংলার কংগ্রেসসেবীদের এমন একটি গোষ্ঠী ছিল যাহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে যে-কোনো সম্ভাব্য সুযোগে অগ্রাহ্য করিতে বদ্ধপরিকর এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিরও

যেভাবে অনিয়মানুবর্তিতা দমন করা উচিত ছিল, তাহাতে তাহারা ব্যর্থ হয়। ঠিক একইভাবে কংগ্রেসের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আপস-রফার চেষ্টা করিয়াও কোনো মীমাংসায় আসা সম্ভব হয় নাই। স্মরণ থাকিতে পারে শ্রদ্ধায় স্মরণীয় পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে বাংলার বিরোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা আপসে সম্মত ছিলাম কিন্তু অপরপক্ষ ছিলেন না। পণ্ডিতজীর রায় প্রদানের পর আশা করা গিয়াছিল যে বিরোধের অবসান হইবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হইল না। ১৯৩০-এর মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে এবং সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কমিটি গঠনের সময় সেই বিরোধ এবং বিভেদের প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই বছর যখন কংগ্রেস ও গভর্নমেন্টের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি স্থাপিত হয়, সে সময় ভাবা গিয়াছিল আমরা একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিব। আমরা পুনরায় হতাশ হইয়াছিলাম। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। প্রথমত, জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটি গঠনের মধ্য দিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করে এবং পরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সংঘ নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বি.পি.সি.সি. খাড়া করা হয়। অতঃপর গত মে মাসে, বিগত নির্বাচনের সময় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারপর ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত বিষয়টি বিবেচনার এবং রায় দিবার জন্য একজন সালিস নিযুক্ত করেন। সালিস নিযুক্তির পর পুনরায় আশা করা গিয়াছিল যে বিরোধের বিরতি ঘটিবে। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বন্যাত্রাণ কমিটি গঠনে উদ্যত হইলে বিরোধীরা তাহার সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়া পৃথক একটি কমিটি গঠন করে। এরপরই মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত তাঁহার নির্বাচনী ইস্তাহারে করপোরেশনের কংগ্রেস কাউন্সিলারদের কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন হইতে সরিয়া গিয়া পৃথক দল গঠনের জন্য আবেদন করিলেন। সেই পৃথক দল ইতিমধ্যে গঠিত হইয়াছে এবং তাহারা ইউরোপীয় এবং মনোনীত গোষ্ঠীদের সঙ্গে খোলাখুলি মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে।

উপরে যাহা বলিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করিয়া বলিতে হয় আমরা বাংলায় কি কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের প্রয়োগে, কি আপসের মধ্য দিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হইয়াছি। আমাদের সম্মুখে ইহা জাজ্বল্যমান সত্য যে বাংলার কংগ্রেসসেবীবৃন্দ দ্বিধা-বিভক্ত এবং গভর্নমেন্ট ও আমাদের শত্রুপক্ষ এই

পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। যাহারা আজ সংগঠনের দায়িত্বে আসীন রহিয়াছেন তাঁহারা সকল দলের সহযোগিতা সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়াছেন। আমরা মনে করি বর্তমান বিরোধের জন্য দায়ী আমরা নহি, আমাদের বিরোধীরা। তবুও সাধারণ পথচারী, গড়পড়তা জনসাধারণ, খোঁজ নিতে থমকায় না দোষ কোন্ পক্ষের; সে চায় যে মূল্যেই হোক, যে ভাবেই হোক বিরোধের সমাধান। আমি যখন বলি যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইলেও বাংলা আজ বর্তমান বিরোধসমূহের অবসান চায়, আমি নিঃসংশয় যে বাংলার মন সঠিকভাবে বুঝাইতে পারিতেছি। এই প্রদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী ঐক্যের দাবি প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী বন্যায় ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছে; অপরদিকে চট্টগ্রামে আমাদের দেশবাসীগণ অমানুষিক অত্যাচার ও অশ্রুতপূর্ব লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছেন। তৃতীয়ত, আমাদের প্রায় ৮০০ সর্বোত্তম দেশবাসী দেশপ্রেমের অপরাধে এখনো বন্দীজীবন ভোগ করিতেছেন।

আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সহকর্মীগণ অবগত আছেন যে আমি কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপনের বিষয়টি তৃতীয় পন্থাটি অবলম্বন করিয়া মীমাংসার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্মপরিষদ পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছি। যদি সকল স্তরের কংগ্রেসসেবীদের সহযোগিতা না পাওয়া যায় আমার মনে প্রতিদিন এই প্রত্যয়টি দৃঢ়তর হইতেছে যে সে অবস্থায় পদাধিকারী থাকিয়া কোনো কাজের কাজ করা যাইবে না।

জাতীয় সেবার ক্ষেত্রে পদ দখল করিয়া থাকাটা বর্তমানে কাজের পক্ষে সুনিশ্চিত প্রতিবন্ধনস্বরূপ।

সভাপতিপদ ত্যাগ

হিজলি বন্দীশালার মর্মন্তুদ সংবাদ আমাকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছে তাহার ফলে তৃতীয় পন্থাটি অবলম্বনের পথে আমার যে দ্বিধাচিত্ততা ছিল তাহা চূড়ান্তভাবে দূরীভূত হইয়াছে। বন্দীশালার ভিতরে এবং বাহিরে আমাদের দেশবাসীগণ যে অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হইতেছেন তাহা আমাদের নিকট বিধাতার সতর্কবাণীস্বরূপ দেখা দিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ মিটাইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দাবি জানাইতেছে।

অতএব, আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির দায়িত্ব হইতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতেছি। সেইসঙ্গে আমি বাংলার সহকংগ্রেসসেবীগণের, যাহা-কিছু মহৎ, যাহা-কিছু উদার, তাহার নিকট আবেদন করিতেছি এবং তাহাদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে তাহারা যেন সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিরকালের জন্য বর্তমান বিরোধের অবসান ঘটাইতে অগ্রসর হন। আমি তাঁহাদের নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে আমি কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাসী এবং কাহারো বিরুদ্ধে আমি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করি না। আমি সন্তুষ্টচিত্তে একজন সাধারণ কংগ্রেসসেবীরূপে কাজ করিয়া যাইব এবং যিনিই কংগ্রেস সভাপতির পদে আসীন থাকুন-না কেন, আমার সহযোগিতা তাহার প্রতি অবশ্যই প্রসারিত হইবে। আমার আত্মত্যাগের ফলে যদি বাংলাকে বাঁচানো যায়, আমি সেই মূল্য দিতে আনন্দবোধ করিব এবং আমার দেশবাসী যদি তাহার পরিবর্তে তাহাদের হৃদয়ের কোণায় আমাকে একটু স্থান দেন, আমি যথোপযুক্তভাবের অপেক্ষাও বেশি নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করিব।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

হিজলি ও খড়্গপুরে বন্দী-নির্যাতন

হিজলি ও খড়্গপুরে নির্যাতিত বন্দীদের পরিদর্শনের পর বিবৃতি।

শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীল রায়চৌধুরী ও অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত আমি গতকাল (শুক্রবার) খড়্গপুর পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, শ্রীযুক্ত শৈলজা সেন ও শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিংহও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। আমাদের হিজলি শিবির পরিদর্শন করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা আহত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সহ আমি কতিপয় বন্দীকে খড়্গপুরের রেলওয়ে হাসপাতালে দেখিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে আমার পরিদর্শনকালে সেগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়েরও সুযোগ আমার হইয়াছিল। আমি এখন এ কথা বলিতে পারি যে কাগজগুলিতে যাহা-কিছু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বরং নিম্নগ্রামের। বন্দীদের

উপর আক্রমণ ছিল প্ররোচনাবিহীন এবং নৃশংস ধরনের। শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর সেন বীরের মতো মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং দেশ তাঁহাদিগকে চিরদিন শহীদরূপে সম্মান দেখাইবে। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত শশীন্দ্র ঘোষ গুরুতর আহত অবস্থায় রেলওয়ে হাসপাতালে আছেন। হাসপাতালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীর সেন ও শ্রীযুক্ত সবিতা রায়চৌধুরীর অবস্থা উদ্বেগজনক। হিজলি শিবিরস্থিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাজরার অবস্থাও অনুরূপ।

সকল বন্দীই অনশন ধর্মঘট করিয়াছেন এবং একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি নিযুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁহারা তাহা চালাইয়া যাইবেন। এ পর্যন্ত বন্দীদের হাসপাতালে আহতদের পরিচর্যা করিতে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু আশংকা করা যায় যে আগামীকাল (শনিবার) হইতে এই সুবিধা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সে ক্ষেত্রে আবার গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানাই যে তাঁহারা যেন নিষ্ঠুর না হন এবং বন্দীদিগকে হাসপাতালে তাঁহাদের অসুস্থ বন্ধুদের শুশ্রূষা করার অনুমতি দেন।

আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয়রূপে ব্যথিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। কারাগারে আমাদের সাথীদের কুকুর-বিড়ালের মতো হত্যা ও গুলি করা হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের কি উচিত এখনো ঝগড়া-বিবাদ করা? আসুন আমরা নিজেদের মতপার্থক্যের অবসান ঘটাইয়া শত্রুর উপস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াই। আজিকার পত্র-পত্রিকায় আমার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে এখন হইতে আমি জনগণের একজন সামান্য মাত্র সেবক রূপে তাঁহাদের সেবার জন্য যে-কোনো পদে আমার কাছে যে দাবি করা হইবে তাহা মানিয়া লইতে এবং আপ্রাণ প্রয়াসে আত্মত্যাগ করিতেও আমি প্রস্তুত থাকিব। আমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে আমার কতিপয় বন্ধু আমি সব পদ ত্যাগ করায় আমাকে ইতিমধ্যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং ইহাতে আমি যে বাংলার মানসিকতার ঠিক ব্যাখ্যা করিয়াছি আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমরা আশা করি যে আমাদের প্রচেষ্টায় বাংলা শীঘ্রই তাহার পূর্ব মর্যাদা ও গৌরব ফিরিয়া পাইবে।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

শ্রমিকদের কর্তব্য

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল শ্রমিকদের প্রতি আবেদন।

বন্ধুগণ, জি-টাউন ময়দানের সভায় গত রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর কোম্পানির কতিপয় দালাল দ্বারা যে গুণ্ডামি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে আপনাদের সকলকেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে হইবে। ইহা এখন স্পষ্ট যে শ্রীহোমিকে কারাগারে প্রেরণের পর কোম্পানি এখন চিরদিনের জন্য শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সংকট মুহূর্তে আপনারা যদি মানুষের মতো উঠিয়া না দাঁড়ান এবং নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই না করেন তাহা হইলে আপনারা চিরদিনের মতো ডুবিয়া যাইবেন।

আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য নিজেদের অস্তিত্ব ও সংগ্রাম বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আপনাদের উচিত অবিলম্বে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা :

১. আপনারা যদি সভায় গুণ্ডাদের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া থাকেন তাহা হইলে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে

২. যথাসম্ভব শীঘ্র নীচের কাজগুলি করিবার জন্য দশ হাজার টাকার একটি তহবিল সৃষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে :

   ক. আহতদের সাহায্য দানের জন্য

   খ. আদালতে মামলা চালাইবার জন্য

   গ. সাংবিধানিক উপায়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার সকল ব্যবস্থার জন্য

৩. কারখানার প্রত্যেক বিভাগে, প্রতিটি বস্তিতে এবং মহল্লায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন করিতে হইবে

৪. কোম্পানির দালালদের গুণ্ডামি ও জামশেদপুরের কারখানার অন্যান্য অসুবিধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে পরে ঘোষিতব্য কোনো-একটি দিনে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চালাইতে হইবে

৫. শ্রমিকদের অভিযোগগুলি প্রতিকারের জন্য এবং যাহারা রবিবারের সভায় গুণ্ডামির জন্য দায়ী বিশেষ করিয়া তাহাদের কর্মচ্যুতির জন্য দাবি জানাইবার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আপনারা যদি অবিলম্বে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেন তবে আপনারা স্বমর্যাদা রক্ষা করিতে এবং নিজেদের অভিযোগগুলির প্রতিকার করিতে পারিবেন। অন্যথায় আপনাদের ধনতান্ত্রিক নিয়োগকারীরা আপনাদের পরাজিত করিবেন এবং আপনারা মৃত্যুর সম্মুখীন হইবেন।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

বিবৃতি

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ জামশেদপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ উপলক্ষে বিবৃতি।

জামশেদপুরের পরিস্থিতি এমন যে তাহা জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগের দাবি রাখে। শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীমালিক হোমিকে সাফল্যের সহিত অভিযুক্ত করিয়া এবং ফেডারেশনের সব কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি সমিতিকেও ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শ্রমিকদের অভিযোগগুলি আলোচনার উদ্দেশ্যে গত রবিবার আহূত শ্রমিকদের একটি জনসভা গুণ্ডারা ভাঙিয়া দেয় এবং ত্রিশ জনেরও বেশি লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। এখন এটা এই শহরের চালু কাহিনী যে কোম্পানির দালালরাই এই গুণ্ডামি করার জন্য দায়ী এবং এই প্রসঙ্গে কোম্পানির কয়েকজন সুপরিচিত অফিসারের নামও খোলাখুলিভাবে উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রমিক সমিতির সাধারণ পরিষদ রবিবারের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য সরকারের কাছে একটি কমিটি নিয়োগের দাবি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা করা হউক বা না-হউক, এ বিষয়ে টাটার পরিচালক পর্ষদের একটা কর্তব্য আছে। কোম্পানির যদি হারাইবার মতো সুনাম থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহাদের একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা উচিত। আমি এ কথা বলিতে পারি যে যদি একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং সাক্ষীদিগকে যদি শাস্তির সম্মুখীন হইতে না হয় তাহা হইলে গত রবিবারের ঘটনা যে কোম্পানির কয়েকজন অফিসারের উদ্যোগে ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। তাহার পর হইতে অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

শহরের উপকণ্ঠে গতকাল আমার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান

করার কথা ছিল এবং গুণ্ডাদের দ্বারা আমাদের উপর আক্রমণ করার বিস্তারিত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের লোকেরা পূর্ব হইতে সতর্ক থাকায় ও আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকায় এই পরিকল্পিত আক্রমণ ঘটে নাই। আমার কাছে সংবাদ আসে যে শহরের গুণ্ডারা এখনো সক্রিয় এবং আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অধিকতর সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। ইহা না বলিলেও চলে যে কোম্পানির আচরণে আমরা মর্মাহত হইয়াছি। তাঁহারা যদি ভাবিয়া থাকেন যে গুণ্ডামির কৌশল দ্বারা শ্রমিকদের ধ্বংস করা যাইবে কিংবা আমাদের মনোবল নষ্ট করা যাইবে, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্তির কবলে পড়িয়াছেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে তাঁহারা শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মকর্তাগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর মানুষ। এবার আমি একদিনের জন্য জামশেদপুর আসিয়াছিলাম কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পর আমি অন্যান্য কর্মসূচী বাতিল করিয়া দিয়াছি এবং এখানে থাকিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। কোনো-একটি জায়গায় নিয়োগকারীরা যদি গুণ্ডামির কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্রমিকদের বিপর্যস্ত করিতে পারেন, তবে তাঁহারা সর্বত্রই এই পরীক্ষা পুনঃপ্রয়োগ করিবেন। সুতরাং আমরা এখন জীবন-মরণ প্রশ্নের সম্মুখীন এবং আমাদিগকে সকল শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে শেষ পর্যন্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে।

আমি টাটা কোম্পানিকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে তাঁহারা যেন এই-সব কৌশল আর না চালান। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন কিংবা ভবিষ্যতে করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে জনমতের আদালতের সম্মুখে জবাবদিহি করিতে হইবে। তাঁহারা এমন সব লোকের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছেন যাঁহারা ন্যায়সংগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজেদের জীবন বলি-দানেও কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতিপূর্বেই কোম্পানির দালাল ও ফরেরা নিজেদের আচরণের দ্বারা সকল বিভাগের শ্রমিকদের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে এবং কারখানার প্রতিটি বিভাগে তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সঞ্চারিত হইয়াছে। অধিকতর প্ররোচনা বিরক্তির কারণ ঘটাইয়া শিল্পে সংকটের সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে যতটা সংশ্লিষ্ট সে ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করিয়া সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি লইতে দৃঢ়সংকল্প।

বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলন

১০ অক্টোবর ১৯৩১ জগদ্দলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

আপনারা এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া আমার প্রতি যে সম্মান দেখাইয়াছেন সে-জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আজ ভারতের শ্রমিকগণ যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি কামনা করেন তাহা হইল ঐক্য। তাঁহারা যেমন দুর্বল ও নিরক্ষর তাহাতে ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যই তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সর্বত্রই চলিতেছে। ইহা সহজও বটে, কেননা ভারতের জনগণ ভুখা অবস্থায় আছেন। ধনিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর টাকা থাকায় তাঁহারা যে-কোনো উদ্দেশ্যে তাহা কাজে লাগাইতে পারেন। শ্রমিকদের মনে রাখা উচিত যে যাহারা গণ্ডগোল ও বিভেদ সৃষ্টি করিতে চায় তাহারা তাঁহাদের শত্রু এবং তাহারা ধনিক-শ্রেণীর দালাল হিসাবে কাজ করে। কিছুক্ষণ পূর্বেই কিছুটা গণ্ডগোল হইয়াছিল কিন্তু তাহা অবহেলা করাই তাঁহাদের উচিত। বরং যাহারা ধনিক-শ্রেণীর চররূপে কাজ করে শ্রমিকদের উচিত বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাদের দলে টানা, কেননা তাহারাও তো স্বদেশবাসী।

পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিকেরা সংগঠিত হইয়া উঠিতেছে। রাশিয়ায় পুরাপুরি শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে ধনতন্ত্রবাদীদের অস্তিত্ব নাই। ইংল্যান্ডও সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভারত ও সেই পথে যাইবে না কেন তাহার কোনো কারণ নাই। সম্পদ উৎপাদনকারীদের সম্মুখে ধনিক-শ্রেণীকে তাঁহাদের গর্বিত শির নত করিতে হইবে। অন্যথায় তাঁহারা বিপন্ন হইবেন।

ভারতের শ্রমিকদের দাবি সমতাভিত্তিক, ন্যায়সংগত ও যুক্তিপূর্ণ। তাহারা মানবসমাজের প্রাথমিক অধিকার দাবি করেন অর্থাৎ পূর্ণ উদরে আহার; বস্ত্র, বাসস্থান ও জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক অন্যান্য সুযোগের দাবি করেন। তাঁহারা নিজেদের ঘরের দায়িত্ব অর্থাৎ নিজেদের দেশের সরকার পরিচালনায় দায়িত্ব লইতে চান। ব্রিটিশ শ্রমিকরা যদি নিজেদের দেশে এই অধিকার ভোগ করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতীয় শ্রমিকরাও কেন সেই অধিকার পাইবেন না?

ভারতীয় শ্রমিক অপরকে তাহার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চান না

বলিয়া তাহার নিজের ন্যায়সংগত দাবি মানিয়া লওয়া হইলে অপর কাহারো সহিত তাহার বিপদের কোনো অবকাশ থাকিবে না। ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ বর্তমান তাহার জন্য পুরাপুরি দায়ী ধনিকদের অনমনীয় মনোভাব। শ্রমিকদের দুর্বল করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ধনিকদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপকৌশলের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করিয়া দিতেছি।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকস্বার্থ রক্ষার সংগ্রামে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা। এই সংস্থা নিজের শক্তির জন্য দেশের অন্যান্য ইউ-নিয়নের উপর নির্ভরশীল এবং সকল ইউনিয়ন শক্তিশালী না হইলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তোলা সম্ভব নয়। যদি দুইলক্ষ চটকল কর্মীকে সংঘবদ্ধ করা যায় এবং একটি বলিষ্ঠ সংগঠনের আওতায় তাঁহাদের আনা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের অভিযোগগুলির প্রতিকার সহজসাধ্য হয়। যতদিন তাঁহারা দুর্বল থাকিবেন চটকল মালিকেরা তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিবেন না। তাঁহাদের আমি ধর্মঘট করিতে বলি না, কেননা ধর্মঘট হইল শেষ ব্রহ্মাস্ত্র। কিন্তু তাঁহারা একবার সংঘবদ্ধ হইলে ধর্মঘট না করিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ অভিযোগের প্রতিকার সহজে করিতে পারিবেন। অন্যান্য দেশে শ্রমিকেরা তাঁহাদের ইউনিয়নের সদস্য না হইলে কাহাকেও ধনিকশ্রেণী নিয়োগ করিতে পারিবেন না এরূপ শর্ত আরোপ করিতে পারেন। শ্রমিকশ্রেণী যথেষ্ট শক্তিশালী হইলে ভারতেও তাঁহারা সহজে অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করিতে পারেন।

বেকার সমস্যা প্রশ্নের সমাধান কিভাবে সম্ভব

অন্যান্য দেশে বেকারদের ভাতা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রকে ইহার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং বেকার ভাতার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারকে বেশি করিয়া ধনিক-শ্রেণীর উপর কর নির্ধারণ করিতে হয়। সেইজন্য তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা যদি কারখানা বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে অন্যভাবে তাঁহাদের টাকা দিতে হইবে। সুতরাং ভারতের ধনিকশ্রেণীর মতো অন্যান্য দেশের ধনিক শ্রেণী এত সহজে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করেন না। যখন কাজ থাকে না তখন যাহাতে তাঁহারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন এরূপ একটা ব্যবস্থা থাকা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রমিকদের জন্য লভ্যাংশ নয়

যুদ্ধের সময় চটকলগুলি শতকরা ৪০০ ভাগ এবং কথনো বা শতকরা প্রায় ৫০০ ভাগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই বিরাট লাভের একাংশও শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল কি? উল্লেখ করার মতো কোনো কল্যাণ-বিভাগ আছে কি? এখন চটকলগুলি ক্ষতির অভিযোগ তোলে। কিন্তু কি ক্ষতি? একেবারে অতি সম্প্রতি কতকগুলি চটকল শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছে। শতকরা ৪০০ ভাগ হইতে শতকরা ২৫ ভাগে লাভ কমিয়া যাওয়া নিঃসন্দেহে একটা বড়ো পতন। কিন্তু পৃথিবীর কতগুলি শিল্প শতকরা ২৫ ভাগ লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারে? চটকলগুলি দরিদ্র শ্রমিকদের এই ২৫ ভাগের একাংশ দিবেন কি? শতকরা ৪০০ ভাগ লাভের টাকায় চটকলগুলি ইতিমধ্যে বিরাট সংরক্ষিত ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে। এখন তাহারা অন্তত এই বিশাল সম্পদের একাংশ উদ্গার করিয়া বাহির করুক। চটকলগুলি কি তাহা করিবে? তাহারা তাহা করিবে না— যতক্ষণ না তাহারা দেখে কর্মীরা সংঘবদ্ধ হইয়াছেন।

চটকলগুলি আজও কেন লাভে কাজ করিতে পারিবে না তাহার কোনো কারণ নাই। সস্তা পাট ও সস্তা শ্রমিক বিরাট লাভের কারণ এবং এই দুইটি উপাদানই তো বিদ্যমান। কিন্তু এখন লভ্যাংশ বিভাজনের দিন আসিয়াছে!

শ্রমিকদের কষ্ট

দুই সিফ্‌টের জায়গায় এক সিফ্‌ট কাজ চালু করা হইয়াছে। ৬০ ঘণ্টার সপ্তাহ এবং মাসের মধ্যে এক সপ্তাহ চটকলগুলি বন্ধ রাখা হইতেছে। ইহার অর্থ হইল দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর ভয়ানক কষ্ট। ইহা ছাড়া, সাম্প্রতিক পরিবর্তনাদির ফলে প্রায় ৮০ হাজার কর্মী বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রমিকদের কে সাহায্য করিতে পারে? শ্রমিকরা নিজেরা নিজেদের সাহায্য না করিলে কেহই পারে না। সময় আসিতেছে যখন শ্রমিকরা নিজেরাই শ্রম-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন কিন্তু তাহা যে পর্যন্ত না হয় সে পর্যন্ত বর্তমান বক্তার মতো অ-শ্রমিক ব্যক্তিদের আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিতে হইবে। সম্প্রতি শ্রমিকদের বেতন, বোনাস প্রভৃতি বিশেষভাবে কমানো হইয়াছে এবং অনেকে সপ্তাহে ২৷৩ টাকার মতো কম টাকাও পান। এই টাকায় কি একটা সংসার চলে?

উপসংহারে আমি শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানাই, আপনারা সংঘবদ্ধ হউন এবং বিভেদের সূত্রগুলি নির্মূল করুন। আপনারা একবার একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইলে এবং পরিষ্কার পদ্ধতিতে সংগ্রাম শুরু করিলে, পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। আপনাদের দাবি ন্যায়সংগত এবং আপনারা যদি কঠোরভাবে ও বিশুদ্ধ উপায়ে সংগ্রাম করেন তাহা হইলে আপনারা জয়ী হইবেন।

বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলন : একটি বিবরণ

১৩ অক্টোবর ১৯৩১ বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে 'বঙ্গবাণী'র প্রতিনিধির নিকট প্রদত্ত বিবৃতি।

বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী-সহ আমি রবিবার ১১ অক্টোবর অপরাহ্নে জগদ্দল অভিমুখে রওনা হই। আমি জগদ্দল থানার সীমানায় পা দিই নাই, তবে নোয়াপাড়া থানার এলাকার মধ্যে পা দিয়াছি— এমন সময় কয়েকজন পুলিশ পিকেট আসিয়া আমাদের গাড়ি থামায়। সেই স্থানে কতকগুলি গোরুর গাড়ি দিয়া রাস্তা বন্ধ করা হইয়াছিল। পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে, আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিতে তাঁহার উপর হুকুম আছে। যদি আমি তাহা না যাই তবে তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া নোয়াপাড়া থানায় লইয়া যাইবেন। গাড়ি হইতে নামিবার পূর্বে আমি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলি যে তিনি বে-আইনী কাজ করিতেছেন। ইহার জন্য তিনিই দায়ী হইবেন। কেননা আমি জগদ্দল এলাকার মধ্যে প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার কোনো ক্ষমতা নাই— তিনি উপরওয়ালার হুকুম অনুযায়ী কাজ করিতেছেন। আমি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলে উক্ত পুলিশ কর্মচারী (তিনি নিজেকে নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বলিয়া পরিচয় দেন) আমাকে বলেন যে, আমি যদি হাঁটিয়া না যাইতে চাই তবে মোটরেই থানায় যাইতে পারি। তিনি আমাকে হেপাজতে লইবার জন্য দুইজন কনস্টেবল পাঠান। এই কনস্টেবলদ্বয় গাড়িতে ওঠে।

(গাড়িখানি শ্রীযুত গোস্বামীর) অতঃপর আমি গাড়িতে উঠিয়া অপরাহ্ন ৫টার সময় নোয়াপাড়া থানায় পেঁছাই।

নোয়াপাড়া থানায়

থানায় পেঁীছিবার পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সকল উর্ধ্বতন কর্মচারীকে টেলিফোনে খবর দেন। কিন্তু বহু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা আসিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা কি সাতটার সময় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়ার্থ, অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিণ্টেন্ডেন্ট মিঃ বেমরোজ এবং ইন্সপেক্টর মুখার্জি তথায় আগমন করেন। প্রথম দুই ব্যক্তির পোশাক দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা সোজা ক্লাব হইতে আসিয়াছেন। (আমি পরেও জানিতে পারি যে, তাঁহারা ক্লাবেই ছিলেন, সেইখানেই তাঁহাদিগকে ফোন করা হইয়াছিল)। শেষোক্ত কর্মচারী স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি ফুটবলের মাঠ হইতে আসিয়াছেন।

শান্তিভঙ্গের নমুনা

কাজেই দেখা যাইতেছে যে স্থানীয় তিনজন উর্ধ্বতন কর্মচারী ঠিক সেই সময়েই বেশ আরামে খেলাধুলায় রত ছিলেন—যে সময়ে তাঁহাদেরই মতানুসারে গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশংকা উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই আশংকার জন্য পাটকল শ্রমিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন নিষিদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং আমাকে জগদ্দল থানার এলাকায় প্রবেশ করিতে বারণ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করিতে হইয়াছিল। অবশ্য জগদ্দল এবং নিকটবর্তী রেল স্টেশনগুলিতে সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র পুলিশের বিশাল সমাবেশ ঘটানো হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবিকই যদি তথায় শান্তিভঙ্গের আশংকা থাকিত তাহা হইলে তিনজন স্থানীয় উর্ধ্বতন কর্মচারী জগদ্দল থানার সীমানা হইতে ১০ মাইল দূরবর্তী ব্যারাকপুর শহরে খেলায় ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অপরাহ্ন সাড়ে-চারটা পর্যন্ত ব্যারাকপুরে তাঁহার বাংলোয় ছিলেন। সাড়ে-চারটার সময় তিনি সোজা ক্লাবে চলিয়া যান এবং পূর্বেই বলিয়াছি— সাড়ে-ছয়টা কি সাতটার পূর্বে তিনি নোয়াপাড়া থানায় আসেন নাই। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রবিবার সকাল দশটার পূর্বে শনিবারের পাটকল শ্রমিক সম্মেলনের কথা কিছুই শোনেন নাই। তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন

যে, শনিবার সন্ধ্যায় সম্মেলনে যদি কোনো গোলমাল হইত তবে সে সংবাদ তাঁহাকে জানানো হইত।

সুর নরম

নোয়াপাড়া থানার ইন্সপেক্টরকে আমি যে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হয় কিছু ভালো ফল ফলিয়াছে; মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রবিবার সন্ধ্যায় থানায় আমাকে বলেন যে, আমি যদি জগদ্দল না যাইয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দেই তবে তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। উত্তরে আমি তাঁহাকে বলি যে, ফলাফল যাহাই হউক-না কেন— আমি তাঁহাকে কিম্বা কোনো সরকারী কর্মচারীকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কোনোরূপ আশ্বাস দিতে পারি না; আমাকে ছাড়িয়া দিলেই আমি যত শীঘ্র সম্ভব জগদ্দল অভিমুখে রওনা হইব। তাহাতে তিনি বলেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি আমাকে মুক্তি দিতে পারেন না; কাজেই আমাকে থানায় পুলিশের হেপাজতে থাকিতে হইবে।

বিছানা ও আহার বন্ধ

রবিবার রাত্রে উপর হইতে নির্দেশ আসে যে আমি যদি কলিকাতায় ফিরিয়া না যাই তবে আমাকে বিছানা বা আহার দিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই আমি উহা পাইয়াছিলাম। সোমবার প্রাতে পুনরায় এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। ইন্সপেক্টর আমাকে বলেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অনুসারে আমাকে কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিম্বা কোনো খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হইবে না। উত্তরে আমি তাঁহাকে বলি যে, খাদ্য এবং পানীয় না পাইলে আমার কিছুই আসিয়া যাইবে না। সোমবার সমস্ত দিন এবং দুপুর রাত্রি পর্যন্ত (একবার মাত্র আমার ভ্রাতার সহিত ব্যতীত) আমাকে কাহারো সহিত দেখা করিতে কিম্বা আমাকে কোনো খাদ্য বা পানীয় দেওয়া হয় নাই। শুধু প্রাতে এক পেয়ালা চা দেওয়া হইয়াছিল। উহা দেওয়া হইয়াছিল আমাকে আহার এবং জল না দিবার নির্দেশ থানায় আসার পূর্বে।

অপ্রত্যাশিত মুক্তি

সোমবার সারাদিন বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। কেবল সারাদিন ধরিয়া এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত দলে দলে দর্শকগণ থানার দিকে

আসিতে থাকে। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী আমাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তোলেন। তিনি বলেন যে, উপরওয়ালার হুকুম অনুযায়ী তিনি আমার জন্য একখানি ট্যাক্সি আনিয়াছেন এবং আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। আমি তাঁহাকে বলি যে, রবিবার রাত্রে এবং সোমবার আমি কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছি যে, আমি আমার ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্বন্ধে কাহাকেও কোনোরূপ আশ্বাস দিব না, আমাকে ছাড়িয়া দিলেই আমি যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিব এবং আমাকে যদি কলিকাতায় যাইতে বাধ্য করা হয়, তবে আমি তাহা অস্বীকার করিব। আমি তাঁহাকে আরো বলি যে, আমি মুক্তি পাইবার পর তিনি আমাকে কোনো বিশেষ স্থানে যাইতে বাধ্য করিতে পারেন না। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী টেলিফোন-যোগে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ করেন। অবশেষে তিনি আমাকে বলেন যে আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারি— এজন্য আমার জন্য একখানি ট্যাক্সি আনা হইয়াছে। উত্তরে তাঁহাকে আমি বলি যে, আমি তাঁহাদের দেওয়া ট্যাক্সিতে উঠিব না, কারণ উক্ত ট্যাক্সিচালক আমার নির্দেশ অনুসারে গাড়ি না-ও চালাইতে পারে কাজেই আমি জেদ করিতে থাকি যে, আমি থানা ত্যাগ করিবার পূর্বে আমার নিজের গাড়ি তথায় আনিতে হইবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমতি লইয়া আমার বাড়িতে গাড়ি পাঠাইবার জন্য টেলিফোন করেন। দুপুর রাত্রের পর গাড়ি আসে এবং ৩১ ঘণ্টা বে-আইনীভাবে নোয়াপাড়া থানায় আটক থাকিবার পর আমি মুক্তি পাইয়া থানা পরিত্যাগ করি।

বে আইনী নিষেধাজ্ঞা

আমি জানি, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাদের সম্মেলনটি ভাঙিয়া দিবার জন্য তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ব্যর্থকাম হইয়াছে তাহারা রবিবার প্রাতে কোনো কোনো কাগজে (যথা— 'স্টেটসম্যান', 'অ্যাডভান্স' ইত্যাদি) সম্মেলন সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ বাহির করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। আমরা যখন এই-সমস্ত মিথ্যা সংবাদ পাঠ করি তখনই আরো কিছু দুষ্কার্যের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সম্ভবত, এই-সমস্ত দুষ্কৃতকারী মিলওয়ালাদের সাহায্য পাইয়াছিল এবং কোনোপ্রকার সরকারী কর্মচারী দ্বারা ১৪৪ ধারা জারী করাইতে পারিয়াছিল। অথচ এই কর্মচারী নিজেই স্বীকার করিয়াছেন

যে, রবিবার সকাল ১০টার পূর্বে তিনি পাটকল শ্রমিক সম্মেলনের কথা কিছুই জানিতেন না। আমি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিয়াছিলাম যে, বাস্তবিকই যদি তাঁহার মনে কোনো গোলমালের আশংকা থাকে তবে তাঁহার উচিত ছিল দুষ্কৃতকারীদেরই দমন করা। যাঁহারা শান্তিপূর্ণভাবে সভা করিতে চান তাঁহাদিগকে নহে। আমি তাঁহাকে আরো বলিয়াছিলাম যে, কয়েকজন দুষ্কৃতকারীর চেষ্টা সত্ত্বেও আমি সম্মেলনে কোনো গোলমালের আশংকা করি নাই— সাম্প্রদায়িকতার যে বিভীষিকার কথা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্মচারীগণ এত উৎসাহের সহিত ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে উত্তরে বলি যে সাম্প্রদায়িক গোলমালের সর্বোত্তম প্রতিষেধক হইল শ্রমিক সম্মিলনী; কেননা এইরূপ সম্মেলন এমন একটি স্থান যেখানে সকল দল এবং সকল সম্প্রদায়ই ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। ১৪৪ ধারা জারীর সমগ্র কাহিনী যদি বিবৃত করা যায় তবে তাহাতে অনেক মজার বিষয়ই পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা এখন নহে— পরে। বর্তমানে বলিবার বিষয়— আমি ব্যক্তিগতভাবে যে অশান্তি ভোগ করিয়াছি তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমার এই-সমস্ত ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য নহে। যে বিষয়টি আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই তাহা এই যে শ্রমিকদের এই সম্মিলনীতে স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা বাধা দেয় নাই (সেখানে তাহাদের যথার্থ প্রভাব প্রতিপত্তি নাই)। বাধা দিয়াছিল সেখানকার প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারীবৃন্দ, স্বার্থান্বেষীদের সুবিধাকল্পে এই-সব ক্ষমতা প্রযুক্ত হইয়াছিল।

টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল

শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বিবৃতি।

গত কিছুদিন ধরিয়া আমরা পরিচালন কর্তৃপক্ষের নিকট জামশেদপুরের শ্রমিকদের পুরানো অভিযোগ ও দাবিগুলি তুলিয়া ধরিতেছি। রবিবার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ জেনারেল ম্যানেজারের সহিত আমাদের একটি বৈঠক হইয়াছিল এবং তাহাতে কতকগুলি অভিযোগ ও দাবি লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যানেজারের সহিত আমার আরো একদফা আলোচনা হয় এবং সে সময় নিম্নলিখিত অভিযোগ ও দাবি-

গুলি পুনরালোচিত হয়। লিখিতভাবে একটি পূর্ণ প্রতিলিপিও দাখিল করা হয়। রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর সেইদিন সকালে বোম্বাই হইতে আগত ডিরেক্টর শ্রী এ. আর. দালালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের সময় আমি তাঁহার কাছে কয়েকটি অভিযোগ তুলিয়া ধরি। পরের দিন আবার শ্রীদালালের সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয় এবং তাহাতে কমরেড নাইডু, মৈত্র এবং মণি ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পেশ করা অভিযোগ ও দাবির তালিকা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করি। অন্য একটি প্রশ্ন লইয়াও শ্রীদালালের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সে প্রশ্নটি হইল ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এর 'জি' টাউন ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সম্বন্ধে তদন্ত বিষয়ক।

আমরা যে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি তাহার ফলাফল কী হইবে তাহা এখনই বলা যায় না। এটা বহুলাংশে নির্ভর করিবে শ্রমিকদের নিজেদের শক্তি ও সংহতির উপর। যাহা হউক, আমরা আশা করি যে কিছুটা ভালো ফল পাওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে সাধারণ অফিসে কাজের সময় সকাল ৯-৩০ মিনিট হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আধ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় থাকিবে। বহুদিনের বিক্ষোভ ও প্রয়াসের ফলে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসিয়াছে।

শ্রমিকদের অভিযান ও দাবি

১. বেতন বিল হইতে সদস্য চাঁদা সংগ্রহ পুনঃপ্রবর্তন।

২. বার মিলের যে-সব শ্রমিকের বাধ্যতামূলক কর্মচ্ছেদ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে নিজের নিজের হারে কাজে ফিরাইয়া লইতে হইবে। এবিষয়ে স্যার পি. গিনওয়ালা এবং জেনারেল ম্যানেজার ৩১ মার্চ ও ৭ এপ্রিল ১৯৩১ যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তদনুযায়ী এ দাবি। শ্রমিকরা যে সময় কর্মহীন ছিলেন সে সময়ের বাড়ি ভাড়া মকুব করিতে হইবে। সেপ্টেম্বর মাস হইতে তাঁহাদিগকে বেতন দিতে হইবে, কেননা তাঁহাদের বলা হইয়াছিল যে মিল সেপ্টেম্বরে কাজ আরম্ভ করিবে।

৩. যে সময়ের জন্য নূতন রেল মিল, নূতন ফিনিসিং মিল, প্লেট মিল ও শিপিং ডিপার্টমেন্টের কর্মীদের লে-অফ করিয়া রাখা হইয়াছিল সে সময়ের জন্য তাঁহাদের পুরা বেতন দিতে হইবে।

৪. বাজে অজুহাতে যে-সব কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে ছাঁটাই করা হইয়াছে তাঁহাদের পুনর্বহাল করিতে হইবে।

৫. যে-সব কর্মীর মজুরির হার বিনা যুক্তিতে কমানো হইয়াছিল তাঁহাদের পুরানো হারে মজুরি দিতে হইবে।

৬. ভবিষ্যতে মজুরি কমানো চলিবে না।

৭. বাজে অছিলায় ও পূর্বে যথোচিত তদন্ত না করিয়া সাসপেন্ড করা এবং অন্যান্য শাস্তি দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষ যথা-সম্ভব শীঘ্র এই জাতীয় কেস পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৮. বাধ্যতামূলক ছুটির ব্যবস্থা অবলম্বন চলিবে না।

৯. গেটগুলিতে শ্রমিকদের চলাফেরার উপর হইতে সব অন্যায় বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. পর্যায়ক্রমে যে-সব ছুটির দিন থাকে তাহার জন্য পুরা বেতন দিতে হইবে।

১১. স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীসহ দৈনিক ও সাপ্তাহিক মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধাগুলি সংশোধন করিতে হইবে এবং যতটা সম্ভব মাসিক বেতনভোগী কর্মচারীদের সমপর্যায়ভুক্ত করিতে হইবে।

১২. চিকিৎসার জন্য অর্ধেক মাহিনায় ছুটি দিতে হইবে।

১৩. বছরের পর বছর ধরিয়া যে গ্র্যাচুইটি ও পেনসন পরিকল্প চালু করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি চালু করিতে হইবে।

১৪. ১৯২০-র বিরোধ মীমাংসার সময় যে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কেননা কর্মে নিযুক্ত থাকার সময় শ্রমিকদের নিকট হইতে তাহা আদায় না করা হইলেও কর্মচ্যুতির সময় তাহা আদায় করা হইতেছে।

১৫. কর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলের কম বেতন পুনরায় চালু করিতে হইবে।

১৬. যে-সব বিভাগে বর্তমানে বিভাগীয় উৎপাদন-বোনাস দেওয়া হয় না তাহা দিতে হইবে।

১৭. জমি ও বাসগৃহের জন্য খাজনা ও ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১৮. যে-সব কর্মী কোনো গ্রেডে কাজ করিয়া সেই গ্রেডের সর্বনিম্ন বেতন পাইতেছেন না তাঁহাদিগকে তাহা দিতে হইবে এবং গ্রেড অনুসারে বিনা বাধায় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯. গোলখালি, আর এন টাইপ, রামদাস ভট্টাচার্য এবং সি. টাউনের এক-ঘরের আবাসগুলিতে অবিলম্বে উন্নয়নের কাজ শুরু করিতে হইবে।

২০. যে-সব পথ দিয়া শ্রমিকরা চলাফেরা করেন এবং যে-সব বস্তিতে তাঁহারা বসবাস করেন সেগুলিতে যথোচিত আলোক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১. যে-সব স্থানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই সে-সব স্থানে জল-সরবরাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২২. বর্তমানে এক বৎসরের চাকুরি হইলে মাতৃকল্যাণের সুযোগ পাওয়া যায়; তাহা কমাইয়া ছয় মাস করিতে হইবে।

২৩. ২২-৭-৩০ তারিখে পেশ করা করণিকদের ও সময়-রক্ষকদের অভিযোগ সম্বলিত স্মারকলিপিটি, বিশেষ করিয়া সাধারণ সিফ্‌টটিকে অবিচ্ছিন্ন রাখার প্রশ্নটি যথোচিতভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

২৪. সময়-রক্ষা বিভাগে সাধারণ ত্রাণকারী দলের প্রশ্নটি অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া ইহার অবসান ঘটাইতে হইবে।

২৫. স্কুল কমিটি, কল্যাণ কমিটি এবং অন্যান্য এই জাতীয় সাধারণ কল্যাণ কমিটিগুলিতে শ্রমিক সংস্থার কার্যকর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৭ অক্টোবর ১৯৩১

শক্তির আরাধনা : যুগের দাবি

১৮ অক্টোবর ১৯৩১ জয়নগর মজিলপুর ব্যায়াম সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ।

ইতিমধ্যে রাত্রি অনেক হইয়াছে বলিয়া আমি দীর্ঘসময় আপনাদের আটকাইয়া রাখিতে চাই না। আমি আশা করি যে সমিতি এতক্ষণ ধরিয়া দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়া আপনাদের যে আনন্দ দিয়াছেন, তাহা আপনারা উপভোগ করিয়াছেন। এখনো আরো কিছু ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন বাকি আছে

এবং আমার বক্তৃতা শেষ হইলে আবার সেগুলি দেখানো হইবে। এই পূজার দিনে আমরা এখানে চমৎকার শক্তি-প্রদর্শনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা দেখিতে সমবেত হইয়াছি ; কিন্তু আপনাদের মনে যেন এ ধারণা না জন্মায় যে এতক্ষণ আপনারা সার্কাস দলের খেলা দেখিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে সমিতির সংগঠকগণ এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা বাঙালীরা দৈহিক শক্তিতে হীন এবং ইহার চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয়। দুর্গাপূজা হিন্দুদের পালিত উৎসবগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় কেন ? হিন্দুরা তাঁহাদের দেবদেবীদের এক বৎসরে তেরোবার পূজা করেন কেন ? যে উদ্দেশ্য হইতে পূজার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা কি আপনারা জানেন ? ইহার উদ্ভব হইয়াছিল দেহ ও মনের শক্তি লাভের জন্য স্বর্গের-জননী শক্তিকে আহ্বান করা হইবে। দেবী দুর্গা হইলেন জগৎজননী আদ্যা-শক্তির প্রতীক। প্রতি বারো মাসের শেষে যে শক্তির পুনর্নবীকরণ হয় তাহা পাইবার জন্য আমরা প্রতিবৎসর তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি।

বর্তমান যুগের একটি শুভ লক্ষণ এই যে আমাদের যুবশক্তি জাতির এই পরম প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। বাঙালীদের উপর যে অভিশাপ নামিয়া আসিয়াছিল তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ গ্রামে ও শহরে এই জাতীয় সমিতির কাজ শুরু হইয়াছে।

এই যে-সকল তরুণ এই ব্যায়াম প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এমন চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী যে তাঁহাদের এই মূল্যবান সম্পদের জন্য আমরা তাঁহাদের ঈর্ষা না করিয়া পারি না। আমার বাল্যকালে আমি গ্রীক-বীরদের ছবি দেখিয়াছিলাম। সেই-সব ছবির দেহগুলি ছিল কেমন সুপরি-স্ফুট ও সুষম ! আমি এইরূপ দেহসৌষ্ঠব আগে দেখিয়াছিলাম এবং আজ আমি এই তরুণদের মধ্যে তাহাই দেখিতেছি। কিন্তু আপনারা কি বলিতে চান যে তাঁহারা নিজে কোনো প্রয়াস না করিয়া এইরূপ ঈর্ষণীয় স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়াছেন ? নিশ্চয়ই নয়। আপনারা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনারা জানিতে পারিবেন যে তাঁহাদের যাহা আছে তাহা অর্জনের জন্য তাঁহাদের সর্বোত্তম উদ্যোগ তাঁহারা প্রয়োগ করিয়াছেন এবং চরম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহা ছেলেখেলা নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় সহ্যশক্তি, ধৈর্য ও একাগ্রতার বিপুল শক্তি। তাঁহারা অনেক সময় ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাহা

পাইবার আগ্রহ তাঁহাদের ছিল তাহা তাঁহারা পাইয়াছেন। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের করিতে হইয়াছিল। আপনারা সম্ভবত হঠযোগের কথা জানেন। সেটা কি? তাহা অধ্যবসায়ের শক্তির আহ্বান ও চর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের দেহ গঠনের জন্য যে বস্তুটির সর্বাধিক প্রয়োজন তাহা হইল সৎ নৈতিক চরিত্র। আপনি চরিত্রবান না হইলে দৈহিক শক্তিরও অধিকারী হইতে পারেন না। সৎ নৈতিক চরিত্রের দ্বারা সমর্থিত না হইলে স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় ভাঙিয়া পরে।

বিরোধিতা প্রতিরোধ করুন

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এমন তরুণদের প্রয়োজন যাঁহারা অসংকোচে বিপদের সম্মুখীন হইবেন। বাঙালীদের যেরূপ সাধারণভাবে ভেতো বাঙালী বলা হয় তাহারা যে সেরূপ নয়, বিশ্বের দরবারে ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন এরূপ যুবশক্তি আমরা চাই। এইজনাই আমাদের যুবশক্তিকে দেহ ও মনের শক্তি চর্চায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আমরা সভা ও সমিতি চাই। কিন্তু এ বিষয়ে তরুণদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য স্থান হইতে তাহাদের সাহায্য প্রত্যাখান করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে বিরোধিতার, বিশেষ করিয়া দেশের সরকারের নিকট হইতে। যখনই আমাদের যুবকদিগকে স্বাস্থ্য ও শক্তিতে বৃদ্ধি পাইতে দেখা যাইবে তখনই দেশের সরকারের তীক্ষ্ম চক্ষু তাঁহাদের উপর নজর রাখিতে থাকিবে। তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের অভিভাবকদের নাম, তাঁহাদের বাসস্থান টুকিয়া লওয়া হইবে এবং এইরূপ চর্চা হইতে তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হইবে। তবু তাঁহারা অটল থাকিলে আসিবে অর্ডিনান্স ও গৃহবন্দী করার ব্যবস্থা। আমাদের নিজেদের দেশে আমাদের অবস্থা এরূপ দাসত্বপূর্ণ ও হীন যে দেহসৌষ্ঠবে বাড়িয়া ওঠা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। কাজেই আমাদের তরুণদের তীব্র বিরোধিতার মুখে কাজ করিতে হইবে।

খারাপ ধারণা

সরকার যাহা খুশি করিতে চান করুন। কিন্তু আমি স্থানীয় জনগণকে এবং এই-সব উৎসাহী তরুণের অভিভাবকগণকে অনুরোধ জানাই যে তাঁহারা যেন ইঁহাদের সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করেন। একটা সময় ছিল যখন একটি

পরিবারের কোনো ছেলে যদি দুর্ভাগ্যবশত মোটা হইত কিংবা দৈহিক শক্তি-সম্পন্ন হইত তাহা হইলে তাহাকে ঘৃণা করা হইত এবং তাহার অভিভাবকেরা আশংকা করিতেন যে সে অকাজের হইবে। এখন অবশ্য এই ধরনের ধারণা খুব কমই আছে। কিন্তু আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে বইয়ের জন্য নিজের স্বাস্থ্য অবহেলা করিয়া এবং সেই পথে জীবনভর দুর্দশা বরণ করিয়া কি লাভ? ধরুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উজ্জ্বলতম রত্নের কথা। তাঁহাদের অধিকাংশ মেডেল ও সম্মান লাভ করার পর ক্ষয়রোগের স্বীকার হন এবং অল্প বয়সে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাঁহারা দেশেরও কোনো কাজে লাগেন না, নিজেদের পিতামাতাকেও সান্ত্বনা দেন না। না, এ ধরনের ধারণা পুরাপুরি দূর করিতে হইবে। দেহ গঠনের ব্যাপারে আমাদের যুবশক্তিকে সাহায্যদানে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি রাখিলে চলিবে না। এই-সব দুর্বিনীত ও দুঃসাহসী ছেলেদিগকে অভিভাবকেরা যেন ঘৃণা না করেন।

তুরস্কের উদাহরণ: একমাত্র যুবকেরাই মুক্তি আনে

আমরা যদি ইতিহাসের পাতা উলটাই তাহা হইলে দেখিব যে সকল দেশের দুঃসাহসী ও দুর্বিনীত যুবকরাই তাঁহাদের নিজেদের দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিয়াছেন। তুরস্কের উদাহরণই গ্রহণ করুন। তুর্কীদের আগে বলা হইত "ইউরোপের অসুস্থ মানুষ", কেননা বলিতে গেলে তাঁহাদের চরিত্রে শৌর্য, উদ্যোগ এবং সচেতন অনুভূতির অভাব ছিল। কিন্তু একদল তরুণ, যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে খলিফা তাঁহাদের কোনো সাহায্য করিবেন না, তাঁহারা স্বদেশের মুক্তির জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন এবং যে অভিশাপ দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহা দূর করিতে তাঁহারা সক্ষম হইয়াছিলেন। কামাল পাশার নেতৃত্বে যে-সব গুণ একটি সুস্থ ও বীর্যবান জাতি গঠনে সহায়তা করে তাঁহারা সেই-সব গুণ চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনিয়াছিলেন কিংবা বলা যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তুর্কীরা এখন যে-কোনো ইউরোপীয় জাতির পার্শ্বে দাঁড়াইতে সক্ষম।

এখন ভারতের এই ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপারটাই বা কি? কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল? ইরোপের উজ্জ্বলতম পণ্ডিত ব্যক্তিরা? না, তাহা নয়। একজন দুর্বিনীত ও পর্যুদস্ত যুবক যিনি পিতামাতার ভারস্বরূপ

হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে দুর্দমতার জন্য দেশ হইতে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কে ছিলেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তিনি ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তিনি যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি লর্ড ছিলেন না। তিনি ছিলেন শুধু ক্লাইভ। কিন্তু তাঁহার সত্তা ছিল অন্যান্য অনেক প্রশংসনীয় গুণ দ্বারা সমর্থিত দুঃসাহসিক মনোবৃত্তিতে পূর্ণ। এই-সব গুণের মধ্যে ছিল স্থৈর্য, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি এবং এই-সব গুণই তাঁহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং, ইহা আপনাদের কাছে স্পষ্ট যে দৈহিক শক্তি ও দুঃসাহসিকতার প্রতি প্রীতি আর এখন নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রতি জাতির প্রতিটি তরুণের কাছে এগুলি এখন সর্বাপেক্ষা লোভনীয় সম্পদ। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সর্বদা মনে রাখিতে বলি যে পুনরুত্থারের পূর্বে আমাদের বর্তমান অবস্থা অন্য কোনো জাতির অপেক্ষা উন্নততর ছিল না; একমাত্র তফাত ছিল এই যে আমাদের অপেক্ষা তাহাদের স্বাধীনতার পরিমাণ ছিল বেশি।

একতাই শক্তি

অন্য যে বস্তুটির আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন তাহা হইল একসঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা। একতাই শক্তি এবং আমরা যতদিন একসঙ্গে কাজ করা না শিখিব ততদিন আমরা প্রয়োজনীয় কোনো কিছু করিতে পারিব না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন যে আমরা ভারতবাসীরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং সেইজন্য আমরা ভালো কিংবা মহৎ কিছু করিতে পারি না। বস্তুত ইহা আমাদের একটি শোচনীয় ত্রুটি।

আমাদের শাস্ত্রগুলির উপদেশ ছিল: "আমাদিগকে শক্তি, একতা ও গুণের আশ্রয় লইতে হইবে।" এই তিনটির মধ্যে একত্র হইয়া, দলবদ্ধ হইয়া কাজ করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় গুণ। হে বালকগণ, তোমাদের ড্রিল শিক্ষা করা উচিত। একসঙ্গে তোমাদের কুচ-কাওয়াজ হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়। নিজদিগকে তোমরা এভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে যে তোমরা দলবদ্ধভাবে সম্পূর্ণ সংগাতপূর্ণ উপায়ে কোনো কাজ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইবে না। তোমরা এমন একটি গোষ্ঠী গঠন করিবে যে যাহার কোনো সদস্য সমগ্র গোষ্ঠীর সহজ প্রকৃতিতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হইবে না। তোমাদের নির্ভীকতার অভ্যাস চর্চাও করিতে হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাহিনী পড়ুন

আর-একটি জিনিস যাহা আমাদের চাই তাহা হইল নারী-মুক্তি। এই সমাবেশে আপনারা আমাদের মাতা ও ভগিনীগণের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা দেখিয়া আমি দুঃখিত। আপনারা তাঁহাদিগকে পর্দার আড়ালে বসিতে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু এমন সময় আসিয়াছে যখন তাঁহাদের উচিত আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ানো এবং দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনয়নে সমান অংশ গ্রহণ করা। গতবৎসরের পিকেটিং-এ কাহারা দেশকে বিদেশী বস্তু বর্জনে সাহায্য করিয়াছিলেন? আমাদের মাতা এবং ভগিনীগণ দেবাঙ্গনাদের মতো লাঠিচালনা ও অন্যান্য বহু প্রকারের বাধা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার সমস্ত বড়োবাজার এলাকা চষিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এমন-কি, তাঁহারা লবণ আইন ভঙ্গ অভিযানের সময় কারাজীবনও বরণ করিয়াছিলেন। আমি বহু জেলার কথা জানি সেখানে পুরুষ কর্মীর অভাবে মহিলাদিগকে সক্রিয় অংশ লইতে হইয়াছিল। সুতরাং আমি বলি যে আমাদের মাতা ও ভগিনীগণ যখন একবার পর্দার বাহিরে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগকে আর আমাদের আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়। তাঁহারাও অবশ্য আমাদের সহিত সংগ্রামে যোগ দিবেন। আমাদের নারীদের মধ্যে আছে আদ্যাশক্তির ক্ষমতা। আমাদের কি বরাবর এই ধারণা ছিল না যে আমাদের নারীরা দীর্ঘদিন নির্জনতায় আবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের দ্বারা কোনো কাজ হইবে না? কিন্তু তাঁহারা মাত্র বারো মাস কালের কার্য দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়াছেন এবং মিস মেয়ো তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে-সব অন্যায় ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করিয়াছিলেন সেগুলি যে মিথ্যা তাহা তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন। মিস মেয়ো যে অন্যায় করিয়াছেন তাহার অবসান ঘটাইবার জন্য একজন উপযুক্ত ভারতীয় মহিলাকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পাঠাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এখন আর সে প্রয়োজন নাই, কেননা আমাদের মাতা ও ভগিনীরা নিজেরাই গোটা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্যান্য দেশের তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত মহিলাদের তুলনায় তাঁহারা কোনো অংশে হীন নন।

জননীদের কর্তব্য

ভবিষ্যতে আমাকে যদি এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়, তাহা হইলে আমি আশা করিব এই বিভেদের প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইবে। আমরা যখন

স্বরাজের কথা বলি তখন নারীদের বাদ দিয়া পুরুষের স্বরাজ কিংবা তথা-কথিত নিম্নতর শ্রেণীগুলিকে বাদ দিয়া তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য স্বরাজের কথা আমরা বুঝাই না। সকলের জন্য মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধী সরকারের সংগে একটা ফয়সালা করার জন্য ইংলন্ড গিয়াছেন। ফল কী হইবে আমরা জানি না কিন্তু ধরুন তিনি যদি অসফল হন তাহা হইলে পুনরায় জোর সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই প্রসংগে এখানে সমবেত মাতা ও ভগিনীদের আমি সসম্ভ্রমে অনুরোধ করিব যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের পুত্রদের সাহসী ও দৈহিক দিক হইতে শক্তি-শালী করিয়া তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। পুরাতন ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলি যেমন "খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে" ভুলিয়া যাওয়া উচিত এবং এইগুলির বদলে নূতন ছড়া রচিত হওয়া উচিত। আর একটা জিনিস তাঁহাদের করা উচিত নয়। তাহা হইল শিশুদের কোমল হৃদয়ে ভূতের ভয় সৃষ্টি করা। এই ধরনের ছড়াগুলি ও ভূতের গল্পগুলি শুধু ছেলেগুলিকে ভীরু করিয়া তোলে। আমাদের দুঃসাহসী বীর ছেলের ভয়ানক প্রয়োজন। আমি প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের পুরুষদের জানি যাঁহারা এখনো ভূতের ভয়ে কাবু। তাঁহারা ভূতের ভয়ে রাত্রিতে একা বাড়ির বাহিরে পা দিতে ভয় পান। ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়।

উপসংহারে আমি পুনরায় যে যুবকেরা এই সমিতি গঠন করিয়াছেন তাঁহাদের পরিপূর্ণ সমর্থন দানের জন্য স্থানীয় জনগণকে অনুরোধ জানাই এবং এই সুযোগে আমি সংগঠকদের জানাই যে তাঁহারা আমার সমর্থন পাইতে থাকিবেন। আমি তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যের কল্যাণকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিরোধী প্রভাবে আপনারা ভয় পাইবেন না। যে সংগঠনের উদ্বোধন হইয়াছে সহস্রাধিক গ্রামবাসীর সম্মুখে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে কিংবা এখনই একজন অতিথি ভদ্রলোক তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন— ইহা দেখিয়া আমি প্রকৃতই দুঃখিত। কাহারো নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। আমাদিগকে অনুরূপ বিরোধিতার মোকাবিলা করিতে হইবে। আপনারা যে কাজ হাতে লইয়াছেন সমস্ত কিছু ভুলিয়া তাহা চালু রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে আমাকে যদি এইরূপ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হয় আমি অত্যন্ত আনন্দের সংগে সে আমন্ত্রণে সাড়া দিব।

স্থানীয় জনগণ উৎসাহের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই আর ধন্যবাদ জানাই বীর ও দুঃসাহসী বালকদের যাহাদের কষ্ট স্বীকার এই অনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলিয়াছে।

স্বাধীনতার বাণী

২৩ অক্টোবর ১৯৩১ মাদারিপুরে প্রদত্ত ভাষণ।

ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় ভারতের আজ যে অভাব আছে তাহা হইল সামগ্রিকতাবোধের অভাব। একমাত্র গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে এই সামগ্রিকতা-বোধের উন্নয়ন সম্ভব। গণ-আন্দোলন ব্যাপক ও সংহত হইয়া উঠিলে একমাত্র তখনই কোনো ব্যক্তি নিজেকে জনগণের সহিত একাত্ম বলিয়া বোধ করিতে পারেন। আমি আপনাদের গ্ল্যাডস্টোনের জীবন হইতে একটি কাহিনী শোনাই। সেই মহাপুরুষকে একবার সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন: "জানেন কি আমি ইংল্যান্ডের রানী?" গ্ল্যাডস্টোন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন: "হ্যাঁ, মহামান্যা সম্রাজ্ঞী এবং আমি ইংল্যান্ডের জনগণ।" ভারতে গণ-আন্দোলনের অধিকতর অগ্রগতি ঘটিলে জন-প্রতিনিধি-দের পথে দাঁড়াইয়া এ কথা বলা সম্ভব হইবে: "আমি ভারতের জনগণ।"

ভারতে গণ আন্দোলন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে; তবু জনগণের কিছু কিছু অংশ আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া আছেন। তাঁহারা কেন দূরে সরিয়া আছেন সে কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কারণ আবিষ্কার করার পর তাহা দূর করাও কর্তব্য। গতবার অন্তরীণ অবস্থায় থাকার সময় আমি এই বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম এবং কিছু স্থির সিদ্ধান্তেও আসিয়াছিলাম। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে মহিলা, ছাত্রসমাজ, অসংগঠিত যুবশক্তি, শ্রমিক ও কৃষক এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলির মতো সমাজের কতকগুলি অংশকে জাতীয় সেবার উদ্দেশ্যে যথোচিতভাবে সংগঠিত করা হয় নাই। তখন হইতে আমি এই-সব অংশের মধ্যে কাজ করিতে এবং তাঁহাদিগকে কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি।

নারী-আন্দোলন

বাঙালী নারীদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছিল ১৯২৮ সালে এবং তখন হইতে নারী-আন্দোলনের কাজ এত চমৎকার ভাবে হইয়াছে যে ১৯৩০ সালে আমাদের নারীরা নিজেদের যোগ্যতার চমৎকার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। মিস মেয়োর কুৎসাপূর্ণ প্রচারের যোগ্যতম জবাব দিয়াছেন বাংলার নারীরা, পুরুষেরা নয়। যুগ যুগ ধরিয়া পর্দার আড়ালে বিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁহাদের নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বাংলার নারীরা যুব-সমাজ যে-সব বিপদে বহু বৎসর ধরিয়া অভ্যস্ত, সেই-সব বিপদের সম্মুখে সাহসের সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বাংলায় ১৯৩০ সালের বিদেশী বর্জনের কৃতিত্ব পুরুষদের অপেক্ষা নারীদেরই বেশি।

স্বাধীনতার বাণী

ছাত্র-আন্দোলনে উৎসাহিত করা, শ্রমিক-সংগঠন সৃষ্টি করা এবং নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে টানিয়া আনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই ধরনের কার্যে কিছুটা অগ্রগতি হইলেও, এখনো অনেক কিছু করার বাকি আছে। সমাজের এপর্যন্ত উদাসীন ও সক্রিয় অংশ-গুলিকে উৎসাহিত করিয়া তোলার জন্য প্রতি গৃহদ্বারে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার নূতন সংজ্ঞা প্রচার করিতে হইবে। জন-গণকে বিশ্বাস করাইতে হইবে যে স্বাধীনতার অর্থ হইল পরিপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সকলের জন্য স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক ধরনের দাসত্ব, বৈষম্য ও অসামর্থ্যের হাত হইতে মুক্তি। আমাদের দেশ চায় পরিপূর্ণ সর্বমুখী স্বাধীনতা। আমি অনুভব করি যে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে এবং ইহা ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা, আমাদের গোটা দেশকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহত্তর প্রয়াস করিতে হইবে। প্রতিটি মানুষ ও সমাজের প্রতিটি অংশের জন্য স্বাধীনতা যদি অর্থবহ হইয়া উঠে একমাত্র তাহা হইলেই গোটা দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলা যাইবে।

হিজলী এবং চট্টগ্রাম

আমি বাঙালী জনসমাজের প্রত্যেক অংশের নিকট আবেদন জানাই তাঁহারা যেন ব্যক্তিগত ও দলীয় বিরোধের অবসান ঘটাইয়া ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়িয়া

তোলেন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র হউক— বাংলা মরিলে কে বাঁচিবে? জাতি যাহাতে বাঁচিতে পারে ও উন্নতি করিতে পারে সেজন্য ব্যক্তিকে অনেক সময় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে ও মৃত্যু বরণ করিতে হয়। জাতি যাহাতে অবিলম্বে রক্ষা পায় সেজন্য আপনাদের মধ্যে হাজার হাজার তারকেশ্বর ও সন্তোষের উদ্ভব হউক এবং তাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ মূল্য শোধ করুন। যে-সব মহাপুরুষ বাংলাকে আজ বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন তাঁহারা নিঃসন্দেহে আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু বাঙালী জাতি এখনো বাঁচিয়া আছে এবং সেই জাতি এখনো মহান পুরুষ ও মহান নেতার জন্ম দিতে পারে। হিজলি ও চট্টগ্রামের নৃশংসতা আমার কাছে স্বর্গীয় সতর্কতা রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। আসুন আমরা বাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াই। আমি আশা করি যে দেশও এই দিব্য সতর্কবাণীর দ্বারা লাভবান হইবে এবং আমরা অবিলম্বে নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইব।

হিজলি ও চট্টগ্রাম

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি।

বাংলা এখন যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেগুলি সাগ্রহে হাতে লইতে ইচ্ছুক— এ কথা জানিয়া আমি আনন্দিত। আমার একমাত্র ইচ্ছা এই যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কলিকাতায় হইলে ভালো হইত। কংগ্রেস সভাপতির ইচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকজন সদস্যের অসুবিধা এ ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখিত। আমি খবরের কাগজগুলিতে দেখিলাম যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কিংবা আমি তাঁহাকে হিজলির ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করি নাই— সর্দার প্যাটেল ইহা বলিয়াছেন। আমরা সকলে জানিতাম যে ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইহা ছাড়া আমি হিজলির দুর্ঘটনার খবর পড়া মাত্র সেইদিনই পদত্যাগ করায় সে সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ছিল মস্তকবিহীন। হিজলির ঘটনাবলীর সংবাদ নিশ্চয়ই খবরের কাগজগুলির মাধ্যমে দেশের সকল অংশে প্রচারিত হইয়াছিল।

আমি পূর্বেই কংগ্রেস সভাপতিকে জানাইয়াছিলাম যে পূর্ব হইতে একটি কাজ হাতে লওয়ায় আমার পক্ষে দিল্লীতে এ মাসের ২৭ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভব নাও হইতে পারে। আমাকে শহীদ তারকেশ্বর সেনের পবিত্র চিতাভস্ম সমাধিস্থ করার জন্য বরিশালের জেলা রওনা হইতে হইবে এবং এ ধরনের পবিত্র একটি জনসাধারণের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা বা বর্জন করা সম্ভব নয়। যাহা হউক, আমি আশা করি যে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগ দিবেন এবং এই সংস্থার কাছে বাংলা-সম্পর্কিত সকল তথ্য পেশ করিবেন।

আমি ইতিপূর্বে আমার মতামত সাধারণ্যে ব্যক্ত করিয়াছি। চট্টগ্রাম ও হিজলীর তদন্তের ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের দাবিসমূহ আমাদিগকে রূপায়িত করিতে হইবে। এই দাবিগুলির মধ্যে অবশ্যই থাকিবে সকল বন্দীর অনতি-বিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তিদান এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে না পারে সে-বিষয়ে যথোচিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশবাসীদের উপর যে গুরুতর অন্যায় করা হইয়াছে তাহার যথোচিত ক্ষতিপূরণ আমাদের দাবি করা উচিত। এই-সব দাবির রূপরেখা নির্দিষ্ট হইবার পর আমি এই দাবিগুলি পরিপূরণের জন্য দেশব্যাপী এক তীব্র ও ব্যাপক প্রচারাভিযান আরম্ভ করার প্রস্তাব করি। যে পবিত্র অগ্নিশিখায় শহীদ সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে তাহা আমাদের প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। চট্টগ্রাম ও হিজলীর শোচনীয় দুর্দৈব সারা দেশে প্রলম্বিত ছায়া ফেলিয়াছে। আমাদের দাসত্ব ও লাঞ্ছনার শিক্ষা আমাদের মর্ম-মূলে কাটিয়া বসিয়াছে। ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে শায়িত আছে সন্তোষ-কুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মৃতদেহ। আমরা যেন তাহা ভুলিয়া না যাই, আমরা যেন তাহা ভুলিয়া না যাই।

২৩ অক্টোবর ১৯৩১

২

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি আবেদন।

আপনার এ মাসের ১৬ তারিখের চিঠি ও ১৯ তারিখের টেলিগ্রাম যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি খুবই দুঃখিত যে বরিশাল জেলার অন্তর্ভাগে গৈলাতে আমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। তাহা হইল ঐ স্থানে হিজলির দুর্ঘটনায় নিহত তারকেশ্বর সেনের চিতাভস্ম সমাধিস্থ করার ব্যাপার। বস্তুত আমি এখন সেই গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছি। এ মাসের ২৭ তারিখে আমার পক্ষে এই পূর্বনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা এবং একই সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এই কাজটি পূর্বনির্দিষ্ট বলিয়া এবং বরিশালের সকল অংশ হইতে জনগণ গৈলায় এখন সমবেত হইতেছেন বলিয়া এই অনুষ্ঠান বাতিল করা কিংবা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। কলিকাতায় অধিবেশনটি হইবার সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন সদস্যের অসুবিধা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে ইহা জানিয়া আমি দুঃখিত। আমি এ-বিষয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করিতে পারি যে পবিত্র ধরনের এই গুরুত্বপূর্ণ জন-সাধারণের অনুষ্ঠান হাতে না থাকিলে অন্য কোনো-কিছু আমার দিল্লী যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করিত না।

অন্য একটি কারণেও আপনারা সকলে কলিকাতায় আসুন ইহা আমি চাহিয়াছিলাম। আপনারা বাংলার পরিস্থিতি আমার মুখ হইতে না শুনিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানুন ইহা অত্যাবশ্যক। আমি বাংলার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো বিবরণ দিলে আপনাদের তাহা গ্রহণ করার মতো মনোভাব নাও থাকিতে পারে। কিন্তু আপনারা অকুস্থলে আসিলে নিজেরাই সব দেখিতে পাইতেন— আমার বিবরণ গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠিত না। আমি এখন এইমাত্র বলিতে পারি যে ওয়ার্কিং কমিটির দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে বাংলার মনোভাব কঠিন এবং আমি ইহা নরম করিয়াই বলিতেছি।

আপনি আপনার চিঠিতে বলিয়াছেন যে হিজলির ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্যাদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অথবা আমি আপনাকে জানাই নাই। প্রথমত, হিজলির ঘটনার অব্যবহিত পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক পরিষদ হইতে আমি ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্য বিভেদের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে পদত্যাগ করিয়াছিলাম এবং আমাদের এই কার্যের

ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কিছুদিনের জন্য জীবন্মৃত অবস্থায় ছিল। দ্বিতীয়ত, আমরা অবগত আছি যে ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার সদস্যগণ ওয়ার্কিং কমিটি ও সভাপতির সহিত নিয়ত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, সংবাদপত্রগুলি এই বিবরণ দেশের সকল অংশে বহন করিয়া লইয়াছিল এবং বাংলার ঘটনাগুলি না জানার কথা কেহই বলিতে পারেন না। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের সাহায্যার্থে সারা দেশ যেভাবে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার সহিত বাংলার এই দুঃসময়ে ওয়ার্কিং কমিটি যে সাড়া দিয়াছেন তাহা আমি আপনাকে সবিনয়ে তুলনা করিয়া দেখিতে বলি।

আমি মনে করি যে চট্টগ্রাম ও হিজলিতে তদন্তের ভিত্তিতে আমাদের কতকগুলি দাবি নির্দিষ্ট করা উচিত এবং সেই দাবিগুলি পূরণের জন্য তীব্র বিক্ষোভ গড়িয়া তোলা উচিত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই এই দাবিগুলির অন্তর্ভুক্ত হইবে :

১. সকল বন্দীর অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি।
২. এই ধরনের পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা।
৩. যে-সব সরকারী অফিসার ও কর্মী গুরুতর কর্তব্যচ্যুতির দোষে দোষী সাব্যস্ত হইবেন সরকার-কর্তৃক তাঁহাদের শাস্তিদান।
৪. যাঁহারা নিহত কিংবা আহত কিংবা লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছেন কিংবা যাঁহাদের সম্পত্তি বিনষ্ট কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি হইয়াছে তাঁহাদের সকলের জন্য ক্ষতিপূরণ।

ওয়ার্কিং কমিটি যদি হিজলি ও চট্টগ্রামকে সর্বভারতীয় বিষয় করিয়া তুলিতে পারেন তাহা হইলে অন্য কিছু আমাদের হৃদয়ে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ সৃষ্টি করিবে না। কিন্তু যদি কোনো কারণে তাঁহারা তাহা না করেন তবে এ-বিষয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য যথাসাধ্য করার চেষ্টা করিব।

উপসংহারে আমি পুনরাবৃত্তি করি যে ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতায় আসা ও অকুস্থলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য যদি ইহা কয়েকজন সদস্যের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে সবিনয়ে কলিকাতায় আসার আবেদন জানাই। আপনাকে ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ণ ক্ষমতা লইয়া আসিতে হইবে যাহাতে আপনি ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে ও নামে সিদ্ধান্ত লইতে পারেন। আপনি কংগ্রেস সভাপতি বলিয়া আপনার দায়িত্ব সুমহান।

২৫ অক্টোবর ১৯৩১

বন্দীগণের অসহায়তা

২৭ অক্টোবর ১৯৩১ বরিশাল জেলার গৈলায় শ্বেতপাথরের শহীদ স্তম্ভে তারকেশ্বর সেনের চিতাভস্ম একটি রৌপ্যাধারে প্রতিষ্ঠাকালে প্রদত্ত ভাষণ।

হিজলির প্রতিটি বন্দীকে হত্যা করা হইতে সিপাহীদের প্রতিনিবৃত্ত করার কোনো ব্যবস্থা ছিল কি? প্রতিনিবৃত্ত করার কোনোই ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোনো রক্ষাকবচ এবং বন্দীদের পুরাপুরি সিপাহীদের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা শহীদদের জন্য শোক করিতে আসে নাই, আসিয়াছিল শহীদদের মৃত্যুতে আনন্দ করিতে। তাহাদের একমাত্র অনুতাপের কারণ ছিল এই যে বন্দীদের যখন আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং হত্যা করা হইয়াছিল তখন তাঁহারা চার দেয়ালের মধ্যে একেবারে অসহায় অবস্থায় ছিলেন। যদিও তারকেশ্বর এবং সন্তোষকে অসহায় অবস্থায় হত্যা করা হইয়াছিল তাঁহারা সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, শহীদদের যেভাবে মরা উচিত তাঁহারা সেইভাবে মরিয়াছিলেন। আপনাদের আমি মনে রাখিতে বলি যে আপনারা বন্দী অবস্থায় না থাকিলেও যে-কোনো সময় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আক্রান্ত বা নিহত হইতে পারেন। সুতরাং প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীকে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রতিকারের জন্য দাবি

বাংলার উচিত সমবেত কণ্ঠে চট্টগ্রাম ও হিজলিতে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করা। অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নের বিষয়গুলি এই দাবির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত:

১. বিনা শর্তে অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তিদান।
২. সকল দুষ্কৃতকারীর শাস্তিবিধান।
৩. যে-সব ক্ষতি করা হইয়াছে সেগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ এবং
৪. চট্টগ্রাম ও হিজলির নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি নিবারণের ব্যবস্থা।

বাংলা গভীর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল ১৯০৫ সালে। তখন সে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌দের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিল, জনগণের ইচ্ছার সম্মুখে গর্বিত ইংরাজকে শির নত করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং বাংলা-বিভাগের নিশ্চিত ঘটনাকে বানচাল করিয়া দিয়াছিল। কুড়ি বৎসর পূর্বে সে যদি ইহা

করিয়া থাকিতে পারে তবে আজ সে শুধু সংকল্পবদ্ধ হইলে সহজেই বর্তমান অন্যায়ের প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে পারে। বাংলার জনগণের বিশ্রামের, এমন-কি, বাস পরিবর্তনেরও সময় নাই। আমাদের কিছুমাত্র পৌরুষের পরিচয় যদি আমরা দিতে চাই তবে আমাদের অবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যদি কণামাত্র আত্মসম্মানবোধ অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে এক সংকল্প লইয়া আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং এককণ্ঠে প্রতিকার দাবি করিতে হইবে। আমি জানি সংকটকালে বাংলা পিছাইয়া থাকিবে না।

গোলটেবিল বৈঠক

একেবারে প্রথম হইতে আমি গোলটেবিল সম্মেলনের ফল সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। গোলটেবিল সম্মেলন সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল কেবলমাত্র সংগ্রামী দলগুলির মধ্যে। যে-সব দল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাই তাহাদিগকে যখন এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল তখন এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের ভুল হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার একটি আইরিশ সম্মেলন ডাকিয়া আইরিশ জনগণকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সিন্ফিন দলের বুদ্ধিমান নেতারা সে ফাঁদে পা দেন নাই। তাঁহারা আইরিশ সম্মেলন বর্জন করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার একমাত্র সিন্ফিন দলের সংগে আপস-আলোচনায় সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রাম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। কংগ্রেস যদি একমাত্র নিজেই ভারতের জন্য কথা বলিবার অধিকারী না হয় তাহা হইলে কংগ্রেস কখনোই সাফল্যের সংগে ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপস-আলোচনা করিতে পারিবে না।

সকলের জন্য স্বাধীনতা

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হইলে প্রত্যেকটি সমস্যার মোকাবিলার জন্য দেশের প্রস্তুত থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কেন জনগণের কোনো কোনো অংশ জাতীয় সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া আছেন সে কারণ আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে যে প্রতিকারের কথা বলা যায় তাহা হইল সর্বতোমুখী স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার। জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে আমরা যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছি তাহার লক্ষ্য হইল প্রত্যেক ধরনের দাসত্ব

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা। একমাত্র তখনই সমাজের প্রতিটি অংশ স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিবে। আমরা চাই যে আমাদের নারীসমাজ, আমাদের নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষেরা, আমাদের মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নীরা, আমাদের শ্রমিক ও চাষী ভাইরা লক্ষে লক্ষে কোটিতে কোটিতে আমাদের স্বরাজের সংগ্রামে যোগ দিন। কিন্তু যখন স্বাধীনতারূপে স্বরাজ অর্থবহ হইয়া উঠিবে এবং তাঁহাদের সকলের কাছে সে বাণী পেঁছিবে একমাত্র তখনই তাঁহাদের উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলার আশা করা যায়। অনেক দেশে আমরা দ্বি-স্তরে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালিত হইতে দেখিয়াছি। ইহার প্রথম পর্যায় হইল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং দ্বিতীয় পর্যায় হইল সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তি। এই দুই স্তরের মধ্য দিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ভারতকে স্বাধীন বলা যাইবে না।

বাংলার অমর বীর্য

দেশবন্ধু ও বাংলার অন্যান্য অনেক মহান্ সন্তান দেহত্যাগ করার ফলে বাংলা দরিদ্র হইয়া পড়িলেও এখনো বাঁচিয়া আছে এবং তাহার অমর বীর্যও আছে অক্ষুণ্ণ। গোটা জাতি ইচ্ছা করিলে আরো একশো দেশবন্ধুর সৃষ্টি হইতে পারে। এখন আমরা ভবিষ্যতের মহান সন্তানদের জন্য পথ তৈয়ার করিতেছি মাত্র।

হিজলি রিপোর্ট ও মতামত

ফ্রী প্রেসের সহিত সাক্ষাৎকার।

আমি বিস্তারিতভাবে রিপোর্টটি পড়িবার ও যথোচিতভাবে ইহা বিশ্লেষণ করিবার সময় পাই নাই। সুতরাং আজ আমি এ-বিষয়ে বিস্তারিত অভিমত দিতে পারিব না এবং কেবলমাত্র বড়ো দফাগুলি সম্বন্ধে আমার মতামত সীমিত রাখিব। প্রথমেই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল এই যে, হিজলি বন্দী-শিবিরের কর্মচারীদের পক্ষে যে রায়-বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত কমিটির কাছে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন তাঁহার নির্দেশিত পথেই কমিটির

বক্তব্যগুলি রচিত হইয়াছে। আমি মনে করি যে কমিটির কতকগুলি সিদ্ধান্ত, বিশেষ করিয়া বন্দীদের ভূমিকা-সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। এই মুহূর্তে আমরা যদি সিদ্ধান্ত-গুলির মাত্র দুইটিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি তাহা হইলে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রে হিজলি বন্দী-শিবিরের অভ্যন্তরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার বাস্তব চিত্র আমরা বুঝিতে পারিব। কমিটি দেখিতে পাইয়াছেন যে সিপাহীরা মূল গৃহটির উপর নিয়মিতভাবে গুলিবর্ষণ করিয়াছিল— বিনা কারণে যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ এবং ইহার ফলে দুইজন বন্দীর— নীচের তলার বাবু সন্তোষ-কুমার মিত্রের এবং উপরতলার বাবু তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল আর আহত হইয়াছিলেন কয়েকজন যাঁহাদের মধ্যে একজনের একটি বাহু অস্ত্রো-পচারের সাহায্যে কাটিয়া দেখার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহারা আরো দেখিতে পাইয়াছেন যে কয়েকজন সিপাহী বিনা কারণে বন্দী-শিবিরের মধ্যে ঢুকিয়া-ছিল, লাঠি ও বেয়নেটের দ্বারা সেখানে কয়েকজন বন্দীকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেখানে কয়েকটি গুলিও ছুঁড়িয়াছিল। অতঃপর তাহারা চলিয়া গিয়াছিল। আরো লক্ষ্য করা যায় যে রিপোর্টের শেষ দিকে কমিটি বলিয়াছেন যে ১৬ সেপ্টেম্বরের শোচনীয় ঘটনাবলীর একটি পরোক্ষ কারণ ছিল এই যে, রাত্রিকালে শিবিরে কোনো দায়িত্বশীল অফিসারের থাকার ব্যবস্থা ছিল না এবং রাত্রিকালে শিবিরের দায়িত্ব পুরাপুরি থাকিত কয়েকজন হাবিলদারের নেতৃত্বাধীন সিপাহীদের উপর।

গলিত প্রশাসন ব্যবস্থা

এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই শিবিরের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তাহার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ধিক্কার দিবার পক্ষে যথেষ্ট। বস্তুত রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সম্মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন যে শিবিরের প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুতর ধরনের ত্রুটি ছিল। ইহা অনুতাপের বিষয় যে কমিটি এই প্রশ্নটি তলাইয়া দেখার কষ্ট স্বীকার করেন নাই এবং ভয়ংকর ঘটনাবলীর সকল দায়িত্ব হইতে কম্যান্ডান্ট, সহকারী কম্যান্ডান্ট ও ইনস্পেক্টর মার্শালকে মুক্তি দিয়াছেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াও লওয়া যায় যে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কম্যান্ডান্ট, সহকারী কম্যান্ডান্ট ও ইনস্পেক্টর মার্শালকে গুলিচালনার ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলা চলে না, তাহা হইলেও

তাঁহাদের কোনো দায়িত্বই ছিল না— এরূপ কথা কি বলা চলে ? ঊর্ধ্বতন কর্তারা যদি সিপাহীদের সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা লইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে যথোচিত প্রশিক্ষণ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গেল কিভাবে ? একজন সিপাহী বলিয়াছেন যে গুলিবর্ষণের বিকল্প হিসাবে সে মাস্কেটের কুঁদা ব্যবহার করিতে পারে নাই এই ভয়ে যে ইহাতে সরকারী সম্পত্তির ক্ষতি হইতে পারিত এবং সে আরো বলিয়াছিল যে সে বন্দীদের জীবনের অপেক্ষা সরকারী সম্পত্তি অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করে। ইহার মর্মার্থ প্রণিধানযোগ্য। কম্যান্ডান্ট মিঃ বেকার নিজে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে প্রকৃত গুলিবর্ষণের আগের দিন সিপাহীরা দলবদ্ধভাবে শিবিরে ঢুকিতে ও বন্দীদের আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি সে সংকট নিবারণ করিয়াছিলেন। কমিটিও ইহা দেখিতে পাইয়াছেন যে ১৫ সেপ্টেম্বর বিকালে সময়মত মিঃ বেকার হস্তক্ষেপ না করিলে সেইদিনই বিকালে ঠিক সমান গুরুতর প্রকৃতির না হইলেও ১৬ সেপ্টেম্বরের মতো ঘটনা ঘটা অসম্ভব ছিল না।

আলাপ-আলোচনা

১৫ সেপ্টেম্বরের সতর্কবাণীর পর ঊর্ধ্বতন অফিসারেরা পরিস্থিতির আরো অবাঞ্ছিত পরিবর্তন নিবারণের জন্য কী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। অফিসারেরা যদি তাঁহাদের কর্তব্য করিতেন এবং পূর্ব হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর কিছুই ঘটিত না। ইনস্পেক্টর মার্শাল প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাবু মনোরঞ্জন রায় তাঁহার যে কথাবার্তা শুনিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। ইহা হইল : ১৬ সেপ্টেম্বর ইনস্পেক্টর যখন সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহারা বন্দীদের আক্রমণ প্রভৃতি করে নাই কেন। ইনস্পেক্টর মার্শাল সিপাহীদের প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী এবং ১৬ সেপ্টেম্বর রাত্রে সিপাহীদের আচরণ তাঁহার উপর গুরুতর দোষ আরোপ করে।

বন্দীদের অবিশ্বাস করা হইয়াছে

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বন্দীরা যে সাক্ষ্য দিয়াছেন কমিটি তাহা বিশ্বাস করেন নাই দেখিয়া আমি বেদনা বোধ করিয়াছি। কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত

তথ্যাদি সত্ত্বেও এবং কমিটি-কর্তৃক পরীক্ষার সময় সিপাহীরা একেবারে ভাঙিয়া পড়া সত্ত্বেও কমিটি কী করিয়া ১৬ সেপ্টেম্বরের গুলিবর্ষণের পূর্ববর্তী ঘটনা-সম্বন্ধে সিপাহীদের কাহিনী বিশ্বাস করিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ১৫ সেপ্টেম্বর মিঃ বেকার সময়মতো হস্তক্ষেপ না করিলে ১৫ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে গুরুতর কিছু ঘটিতে পারিত কমিটির এই তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকৃতির পর বন্দীরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ত্রুটিবিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের বক্তব্য অনুসারে ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখেই গুলিবর্ষণের প্ররোচনা দেখা দিয়াছিল এবং সিপাহীরা ১৬ সেপ্টেম্বর যাহা করিয়াছিল সে-দিন মিঃ বেকার অনুপস্থিত থাকিলে তাহা তাহারা ১৫ তারিখেই করিত। উপস্থাপিত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষে ইহা ধরিয়া লওয়া সম্ভব যে ১৬ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ ছিল পূর্বপরিকল্পিত। ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত হইলে সব সিপাহীরই তাহা জানা উচিত ছিল, আমার মতে কমিটির এই ধারণা ভ্রান্ত। যাহা খুবই সম্ভব তাহা হইল যে কিছু-সংখ্যক সিপাহী এই প্রস্তাবের কথা জানিত এবং অন্যেরা জানিত না। আক্রমণের জন্য যে-সব সিপাহী দায়ী ছিল তাহারা এই আক্রমণ করিতে সাহস পাইয়াছিল তখনই যখন তাহারা দেখিয়াছিল যে বন্দীদের প্রতি অফিসারদের মনোভাব বদলাইয়াছে এবং শেষোক্তরা পূর্বোক্তদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।

কমিটি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে (১৬ সেপ্টেম্বর) ৩নং শান্ত্রীর কাজে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল কিনা এবং সেখানে কোনো প্রকারের ধস্তাধস্তি হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্নটির নিজস্ব কোনো গুরুত্ব নাই। আমি শুধু এই কথা যোগ করিব যে সরকারের দালালদের মধ্যে দোষ বিভাজন ততটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, অবশ্য যদি তাহারা সর্বস্বীকৃত অন্যায়গুলির প্রতিকার বিধান করিতে পারে।

চতুর্বিধ প্রতিকার

জনগণের প্রতিনিধিদের অবিলম্বে একত্রিত হওয়া এবং তাঁহাদের দাবির রূপ-রেখা রচনা করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে জনগণের বর্ধিত দায়িত্ব আছে, কারণ তাঁহারা এই আশ্বাসে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট ত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে জনগণ তাঁহাদের পক্ষ লইবেন। আমি আগেই বলিয়াছি যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নীচের চারটি দাবি আমাদের অবশ্য তুলিয়া ধরা উচিত :

প্রথমত, নৃশংসতার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের শাস্তিবিধান ; দ্বিতীয়ত, সমস্ত ক্ষতি ও লাঞ্ছনার ক্ষতিপূরণ ; তৃতীয়ত, অবিলম্বে বিনা শর্তে সকল বন্দীর মুক্তিদান এবং চতুর্থত, ভবিষ্যতে এই ধরনের নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি নিবারণের যথোচিত ব্যবস্থা ।

জীবন-মরণ প্রশ্ন

আমি একই সঙ্গে চট্টগ্রামের অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যও বিক্ষোভ আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজনীয় ও সংগত মনে করি । হিজলি ও চট্টগ্রামকে সর্বভারতীয় বিষয় করিয়া তুলিতে পারিলে আমাদের কাজ কিছুটা হালকা হইবে কিন্তু তাহা না হইলে আমাদের উচিত ইহাকে নিখিলবঙ্গ প্রশ্নে পরিণত করা এবং সমগ্র বাংলায় নিবিড় অভিযান আরম্ভ করা । আমাকে আহ্বান জানাইলে আমি এই অভিযানের দায়িত্ব লইব এবং আমি এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে কিছু প্রাথমিক কাজও করিয়াছি । ১৯০৫ সালে প্রদেশটিকে ভাঙিয়া দুই টুকরা করিবার পর বাংলা আর এরূপ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই । কিন্তু সেই অন্ধকার দিনগুলিতে বাংলা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং আমলাতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছিল । আমরা যদি কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯০৫ সালের নিশ্চিত ঘটনাকে বানচাল করিয়া দিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে ১৯৩১ সালের প্রগতিশীল দিনগুলিতে আমরা নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম ও হিজলির অন্যায়ের প্রতিকার বিধান করিতে পারিব । এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত দৃঢ় যে আমি মনে করি এখনকার মতো আমাদের অন্য সব-কিছু ভুলিয়া যাওয়া উচিত এবং প্রতিকার বিধানের কাজে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত । বাংলার পক্ষে ইহা জীবন-মরণের প্রশ্ন । আজ যদি আমরা এই-সব অন্যায় হজম করি তাহা হইলে ভবিষ্যতে চিরদিনের মতো আমরা অমর্যাদার পঙ্কে নিমগ্ন হইব । আমি জানি যে বাংলা ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে এবং নিজেকে রক্ষা করিবে ।

৫ নভেম্বর ১৯৩১

ব্যবহারের নমুনা

৭ নভেম্বর ১৯৩১ চাঁদপুর হইতে পাঠানো বিবৃতি।

ঢাকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য শনিবার ৭ নভেম্বর, ১৯৩১ শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য সমভিব্যাহারে আমি কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জে পেঁছাই। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে বৃহস্পতিবার ৫ নভেম্বর কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমাদের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা তদন্ত কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হইয়াছিল।

নিষেধাত্মক আদেশ

স্টীমার নারায়ণগঞ্জ ঘাটে পেঁছাইবার পর কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল এবং নারায়ণগঞ্জের মহকুমা অফিসার স্টীমারে আরোহণ করেন। আমরা যে স্টীমারে ভ্রমণ করিয়াছিলাম তাহার পাশে একটি লঞ্চ আসে। কিছু পরে একজন ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার (যাঁহাকে পরে অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ এলিসন বলিয়া জানা যায়) আমার কাছে আসেন এবং আমার উপর একটি ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্ল্যাডিং এই আদেশে সই করিয়াছিলেন এবং ইহার বলে আমাকে দুই মাসের জন্য ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। আমাকে পরে মিঃ এলিসন লঞ্চে উঠিতে বলেন। এই লঞ্চ আমাকে নারায়ণগঞ্জ হইতে সোজা গোয়ালন্দগামী একটি স্টীমারে উঠাইয়া দিবে। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি করিতেও বলেন কেননা ডাউন মেল স্টীমারটির যাত্রা আমার জন্যই বিলম্বিত হইয়াছিল। আমি বলি যে ঢাকা আমার গন্তব্যস্থল এবং যে পর্যন্ত আমি স্বাধীন মানুষ থাকিব সে পর্যন্ত আমি ঢাকার দিকেই অগ্রসর হইব। আমি ইহাও বলি যে আদেশটি নিরর্থক, অবৈধ ও অবাঞ্ছিত এবং ইহা পালনের কোনো অভিপ্রায় আমার নাই। পরে মিঃ এলিসন নারায়ণগঞ্জের মহকুমা হাকিম ও অন্যান্যদের সংগে কিছু পরামর্শ করেন এবং আমার কাছে আসিয়া আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলেন: "আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" তাহার পর তিনি বলেন যে আমাকে লঞ্চে উঠিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দগামী মেল স্টীমারে চড়িতে হইবে। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলি যে আমি যদি ১৪৪

ধারার আদেশ অমান্য করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাকে ১৮৮ ধারায় অভিযুক্ত করা যাইতে পারে কিন্তু এভাবে আমাকে জোর করিয়া ঢাকা জেলা হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবে না। অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার কথা-শুনিতে চাহিলেন না, বলিলেন যে তাঁহার উপর প্রদত্ত নির্দেশ সেইরূপ এবং আমার মালপত্র লঞ্চে উঠাইয়া দেওয়া হইল। সরকার ও পুলিশ অফিসারদের যে কাজ স্পষ্টই অবৈধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল আমি পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ইহাতে মিঃ এলিসন থমকিয়া গিয়াছিলেন এবং পুনরায় নারায়ণগঞ্জের মহকুমা হাকিম ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আর-এক দফা শলা-পরামর্শ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আমার কাছে আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে আমাকে নামিয়া তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। আর আমি গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া নামিয়াছিলাম। তীরে নামার পর একটি গাড়িতে করিয়া তিনি আমাকে থানায় লইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে থানায় আমাকে মিনিট খানেক থাকিতে হইবে কিন্তু পরে আমি দেখিয়াছিলাম যে সেখানে আমাকে দুই ঘণ্টার উপর থাকিতে হইয়াছিল। থানায় অফিসারেরা আরো অনেকক্ষণ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মিঃ এলিসন আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই কিন্তু আমাকে পুলিশের রক্ষণাধীনে নেওয়া হইয়াছিল। তিনি আমাকে আদেশ পালন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেও বলিয়াছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে আমি যে আদেশ লঙ্ঘন করিব তাহা তিনি প্রথম হইতে জানিতেন। জগদ্দলে যখন আমার উপর অনুরূপ ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল তখন কী হইয়াছিল তাহাও তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আমাকে যদি গ্রেপ্তার না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইতে চাই। আমার গন্তব্য ছিল ঢাকা এবং আমি সেখানে যাইতে চাহিয়াছিলাম। আর জগদ্দল প্রসঙ্গে আমি বলিয়া-ছিলাম যে কর্তৃপক্ষ আমাকে গ্রেপ্তার করার কিছু পরেই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহারা শুধু আমাকে ছাড়িয়াই দেন নাই, সে অঞ্চলে সভা করিতে পারিব না এই মর্মে আমার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। আমি তখন মিঃ এলিসনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আমার অপরাধ আদালত-গ্রাহ্য নয় বলিয়া আমি জামিনে

মুক্তির দাবি করিলে তিনি কী করিবেন। তাহা হইলে তো তাঁহারা আমার ঢাকায় অবস্থান বন্ধ করিতে পারিবেন না। তখন মিঃ এলিসন ও মহকুমা হাকিম অন্যত্র চলিয়া গিয়া দীর্ঘ শলা-পরামর্শ করিয়াছিলেন এবং হয়তো নারায়ণগঞ্জ হইতে দশ মাইল দূরবর্তী ঢাকায় অবস্থানকারী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আমি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলাম। আমি থানার অফিসারের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলাম যে মিঃ এলিসন স্থানত্যাগের পূর্বে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেকে তখনো গ্রেপ্তারাধীন বলিয়া মনে করিতে পারি কিনা। থানা অফিসার এ-বিষয়ে আলোকপাত করিতে না পারিয়া অস্থায়ী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে টেলিফোন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি জবাব দিয়াছিলেন যে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিয়াছিলেন এবং আমাকে জানাইয়াছিলেন যে আমি গ্রেপ্তারাধীন নই, কিন্তু "কার্যত নিয়ন্ত্রণাধীন"। আমি বলিয়াছিলাম যে আমাকে তখন বৈধভাবে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছিল কিনা এ প্রশ্নের আমি সরাসরি ও স্পষ্ট জবাব চাই। আমাকে একবার স্টীমারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বলিয়াই আমি অস্থায়ী পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টকে অনুসরণ করিয়া থানায় আসিয়াছিলাম। মিঃ এলিসন নানা কায়দায় এই অসুবিধা কাটাইয়া উঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সোজা উত্তর কিছুতেই দিবেন না এবং বার বার বলিতেছিলেন যে আমি "কার্যত নিয়ন্ত্রণাধীন" ছিলাম। আমি যখন স্টীমারে গ্রেপ্তারের কথা তুলিয়াছিলাম তখন আমাকে বলা হইয়াছিল যে সেটা ছিল ভুল-বোঝাবুঝি। আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে ওই গ্রেপ্তার সম্বন্ধে ভুল-বোঝাবুঝি হয় নাই যদিও আমাকে সেখানে গ্রেপ্তার করা ভুল হইয়া থাকিতে পারে। তাহার পর আমি বলিয়াছিলাম যে আমি যখন আর বৈধ গ্রেপ্তারের অধীন নই তখন আমি চলিয়া যাইব এবং বস্তুত আমি উঠিয়া হাঁটিতে শুরু করিয়াছিলাম। মিঃ এলিসন তখন আমার বাহু ধরিয়া আমার নড়াচড়ায় বাধা দিয়াছিলেন। ইহা দুইবার ঘটিয়াছিল। একজন পুলিশ অফিসারের এই অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে হয় আমাকে বৈধভাবে গ্রেপ্তার করা হউক অথবা আমাকে মুক্তি দেওয়া হউক। নিছক গায়ের জোরে ওভাবে আমাকে আমার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না। আমি আরো তাহাকে সতর্ক করিয়া বলি যে তিনি আমার সহিত

এইরূপে আচরণ করিয়া নিজেকে আইনের চোখে অপরাধী করিয়া তুলিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে অফিসার হিসাবে তিনি নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতেছিলেন বলিয়া তিনি সুরক্ষিত। আমি বলিয়াছিলাম যে ইহা তাঁহাকে আইনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু আমার কথার কোনো প্রভাবই তাঁহার উপর পড়ে নাই। প্রায় বিকাল ৪টার সময় তিনি উঠিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমাকে তাঁহার সঙ্গে চাঁদপুর মেল স্টীমারে যাইতে হইবে এবং সেখানে আমাকে স্টীমারে উঠাইয়া ঢাকা জেলার বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। আমি বলিয়াছিলাম যে আমি যাইব না, কারণ তাঁহার মতানুসারে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তখন তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে কিছুদূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলাম যে তিনি উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য দৈহিক শক্তি প্রয়োগে উৎসুক, তখন আমি আত্মসমর্পণ করিয়া কয়েকজন লোকের সম্মুখে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে আমি বৈধ আদেশের কাছে নয়, নিছক গায়ের জোরের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছি।

উকিলের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয় নাই

স্টীমারঘাটের উদ্দেশ্যে থানা ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে আমি মিঃ এলিসনকে বলিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে গায়ের জোরে ঢাকা জেলা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতেছিলেন বলিয়া আমি আমার উকিলদের কাছে এই মর্মে নির্দেশ রাখিয়া যাইতে চাই যে দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারদের অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করেন সে ব্যবস্থা যেন তাঁহারা গ্রহণ করেন। তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে ছিলেন এবং আমি তাঁহাকে উকিল আনিতে বলি। কিন্তু মিঃ এলিসন বলেন যে তিনি কোনো উকিলকে আমার সহিত দেখা করিতে দিবেন না এবং তিনি নরেনবাবুকে ফিরিয়া যাইতে বলেন। পরে মিঃ এলিসন বলেন যে তিনি একমাত্র শ্রী জে. সি. গুপ্তকে আমার সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিবেন কিন্তু আমি থানা ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীগুপ্ত যাহাতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন সেজন্য তিনি অপেক্ষা করেন নাই। যাহা হউক, শ্রীগুপ্ত স্টীমারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং কী অবস্থায় আমাকে জোর করিয়া স্টীমারে লইয়া আসা হইয়াছে এবং কিভাবে আমাকে ঢাকা জেলার বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে তাহা আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী অধিকাংশ সময় আমার সংগে ছিলেন এবং আমি যে বিবরণ দিয়াছি সে সম্বন্ধে তাঁহারা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিতে পারেন।

জনতার উপর লাঠি চালনা

স্টীমার যখন নারায়ণগঞ্জ ছাড়িতে উদ্যত তখন এক বিরাট জনতা ঘাটে সমবেত হইয়া আমার উদ্দেশে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। ইহা বাস্পাবিলা খ্যাতিসম্পন্ন মিঃ এলিসনের পক্ষে সহ্যাতিরিক্ত হইয়া উঠে এবং তিনি স্টীমার হইতে নামিয়া কনেস্টবলদের সংগে লাঠি সহ জনতার পশ্চাদ্ধাবন করেন।

অভিনব কৌশল

মুন্সীগঞ্জ না পেঁছানো পর্যন্ত মিঃ এলিসন ও পুলিশ প্রহরীরা নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং আমি তখন মিঃ এলিসনকে বলিয়াছিলাম যে আমার তাঁহাকে অনুসরণ করার কথা বলিয়া আমিও নামিব। ইহাতে অস্থায়ী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ভয় পাইয়াছিলেন এবং যে তক্তাগুলি দিয়া ঘাট পর্যন্ত সেতু তৈয়ারি করা হইয়াছিল সেগুলির একটি তক্তা ছাড়া সব তক্তা খুলিয়া ফেলার আদেশ তিনি দিয়াছিলেন। পুলিশ দলের সবাই নামিয়া যাইবার পর তিনি তাড়াতাড়ি তক্তার সাহায্যে ঘাটে নামিয়া গিয়াছিলেন এবং সংগে সংগে তক্তাটি সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল যাহাতে আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ঘাটে না নামিতে পারি। স্টীমার সংগে সংগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই অবস্থায় আমি বাধ্য হইয়া চাঁদপুরে উপস্থিত হইয়াছি। আমার মালপত্র পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশে ঢাকায় পাঠানো হইয়াছিল এবং যখন আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে উহারা আমাকে ঢাকার বাহিরে পাঠাইতে কৃতসংকল্প তখন আমি নিজের মালপত্র ফেরত চাহিয়াছিলাম। কিন্তু মালপত্র আসিয়া পেঁছায় নাই। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমার বিছানাপত্র সময়মত আসিয়া না পেঁছাইলে তিনি আমার জন্য অন্য একটা বিছানার ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু কার্যত কিছুই করা হয় নাই। টিকিট হিসাবে আমাকে মুন্সীগঞ্জের পরবর্তী স্টেশন গজারিয়া পর্যন্ত একটি পাস দেওয়া হইয়াছিল। আমি পাসটি লইবার সময় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে বলিয়াছিলাম যে তিনি গজারিয়ার পরে চাঁদপুর পর্যন্ত বিনা টিকিটে যাইবার

ব্যবস্থা করিয়া আমাকে আইন ভাঙিতে বাধ্য করিতেছেন কিন্তু ইহাতেও তাঁহার উপর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নাই।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলির আলোকে আমি আগে যাহা বহুবার বলিয়াছি তাহারই যুক্তিসংগত পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে পারি যে এই হতভাগ্য দেশে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়ে আমাদের কোনো অধিকার নাই। আমরা পুরোপুরি স্থানীয় আমলাদের দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমি আরো মনে করি যে ঢাকায় এমন অনেক কিছু আছে যাহা স্থানীয় আমলারা প্রকাশ হইতে দিতে চান না। মুখোশ খুলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত ভীত এবং আমার উপর ১৪৪ ধারার আদেশ জারি করার একমাত্র কারণও তাহাই বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, আমি আশা করি যে তদন্ত কমিটি নির্ভয়ে তাঁহাদের তদন্ত আরম্ভ ও অনুসরণ করিবেন। আর আমার বিষয়ে এ কথা বলার বোধ হয় প্রয়োজন নাই যে আমি আবার ঢাকায় যাইবার চেষ্টা করিব— তবে তাহার ফল কী হইবে সে সম্বন্ধে এখনই কিছু বলা চলে না।

ঢাকায় যে ভয়ংকর ঘটনাবলী ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে জনগণ অনেক কিছু শুনিয়াছেন। আমি তাঁহাদের এ কথা উপলব্ধি করিতে বলি যে একমাত্র যে-উপায়ে তাঁহারা অধিকতর নির্যাতন বন্ধ করিতে পারেন তাহা হইল নির্ভীক-ভাবে স্থানীয় আমলাদের মুখোশ খুলিয়া দেওয়া। আমাকে যদি স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং ইহা প্রায় নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আমি আন্তরিকভাবে আশা করিব যে কারাপ্রাচীরের বাহিরে অবস্থানকারী আমার কমরেডগণ এই কাজ নির্ভীকভাবে এবং অকুণ্ঠভাবে করিয়া যাইবেন।

অন্যায়ের প্রতিকার চাই

বহরমপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্বাহ্ণে আমি সমগ্র প্রদেশে আমার বন্ধুদের ও সহকর্মীদের প্রতি এই আবেদন জানাই যে তাঁহারা যেন চট্টগ্রাম, হিজলি ও ঢাকার অন্যায়ের প্রতিকারার্থ কার্যকর কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মন-স্থির করেন। এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলা ও লেখা হইয়াছে তাহার

পর এ কথা বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন নাই যে বাংলা যদি বাঁচিতে ও নিজের মনুষ্যত্বের প্রমাণ দিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এই অন্যায়গুলির সন্তোষজনক প্রতিকার আদায় করিতে হইবে। ১৯২০ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আমাদের জাতীয় দাবিগুলির মধ্যে প্রথম দফা হিসাবে পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করিয়াছিল। সেইভাবে ১৯৩১ সালে বাংলাকেও জাতীয় দাবিগুলির প্রথম দফা হিসাবে চট্টগ্রাম, হিজলি ও ঢাকার অন্যায়ের প্রতিকার দাবি করিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্বে প্রচারিত একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে আমি বলিয়াছিলাম যে এই অন্যায়গুলি সম্বন্ধে কেবল কংগ্রেসকর্মীদের মাথা ঘামাইতে হইবে এমন নয়— ইহা বাংলার সমগ্র জনসমাজের ব্যাপার। যে প্রাদেশিক সম্মেলন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে তাহাকে আমরা উপরোক্ত অন্যায়গুলির প্রতিকারের জন্য যে প্রকাশ্য দাবি করিয়াছি তাহা পূরণের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

ব্রিটিশ পণ্য বয়কট

আমার বিনীত অভিমত এই যে প্রকাশ্যে যে-সব দাবি করা হইয়াছে প্রাদেশিক সম্মেলনের পক্ষ হইতে সেগুলি পুনঃসমর্থিত হওয়া উচিত। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে আমাদের আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত। ওই সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক কোনো কিছু করা না হইলে আমাদের উচিত দাবিগুলি পূরণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করা। এই প্রসঙ্গে উন্নততর, অধিকতর কার্যকর এবং অধিকতর বাস্তব কোনো কর্মসূচী সম্মুখে না থাকায় আমি ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের পরামর্শ দিয়াছি।

কোনো বিতর্ক নাই

আমি জানিতে পারিয়াছি যে আমার পরামর্শ কোনো কোনো মহলের মনঃপূত হয় নাই। সুতরাং আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইতে চাই যে বয়কট প্রস্তাব লইয়া সম্মেলনে কিংবা তাহার পরে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হউক ইহা আমি চাই না। আমার প্রস্তাব যদি সম্মেলনে কিংবা পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যুক্ত কমিটিতে নাকচ হইয়া যায় আমি সবিনয়ে আমার পরাজয় মানিয়া লইব। আমার বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমি যেমন এই প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি করিব না, তেমনি আমি জোড়

হস্তে বসিয়া থাকিয়াও সন্তুষ্ট বোধ করিব না। যাঁহারা আমার পরামর্শ অনুমোদন করেন সম্পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আমি সেই-সব দেশবাসীকে আগাইয়া আসিতে ও সর্বপ্রকার গুরুত্ব সহকারে কাজে নামিতে আহ্বান জানাইব। যদি ইত্যবসরে গ্রেপ্তার হই তাহা হইলে যে-সব বন্ধু ও সহকর্মী আমার গ্রেপ্তার অনুমোদন করেন আমি প্রত্যাশা করিব যে তাঁহারা আদৌ আমার অনুপস্থিতির তোয়াক্কা না করিয়া ইহা রূপায়ণের জন্য সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে যদি কংগ্রেসের সাংগঠনিক সহযোগিতা না পাওয়া যায় তাহা হইলে আমি বয়কট ও স্বদেশী লীগের নামে এই কর্মসূচী রূপায়ণের প্রস্তাব করি যে-সব বন্ধু আমার সহিত একমত আমি তাঁহাদের সকলকে বহরমপুরে আমার সহিত মিলিত হইয়া একটি সুসংহত কর্মপরিকল্পনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

বিবৃতি। ৩ ডিসেম্বর ১৯৩১

পদত্যাগ

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের নিকট পত্র।

মহাশয়,

আমার অল্ডারম্যান পদ ত্যাগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আমাকে যে অনুরোধ করা হইয়াছে সেই সহৃদয়তার জন্য আমি কলিকাতা কর্পোরেশনকে আন্তরিকতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে চাই। পদত্যাগ পত্র পেশ করার সময় আমি বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়াছিলাম। আমি মনে করি যে বর্তমান অবস্থায় আমি কর্পোরেশনের সদস্য না থাকিয়া বাহির হইতে জনগণের সেবা আরো ভালোভাবে করিতে পারিব। সুতরাং আমি পুনরায় আমার পদত্যাগ সমর্থন করিতে চাই।

২১ ডিসেম্বর ১৯৩১

মহারাষ্ট্র যুব-সম্মেলন

পুনায় অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র যুবসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

বর্তমানে যে অবস্থা বিদ্যমান সে সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর যুব সমাজ অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিজস্ব একটা স্বপ্ন আছে, একটা নিজস্ব ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি একটা মহত্তর অবস্থা সম্পর্কিত এবং তাহারা এখন সর্বত্র সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। আমরা স্বপ্নদ্রষ্টা ও কল্পনাবিলাসী হইতে পারি কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আজিকার স্বপ্ন আগামীকাল বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া নিজেদের জন্য ও আমাদের দেশবাসীদের জন্য একটা নূতন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে আমরা এখন বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা ও বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে গুরুতর সংগ্রামে নিরত।

এ বিষয়ে কোনো মহলে কোনো সংশয় থাকিতে পারে না যে আমরা এখন স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। এই উদ্‌গ্রীবতা প্রবল ও তীব্র এবং যে স্বাধীনতার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব তাহা হইল পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্য এই স্পৃহা যখন আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে তখন তাহা পূর্ণ মাত্রায় না পাইলে ইহার উপশম হইবে না। আমি জানি যে কেহ কেহ মনে করেন যে পূর্ণ মাত্রার স্বাধীনতা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না, কেননা তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব হইতে পারে। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ যেমন নাই তেমনই তাঁহাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়া আমরা নিজেদের সময় ও শক্তির অপচয় করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিব যে তাঁহাদের এবং আমাদের মধ্যে কিছু মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতা সকলের জন্য এবং ইহা যত বেশি পরিমাণে পাইতে পারি আমাদের নিজেদের এবং মানবজাতির পক্ষে তত বেশি মঙ্গল। স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদ আমাদের কিছুটা বেসামাল করিতে পারে, এমন-কি মাথা ঘুরাইয়া দিবার অনুভূতিও সৃষ্টি করিতে পারে; তবে শীঘ্রই ইহা আমাদের স্থিতধী করিয়া তুলিতে বাধ্য এবং তখন আমরা বুঝিতে পারিব যে স্বাধীনতা অপরিসীম বল ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির উৎস। কিন্তু বন্ধুগণ, যুব-সমাজের কণ্ঠ সহজে অন্যের শ্রবণগোচর হয় না। প্রায়ই সে কণ্ঠ রুদ্ধ করার

চেষ্টা করা হয় কিন্তু যাঁহারা মনোযোগ দিয়া শোনেন তাঁহারা সে রুদ্ধ কণ্ঠও শুনিতে পান। ভারতের ক্ষেত্রে এই কথা আমি বলিতে পারি যে এমন-কি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও যুবকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না। ফলে আপনারা দেশের কয়েকটি অংশে কখনো কখনো কংগ্রেস সংগঠন ও যুব-আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পান। যাঁহারা আমাদের কংগ্রেস সংগঠনের দায়িত্বে আছেন তাঁহাদের কাছে আমি এই মর্মে সনির্বন্ধ আবেদন করিব যে তাঁহারা যেন আমাদের সমাজের সকল চরমপন্থীদের কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দেন। এই চরমপন্থীরাই একটি দল বা সংগঠনের শক্তিস্বরূপ এবং আমার মতে আমাদের দল হইতে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কাহাকেও বাদ দেওয়া নিরাপদ কিংবা বাঞ্ছনীয় নয়।

গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা

গোল টেবিল বৈঠকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে আমার বিনীত অভিমত অনুসারে তাহার জন্য দায়ী দুর্ভাগ্যজনক শান্তি-চুক্তির সময় যুবকণ্ঠকে কম-বেশি অবহেলা করা। বস্তুত গোলটেবিল বৈঠক সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল বিবদমান দলগুলির মধ্যে। দুঃখের বিষয়, এমন-কি রাজানুগত, সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং নামগোত্রহীন ব্যক্তিদের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং মনে হয় ভারতের স্বাধীনতালাভ তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা ছিল খাঁটি জাতীয়তাবাদীদের পথে বাধা সৃষ্টি করা। এই অবস্থায় নিছক ধূম্রজালের মধ্যে যে সম্মেলনের অবসান হইবে তাহা কি বিস্ময়কর? আজিকার গোলটেবিল বৈঠক আমাকে আইরিশ সম্মেলনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল আয়ার্ল্যান্ডের সিন্-ফিন্‌দের ফাঁদে ফেলা। কিন্তু সিন্-ফিন্‌রা এই বিপদ পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন সেখানে আমরা সরাসরি তাহার মধ্যে পা দিয়াছি বলিয়া মনে হয়। যদি শান্তি-চুক্তির সময় আমরা দাবি করিতাম যে একমাত্র বিবদমান দলগুলিই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং আমরা যদি ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইতাম যে করাচী-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় জনগণের মৌলিক দাবিগুলি মানিয়া লওয়া হইবে ও একমাত্র এই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনার জন্য বৈঠক বসিবে তাহা হইলে আজ অবস্থা অন্যরূপ হইত। এ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে বৈঠক বসিয়াছিল

ভারত যে স্বরাজ পাইবে তাহার প্রকৃত রূপ নির্ধারণের জন্য নয়— বরং ভারত আদৌ স্বরাজ পাইবে, কি আংশিক পরিমাণে পাইবে তাহা আলোচনার জন্য। সেইজন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের দাবির বিরোধিতা করার জন্য নানা শ্রেণীর লোক সম্মেলনে আমদানি করা হইয়াছিল।

বাংলার পরিস্থিতি

শান্তি-চুক্তির সময় ভুলের দায়িত্ব শুধু কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নয়, সে দায়িত্ব ভারত সরকারেরও। আমার বলা উচিত যে সরকারের দায়িত্ব এখানে আরো বেশি ছিল। যে সময় শান্তি-চুক্তির শর্তগুলি আলোচিত হইতেছিল তখন এ দেশের দুইটি সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের— বৈপ্লবিক বন্দীদের এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের— সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হইয়াছিল। লর্ড আরউইনকে জানানো হইয়াছিল যে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে দেশের এই দুইটি সংগ্রামী গোষ্ঠীকে অবহেলা করা নিরাপদ কিংবা বাঞ্ছনীয় হইবে না কিন্তু সে পরামর্শে কোনো কাজ হয় নাই। শান্তি-চুক্তি ঘোষণার ফলে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইলেও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ও অন্যান্য বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মামলার যে-সব বন্দী দেশের বিভিন্ন অংশে ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই করা হয় নাই। আর সারা ভারতের বিভিন্ন কারাগারের বৈপ্লবিক বন্দীদের কথা হয় ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছিল নতুবা তাঁহারা অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই দুইটি গোষ্ঠী ছাড়াও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভুল হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া নামে কংগ্রেস ও ভারত সরকারের মধ্যে শান্তি-চুক্তি থাকিলেও কার্যত অবাধে নির্যাতন চলিয়াছিল। প্রতিদিন বিনা বিচারে আটক বন্দীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছিল। নির্যাতনের পরিমাণ ও সেইসঙ্গে তাহার বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহা ছাড়া ছিল অব্যাহত সরকারী প্ররোচনা যাহা বন্ধ করা কিংবা প্রতিনিবৃত্ত করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন এই প্ররোচনা, পরিপূর্ণ শক্তির আধার, যুবসমাজের মনে ক্রোধের সঞ্চার করিত এবং ফলে দুর্ভাগ্যজনক সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটিত, তখন ইংগ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এবং যাঁহাদের আমরা সরকারী সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করি সেই আমলাতন্ত্রের

দালালরা সমস্ত দোষ চাপাইতেন কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উপর। আমি যাহাকে সরকারী সন্ত্রাস বলি তাহা বন্ধ করায় কংগ্রেসের ব্যর্থতার দরুণ দেশের কয়েকটি অংশে, বিশেষ করিয়া বাংলায় যুবসমাজের উপর, কংগ্রেসের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস আমলাতন্ত্রের নির্যাতনমূলক নীতি বন্ধ করিতে পারিলে কংগ্রেসের অহিংস নীতির আবেদন অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ও সভামঞ্চ হইতে অহিংস নীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা বার বার যে সব আবেদন করিয়াছি তাহাতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় নাই।

মহাত্মার কী করা উচিত

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে মহাত্মা গান্ধী ভারতে পদার্পণ করা মাত্র সরকারের কাছে চরম পত্র পাঠাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করা উচিত। যখন সরকার নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহারা শান্তি-চুক্তির অবসান ঘটাইয়াছেন, তখন আমি বুঝি না যে কংগ্রেস কেন সেই চুক্তির ছায়া আঁকড়াইয়া থাকিবে। ইহার কায়া তো পুরাপুরি বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে।

২২ ডিসেম্বর ১৯৩১

বিপ্লব-পরিচালন নৈপুণ্য

১০ জুন ১৯৩৩ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশের একটি গভীর সংকটজনক সময়ে প্রবাসী আপনাদের ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাইতে আমাকে অনুমতি দান করুন। এই তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক অধিবেশনের আলোচনায় আমাকে সভাপতিত্ব করার নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন আপনাদের সহৃদয়তার পরিচায়ক। আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন ইহার জন্য আমি আপনাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সংগে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটি অহিংস সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি। কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাণপণ সংগ্রামের মাঝখানে নিঃশর্তভাবে আত্ম-সমর্পিত সেনাবাহিনীর অবস্থার অনুরূপ। এই আত্মসমর্পণ জাতির ইচ্ছায় ঘটে নাই। জাতীয় সেনাবাহিনী নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে বলিয়া ইহা ঘটে নাই। এমন-কি এই সেনাবাহিনী যুদ্ধ করিতে অস্বীকারও করে নাই। যুদ্ধের উৎসাহ স্তিমিত হয় নাই। এই আত্মসমর্পণ ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আমাদের সেনাধ্যক্ষ বারংবার অনশনের ফলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অথবা তাঁহার মন ও বিচার কতগুলি আত্মনিষ্ঠ কারণে মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এই কারণগুলি বাহিরের লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

অনুরূপ ঘটনা অন্য কোনো দেশে ঘটিলে কি হইত তাহা আমি জিজ্ঞাসা করি। একটি মহাযুদ্ধের অবসানে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পিত সকল সরকারের ক্ষেত্রে কি ঘটিত? কিন্তু ভারত একটি বিচিত্র দেশ।

১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণ আমাদের ১৯২২-এর বর্দৌলির পশ্চাদপসরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ১৯২২-এ যত অকেজোই হউক-না কেন এই পশ্চাদপসরণের সমর্থনে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যাইত। চৌরিচৌরায় হিংসার প্রাদুর্ভাব ১৯২২-এ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কারণরূপে দেখানো হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণের সপক্ষে কোনো ব্যাখ্যা বা ছলছুতো কী দেখাইতে পারেন?

কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে ১৯২০-তে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেদিন হইতে কোনো-না কোনো ভাবে এই আন্দোলন বিদ্যমান আছে এবং ইহাও সত্য যে ১৯২০-র ভাগ্যনিয়ন্ত্রক বৎসরটিতে এই আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছিল। কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে রাজনৈতিক ভারত একটি সংগ্রামী কর্মপন্থার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিল, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি জনসাধারণের অবিতর্কিত মুখপাত্ররূপে সেইদিন দাঁড়াইতে পারিতেন এবং জনসাধারণকে জয়ের পথে পরিচালনা করিতে পারিতেন। আরো সন্দেহ থাকিতে পারে না যে গত এক দশকে ভারত এক শতাব্দীর অগ্রগতি সাধন করিয়াছে। আজ ভারতীয় ইতিহাসের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া— ইহা খুবই উপযুক্ত ও যথাযথ মনে হইতেছে যে আমাদের অতীতের ভুলগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে

আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি যথার্থ পথে পরিচালিত হইতে পারে এবং আমরা গুপ্ত বিপদগুলি পরিহার করিতে পারি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত। একটি হইতেছে আপসহীন যুদ্ধের পথ। আমরা যদি প্রথম পথ অনুসরণ করি তাহা হইলে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা পর্যন্ত চালাইতে হইবে এবং স্বাধীনতার পথে কোনো আপসের কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু অন্যদিকে যদি আমরা দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করি তাহা হইলে বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের নূতন উদ্যম গ্রহণের পূর্বে শক্তি সংহত করার জন্য মাঝে মাঝেই আপস করিতে হইতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মনে হইতে পারে যে ইহা আদৌ সুস্পষ্ট নয় আমাদের আন্দোলন গত তেরো বৎসরে আপসহীন সংগ্রাম না আপসের পথ অনুসরণ করিতেছে। এই আদর্শগত সার্থকতার জন্য অনেক বিপর্যয় দায়ী। যদি আমাদের নীতি আপসহীন সংগ্রামের হইত তবে ১৯২২-এর বর্দৌলি আত্মসমর্পণ কখনোই ঘটিত না। ১৯৩১-এর মার্চের দিল্লী-চুক্তিতেও আমরা আবদ্ধ হইতাম না, অন্যদিকে যদি আমরা আপসের পথ অনুসরণ করিতাম, তবে আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে দর-কষাকষির সুযোগ হারাইতাম না। কেননা, তখন পরিস্থিতি রীতিমত সুবিধা-জনক ছিল। '১৯৩১-এর মার্চে পরিস্থিতি আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে সুবিধা জনক ছিল না। তথাপি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছিল, ১৯৩১-এর মার্চে আমাদের শক্তি বিবেচনা করিলে এই যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। এক কথায় রাজনৈতিক যোদ্ধারূপে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে যোদ্ধৃ মনোভাবা-পন্ন বা কূটনৈতিক কোনোটাই ছিলাম না।

ভারতীয়দের মতো নিরস্ত্র পরাধীন জাতি ও গ্রেটব্রিটেনের মতো প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ, জন-সাধারণের উৎসাহকে জাগরূক রাখা ও সরকারের প্রতি বিরোধিতার মনোভাব বজায় রাখার উপর নির্ভর করে। সুশিক্ষিত ও সমরোপকরণ সজ্জিত দুইটি বাহিনীর মধ্যেকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আমাদের ক্ষেত্রের মতো এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯২২-এ যখন সমগ্র জাতি আবেগপূর্ণ কর্মে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং মহত্তর সাহস ও আত্মোৎসর্গ জনসাধারণের নিকট হইতে আশা

করা গিয়াছিল তখন সেনাধ্যক্ষ আকস্মিক ভাবে শ্বেতপতাকা উত্তোলন করিলেন। এই ঘটনাটি কয়েকমাস পূর্বে তিনি একটি অনন্যসুযোগ হারাইবার ঠিক পরে ঘটিল, কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমলাতন্ত্রের সংগে সম্মানজনক আপসের একটি সুযোগ ঘটিতে পারিত।

অতীত ইতিহাসের শিক্ষা নেওয়া বা মনে রাখা সহজ নয়। ভারতের সর্বশেষ ঘটনার অগ্রগতি ইহাই প্রমাণ করে যে, আমরা এখনো ১৯২১ এবং ১৯২২-এর শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যবশত পবিত্র স্মৃতিজড়িত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯৩১-এ মৃত্যুর ফলে ভারতীয় প্রেক্ষাপট হইতে দুইজন সুদক্ষ রাজনৈতিক নেতা অপসারিত হইলেন। তাঁহারা ভারতকে এখনকার রাজনৈতিক বিশৃংখলা হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল, তখন স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাবের সর্বসম্মত গ্রহণের মধ্যেই আমাদের জনসাধারণের জাগ্রত চেতনার একটা ইংগিত স্ফুরিত হইয়াছিল। ১৯২৮-এর আরম্ভে যখন সাইমন কমিশন বোম্বাইতে পেঁাছিল, তখন সারা ভারতব্যাপী বিক্ষোভ ১৯২১-এর গৌরবময় দিনগুলির কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল, একদিক হইতে ১৯২১-এর তুলনায় ১৯২৮-এর পরিস্থিতি অনেক অনুকূল ছিল। কেননা ১৯২১-এর ভারতীয় উদারনৈতিক নেতারা সক্রিয়ভাবে কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৯২৮-এ তাঁহারা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী হইলেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযানে কংগ্রেস এবং উদারনৈতিকদের একটি যুক্ত মোর্চা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯২২-এ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক খামখেয়ালী ভাবে প্রত্যাহৃত সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করার একটি সুযোগ সাইমন কমিশনের আগমনের উপলক্ষে ঘটা উচিত ছিল। তবু আমরা সম্পূর্ণ দুই বৎসর ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করিলাম। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলিকাতা-কংগ্রেসে আনুমানিক ১৩০০/৯০০ ভোটে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসকে দিয়া ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস গ্রহণে বাধ্য করিয়া ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিল। এইভাবে কলিকাতায় আমরা শুধু ১৯২৭-এর ডিসেম্বরের মাদ্রাজের অবস্থা হইতেই পিছু হটিলাম না, এমন-কি ১৯২০-এর ডিসম্বরে নাগপুরের অবস্থা হইতেও পিছাইয়া আসিলাম। কেননা অস্পষ্ট শব্দ যোজনা সত্ত্বেও স্বরাজ বিষয়ক

নাগপুর প্রস্তাবটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে ভারতীয় জন-সাধারণের লক্ষ্য রূপে স্বাধীনতাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল, স্বায়ত্তশাসন (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস) নয়।

কলিকাতা-কংগ্রেসের প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারকে এক বৎসরের সময় দিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতকে ইহা দেওয়ার কোনো ইচ্ছা সরকারের ছিল না, তাই ১৯২৯-এর শেষদিকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভের কোনো আশা না থাকায় কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে পরিস্থিতি সংকটজনক হইয়া দাঁড়াইল। লাহোর-কংগ্রেসের পূর্বে ১৯২৯-এর নভেম্বরে কংগ্রেস নেতারা আর একটি উপায়ের কথা বলিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হইল না। যদি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ভারত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাইবে তাহা হইলে দিল্লী-ইস্তাহার নামে পরিচিত ঘোষণায় নেতারা লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন।

১৯২৮-এ কলিকাতা-কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বিষয়ক প্রস্তাবের যাঁহারা বিরোধিতা করার ঔদ্ধত্য ও ১৯২৯-এর নভেম্বরের দিল্লী-ইস্তাহারের নিন্দা করার ধৃষ্টতা দেখাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম, আমরা ইহাই বলিয়াছিলাম যে গোলটেবিল বৈঠক এই নামের অনুপযোগী। কেননা ইহা বিভিন্ন বিবদমান দলের প্রতিনিধিস্থানীয় পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতি-নিধিদের অধিবেশনরূপে আহূত হয় নাই। নামগোত্রহীন বিদেশী সরকার নির্বাচিত বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সেখানে ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের নিলাম ডাকাডাকির কাজে উপস্থিত থাকিবেন। অধিকন্তু, এই সম্মেলনে হঠাৎ কোনোক্রমে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবও হয় তবু এই সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইতে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য থাকিবেন না। আমরা ইহাও বলিয়াছিলাম যে, এই বৈঠক আহ্বানে সরকারের একটি মাত্র লক্ষ্য হইতেছে ইংলন্ডে ভারতীয়দের আনা এবং ব্রিটিশ জনসাধারণের মজা দেখার জন্য তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধাইয়া দেওয়া। আমরা তাই জোর দিয়াছিলাম যে যেমন সিনফিনগণ মিস্টার লয়েড জর্জের সৃষ্ট আইরিশ কনভেনশনকে বয়কট করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠক পরিহার করা উচিত।

কিন্তু ইহা আমাদের অরণ্যে রোদন হইল। সরকারের বিরুদ্ধে যে আসন্ন

সংগ্রাম প্রতিদিন অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছিল, তাহা হইতে সম্মানজনক পরিত্রাণ লাভের জন্য নেতৃগণ সকলে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এইজাতীয় কোনো সুযোগ সরকার দেন নাই। ফলে স্বাধীনতা বিষয়ক প্রস্তাব গলাধঃকরণ ছাড়া নেতাদের পক্ষে অন্য কোনো বিকল্প না থাকায়, যখন ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেস বসিল, তখন জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু যে স্বাধীনতা বলিতে ব্রিটিশের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ বোঝায় সে স্বাধীনতা এমন একটি বড়ি যাহার স্বাদ তিক্ত ও হজম করা কঠিন। যখন কংগ্রেস সর্বসম্মত ভাবে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিল এবং ইহার ফলে চিরকালের মতো গত নয় বৎসরের গয়ংগচ্ছ ভাবের অবসান ঘটিল, তখন দেশের মডারেটপন্থীরা ভীত হইয়া উঠিলেন। আমাদের নেতারা কোনো সময় না হারাইয়া তাহাদের পুনরায় আশ্বস্ত করার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে সুন্দর সুন্দর শব্দগুচ্ছ ও মজাদার শ্লোগান সৃষ্টি করা হইল। আমাদের বলা হইল যে স্বাধীনতা বলিতে পূর্ণ স্বরাজ বুঝায়। (ইহা এমন একটি প্রকাশভঙ্গি যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতে পারে) মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০-এর প্রথমদিকে তাঁহার বিখ্যাত "১১ দফা" প্রকাশ করিলেন, তাঁহার মতে এই ১১ দফা বলিতে স্বাধীনতার সার বোঝায় এবং এইগুলি ব্রিটিশ সরকারের সংগে একটি আপসের ভিত্তিভূমি রচনা করিতে পারে। এইভাবে নেতাদের নিজেদের কার্যকলাপে লাহোর-কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাবের তাৎপর্য ও প্রভাব অনেকটা নিষ্ফল হইয়া গেল।

লাহোর-কংগ্রেসের পর নেতাদের পক্ষে আর কিছু না করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়া তাই আন্দোলন আরম্ভ হইল। এপ্রিল মাসের মধ্যে সমগ্র ভারত বিপ্লবের যন্ত্রণার মধ্যে জাগিয়া উঠিল, (হইতে পারে ইহা অহিংস বিপ্লব) সংগ্রামের আহ্বানে জনসাধারণের সাড়া এমন সর্বব্যাপী হইয়া উঠিল যে এমন-কি মহাত্মা গান্ধীও বিস্মিত বোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে আন্দোলন দুই বৎসর পূর্বে আরম্ভ করা যাইত।

১৯২১-এর পূর্ববর্তী আন্দোলনের মতোই ১৯৩০-এর আন্দোলন সরকারকে বিস্মিত করিল, এবং অনেকদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন দমনের কার্যকরী পন্থা নির্ণয় করিতে গিয়া সরকার বিমূঢ় অবস্থায় কাটাইল।

অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতকে সাহায্য করিল। ১৯৩১-এর মার্চে দিল্লী চুক্তি নামে (গান্ধী-আরউইন চুক্তি) পরিচিত চুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রাম স্থগিত রাখা তাই একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এমন-কি নেতারা যদি আপস করিতে চাহিতেন তাহা হইলে তাঁহারা আরো সুবিধাজনক মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে পারিতেন। এমন মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসিত, যদি সংগ্রাম আরো ছয়মাস বা একবছর অব্যাহত থাকিত। কিন্তু আবার আত্মনিষ্ঠ দিকগুলি প্রাধান্য পাইল। বস্তুনিষ্ঠ উপাদান ও বিবেচনা-গুলি দিল্লী চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার সময় বিবেচিত হইল না। আমি এতদূর পর্যন্ত বলিতে চাই যে যদি আমাদের নেতারা আরো বেশি রাষ্ট্রনায়কতা ও কূটনীতির অধিকারী হইতেন তবে ১৯৩১-এর মার্চে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আরো উৎকৃষ্টতর শর্ত সরকারের নিকট হইতে আদায় করা যাইত।

অবস্থা যাহা দাঁড়াইল, তাহাতে দিল্লী চুক্তি সরকারের কাছে সুবিধা হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণের কাছে সর্বনাশা হইল। ১৯৩০ ও ১৯৩১-এ কংগ্রেস সংগঠনগুলি কর্তৃক গৃহীত উপায়পদ্ধতি বিশ্লেষণ করার সময় সরকার পাইলেন। তাহাতে কংগ্রেস যখনই আবার আন্দোলন করিবে তখনই মারাত্মক আঘাত হানার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বনের সুযোগ তাঁহারা পাইলেন। ইহা এখন সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে সরকার-ঘোষিত অর্ডিন্যান্স এবং এই সারা বৎসর ধরিয়া তাহাদের অনুসৃত কলা-কৌশল ১৯৩১ শেষ হইবার পূর্বে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কংগ্রেস কি করিয়াছিল? সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে ও বাংলায় বিক্ষোভ যখন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, তখন তাহা সত্ত্বেও আমাদের নেতারা পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে কিছুই করিলেন না। বস্তুত এ কথা বলিলে, ভুল হইবে না যে, পুনরায় সম্ভাব্য বিরুদ্ধাচরণ পরিহার করার জন্য শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু করা হইয়াছিল।

জনসাধারণের উৎসাহ ও আবেগকে ঘুম পাড়াইয়া রাখার জন্য দিল্লী-চুক্তি কার্যকরী হইয়াছিল। তবু জনসাধারণের মেজাজ শুধুমাত্র ভালো ভালো কথায় ঠাণ্ডা হইবার পক্ষে বড়ো বেশি মারমুখী ছিল। এই যদি অবস্থা না হইত, আমি নিশ্চিত যে নেতারা সাফল্যের সঙ্গে পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ পরিহার করিতেন। ভবিষ্যতের কর্মীদের ইহা উপলব্ধি করা উচিত, যেভাবে

হওয়া উচিত ছিল সেইভাবে ১৯৩২-এর আন্দোলন পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয় নাই। নেতারা তাহার মধ্যে কোনোক্রমে জোর করিয়া জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ধারণা যদি সত্য হয়, তবে ইহা কি কাহাকেও বিস্মিত করিবে যে ১৯৩২-এর জানুয়ারিতে যে অসুবিধার মধ্যে তাঁহারা বাধ্য হইয়া জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য আজ নেতারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন?

১৯৩১-এর মার্চের দিল্লী-চুক্তি আমরা যত বেশি বিশ্লেষণ করি, তত বেশি বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হয়:

১. প্রথমত, মূল সমস্যা স্বরাজ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতির একটি মাত্র শব্দও ইহাতে ছিল না।
২. দ্বিতীয়ত, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ফেডারেশনের প্রস্তাবে একটি মৌন স্বীকৃতি ইহাতে ছিল। আমার বিনীত মতে এই প্রস্তাবে দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে মারাত্মক।
৩. তৃতীয়ত, নিরস্ত্র স্বদেশবাসীর উপর গুলি করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে অহিংসার মূর্ত গাড়োয়ালী সৈন্য সেই কারারুদ্ধ সৈন্যদের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
৪. চতুর্থত, বিনাকারণে, অভিযোগে বা বিচারে কারারুদ্ধ রাজবন্দী ও অন্তরীণদের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
৫. পঞ্চমত, কয়েক বৎসর ধরিয়া যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার জের চলিতেছিল, ইহা প্রত্যাহারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
৬. ষষ্ঠত, আইন অমান্য আন্দোলনের যোগদানের জন্য অভিযুক্ত হয় নাই এমন অন্যান্য শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

এইভাবে দেখা যাইবে যে গাড়োয়ালী সৈন্যদের, রাজবন্দীদের, মীরাট-ষড়যন্ত্রের বন্দীদের ও বিপ্লবী বন্দীদের উদ্দেশ্যের পক্ষাবলম্বনে অস্বীকার করিয়া দিল্লী-চুক্তি প্রমাণ করিয়াছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতে সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে নিজের দাবিকে অস্বীকার করিল। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মুখপাত্র হইতে অস্বীকার করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের সম্মুখে শুধুমাত্র সত্যাগ্রহীদের মুখপাত্র-রূপে প্রতিভাত হইল।

১৯৩১-এর মার্চের দিল্লী-চুক্তি ভুল ছিল। ১৯৩৩-এর মে মাসের আত্মসমর্পণ মস্তবড়ো একটি বিপর্যয়, রাজনৈতিক রণকৌশলের নিয়মানুসারে যখন ভারতের নতুন সংবিধান প্রস্তুতির পথে, তখন ঠিক সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন সারাদেশে শক্তিশালী করিয়া সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত ছিল। এই সংকটজনক সময়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া ত্রয়োদশ-বর্ষব্যাপী জাতির কর্ম, দুঃখবরণ ও ত্যাগ বস্তুতপক্ষে ব্যর্থ হইল। পরিস্থিতির ট্রাজেডি হইতেছে যে লোকগুলি কার্যকরী ভাবে এই স্থলে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারিতেন তাঁহারাও কারান্তরালে নিরাপত্তার সঙ্গে আবদ্ধ রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ২১ দিনের অনশনের ফলে কোনো সত্যিকারের প্রতিবাদ জেলের বাহিরে যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের পক্ষেও করা সম্ভব হইল না।

কিন্তু এইবার সুযোগ আসিয়াছে। একমাসের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার সত্যকথা বলিতে কি স্থায়ী প্রত্যাহারই বোঝায়। কেননা গণ-আন্দোলন রাতারাতি সৃষ্টি করা যায় না। তাই আমাদের কাছে এখন সমস্যা হইতেছে এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতির বেশি পরিমাণ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আমাদের কি করা উচিত? ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কোন্ নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত?

এই সমস্যা সমাধানের পূর্বে আমাদের দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে:

১. প্রথম প্রশ্ন আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে, ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে কোনো আপস কি শেষ পর্যন্ত সম্ভব?

২. দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের পদ্ধতি সম্পর্কে, ভারত কি সাময়িক আপসের পথ অনুসরণ করিয়া এবং আপসহীন মারমুখী সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, এইরকম কোনো আপস সম্ভব নয়। স্বার্থের ঐক্য যখন আছে, তখনই শুধুমাত্র রাজনৈতিক আপস সম্ভব। কিন্তু ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে এমন কোনো অভিন্ন স্বার্থ নাই যাহা এই দুইটি জাতির মধ্যে আপস সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় করিয়া তুলিতে পারে। নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি হইতে আমরা ইহা দেখিতে পাইব।

১. এই দুইদেশের মধ্যে কোনো সামাজিক আত্মীয়তা নাই।

২. ভারত ও ব্রিটেনের সংস্কৃতির মধ্যে অভিন্ন বলিতে কিছুই নাই।

৩. অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারত ব্রিটেনের কাছে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ, এবং ভারত ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজার। অন্যদিকে, ভারত শিল্প-উৎপাদনকারী একটি দেশ হইতে চায়। এইভাবে সে শিল্প-দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে। এবং তাহার ফলে ভারত শুধু কাঁচামাল নয় শিল্পজাত পণ্যও রপ্তানী করিতে পারে।

৪. বর্তমানে ভারত গ্রেটব্রিটেনের বৃহত্তম বাজারগুলির অন্যতম। তাই ব্রিটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী ভারতের শিল্পগত প্রগতি।

৫. ভারত তরুণ ব্রিটিশদের সৈন্যব্যাহিনীতে এবং বেসামরিক প্রশাসনে এই দেশে কর্মলাভের সুযোগ দেয়। ইহা ভারতের স্বার্থের বিরোধী। ভারত চায় তাহার নিজের দেশের মানুষ এই-সব পদ লাভ করুক।

৬. ভারত যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী। গ্রেটব্রিটেনের পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্য ছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার মতো অনেক সম্পদ ভারতের আছে। এই ক্ষেত্রে অন্যান্য উপনিবেশগুলির অবস্থা হইতে ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৭. ভারত এতকাল যাবৎ গ্রেটব্রিটেনের স্বারা শাসিত ও অত্যাচারিত হইয়াছে। এমন একটা যথার্থ আশঙ্কা আছে যে এই দুই দেশের রাজনৈতিক আপস ঘটিলে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ও ব্রিটেন লাভবান হইবে। দীর্ঘকাল দাসত্বের ফলে ভারতের হীনমন্যতা বোধ দেখা দিয়াছে। যতকাল পর্যন্ত ব্রিটিশের হাত হইতে ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হইবে ততকাল এই হীনমন্যতা বোধ থাকিবে।

৮. ভারত চায় স্বাধীন দেশের মর্যাদা। সেই দেশের নিজের পতাকা থাকিবে, নিজের সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও প্রতিরক্ষাবাহিনী থাকিবে। স্বাধীন দেশগুলির রাজধানীতে ভারতের রাষ্ট্রদূতগণ আসন লাভ করিবেন। এই বল ও প্রাণদায়িনী স্বাধীনতা ব্যতীত মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইতে ভারত কখনোই সমর্থ হইবে না। ভারতের নিকট স্বাধীনতা একটি মনস্তাত্বিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন। ভারতের নবজাগরণের জন্য ইহা এক অত্যাবশ্যক শর্ত। ভারত আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে ইহা কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' নহে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বা ফরাসীদেশে লব্ধ পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ভারতের আকাঙ্ক্ষিত।

৯. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যতদিন ভারত আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন সে সাম্রাজ্যের অন্য অংশে বসবাসকারী অন্য ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গদের দিকে গ্রেটব্রিটেনের পক্ষপাতিত্ব চিরকাল আছে ও থাকিবে। অন্যদিকে স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী তাহার সন্তানদের প্রতি সুবিচার আদায় করিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে দেখা যাইবে যে ভারত ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে আপসের কোনো ভিত্তি নাই। ফলে যদি ভারতীয় জনগণের নেতৃগণ এই মৌলিক সত্য অস্বীকার করেন ও গ্রেট ব্রিটেন সরকারের সঙ্গে আপসে আবদ্ধ হন, তবে তাহা স্থায়ী হইবে না। ১৯৩১-এর মার্চের গান্ধী-আরউইন চুক্তির মতো ইহা ক্ষণস্থায়ী হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে সক্রিয় সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি এমন রূপ গ্রহণ করিয়াছে যে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে এইদেশের ন্যায়সংগত আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতা লাভের পূর্বে কোনো শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

বর্তমান অচল অবস্থার একমাত্র সমাধান ভারতের স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়াই সম্ভব। ইহার দ্বারাই বোঝায় ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পরাজয়। কিভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এখন আমাদের তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

কোন্ পদ্ধতি আমাদের অবলম্বন করা উচিত সেই দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে দেশ সাময়িক আপসের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে। দেশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জানাইয়াছিল এই কারণে যে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং এই সত্য বাস্তবে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণের সময় চিরকালের মতো সাময়িক আপসের সম্ভাবনাকে পরিহার করা উচিত।

অসহযোগ এবং আইন অমান্যের মধ্য দিয়া দেশের বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা অচল করিয়া ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশা কংগ্রেস করিয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে আমরা আরো সফল হইতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইহার সংগে সম্পর্ক একটি তুলনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যায়। অবস্থাটা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত একটি সামরিক ঘাঁটি যেন এমন একটি অঞ্চলের মধ্যে স্থান পাইয়াছে যে অঞ্চল হঠাৎ শত্রুমনোভাবাপন্ন হইয়াছে। এখন সামরিক ঘাঁটিটি যতই সুসজ্জিত হোক যে তাহার নিরাপদ অস্তিত্বের জন্য নিকটবর্তী ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের বন্ধুমনোভাবাপন্ন না হইলে চলে না। কিন্তু এমন-কি পার্শ্ববর্তী জনসাধারণ যদি শত্রুমনোভাবাপন্ন হয়ও সামরিক ঘাঁটি নিকট-ভবিষ্যতে জনসাধারণ যদি ইহা দখল করিতে উদ্যোগী না হয় তবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বেদখল এই ঘাঁটিটি হাতে নেওয়াই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেস এই ঘাঁটির নিকটবর্তী ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে সফল হইয়াছে। ভারতীয়দের দিক হইতে ইহাই অভিযানের প্রথম স্তর। অভিযানের দ্বিতীয় স্তরের দিক হইতে নিম্নলিখিত দুইটি উদ্যোগই বা দুইটির একটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১. ঘাঁটি দখলকারী সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে একটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ।

২. অস্ত্রের সাহায্যে এই ঘাঁটি দখল করার একটি উদ্যম।

যুদ্ধের ইতিহাসে এই দুই পদ্ধতি সাফল্যের সংগে অনুসৃত হইয়াছে। গত বিশ্বযুদ্ধে সামরিক দিক হইতে জার্মানি বিজয়ী ছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে অনশনক্লিষ্ট হইয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। জার্মানিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং সমুদ্রের উপর মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে এই অবরোধ সম্ভব হইয়াছিল।

কংগ্রেস অহিংস নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুর ঘাঁটি ছারখার করিয়া দেওয়ার কোনো উদ্যম ভারতে নেওয়া হয় নাই। কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক অবরোধের পরিকল্পনা সাধারণভাবে তিনটি কারণে ব্যর্থ হইয়াছে।

ক. ভারতমুখী সমস্ত বৈদেশিক যোগাযোগ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

খ. ভারতের অভ্যন্তরে ত্রুটিপূর্ণ সংগঠনের জন্য সামুদ্রিক বন্দরগুলি হইতে অভ্যন্তরে এবং দেশের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কংগ্রেসের দ্বারা নয়।

S. S. Gange জাহাজে। মার্চ ১৯৩৩

বাদগাস্টাইন, অস্ট্রিয়া ৯৩
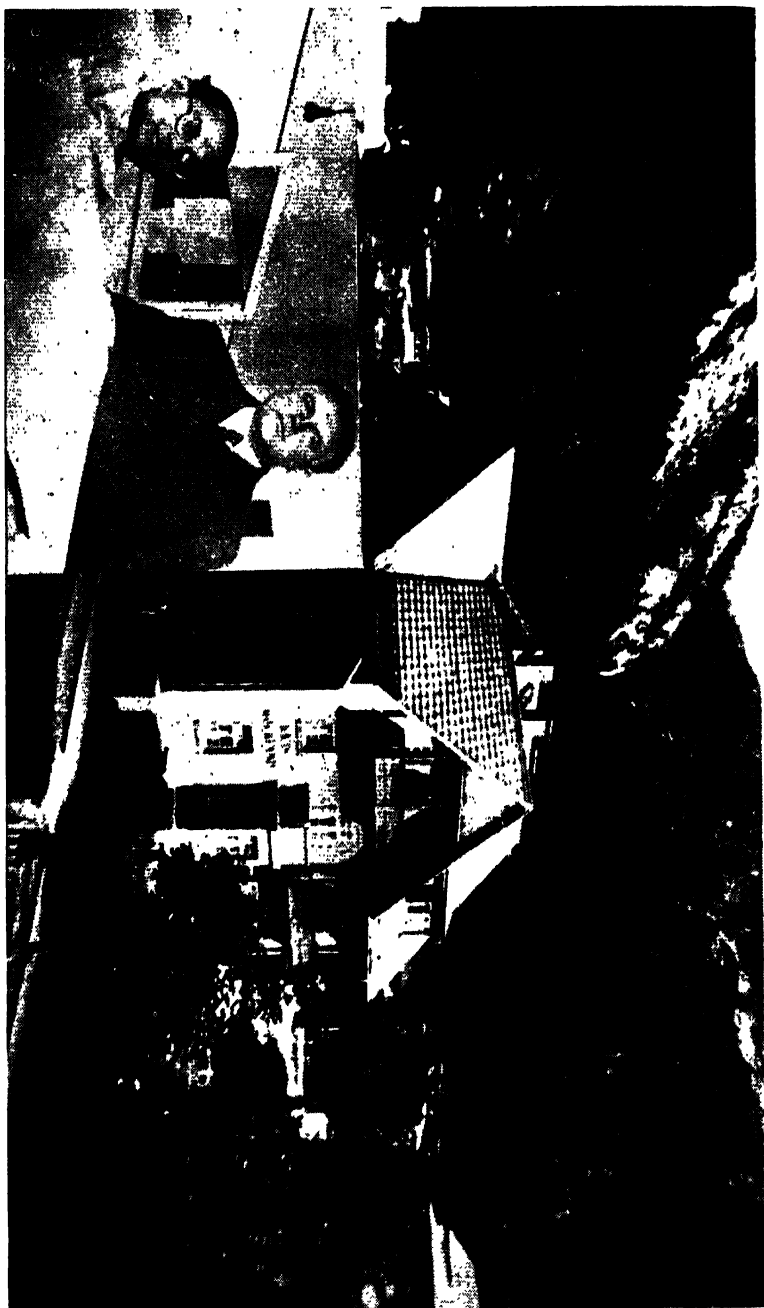
গ. যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার উপর ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

অধিকাংশ প্রদেশে নিঃসন্দেহে ঘাটতি চলিয়াছে কিন্তু সরকার অবস্থার মোকাবিলা করিতে বর্ধিত কর অথবা ঋণ গ্রহণের মধ্য দিয়া অবস্থার মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

ইহা সবসময় মনে রাখা উচিত যে একটি জাতীয় আন্দোলন একটি বিদেশী সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির সবকয়টি বা দু-একটি অনুসরণ করিয়া অচল করিয়া দিতে পারে।

১. কর ও রাজস্ব সংগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়া।

২. অর্থনৈতিক অথবা সামরিক যে প্রকার সাহায্যই হউক কোনো দিক হইতেই যাহাতে বিপদের সময় সরকারের কাছে পেঁছিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

৩. সৈন্যবাহিনী, পুলিশ এবং বেসামরিক কর্মচারী যাহারা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থক তাহাদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করা চাই। তাহা হইলে আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার-প্রদত্ত আদেশগুলি পালিত হইবে না।

৪. অস্ত্রের সাহায্যে ক্ষমতা দখলের সত্যিকারের ব্যবস্থা।

শেষ ব্যবস্থাটি আমাদের পরিহার করিতে হইবে। কেননা কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু তবু বর্তমান প্রশাসনকে অচল করা সম্ভব। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে আমাদের দাবি মানিয়া নিতে তাহাদের বাধ্য করাও সম্ভব।

১. কর ও রাজস্ব সংগ্রহ বন্ধ করিতে হইবে।

২. বিপদগ্রস্ত সরকারের কাছে কোনো সাহায্য যাহাতে পেঁছিতে না পারে তাহার জন্য শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩. আমাদের উচ্চতর প্রচারের মাধ্যমে সরকারের নিজেদের সমর্থকদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিতে হইবে।

এই তিনটি পন্থা যদি গৃহীত হয়, সরকারী যন্ত্রকে অচল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, প্রথম ক্ষেত্রে প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহের মতো অর্থ তাহাদের থাকিবে না। দ্বিতীয়ত যে-সব আদেশ দেওয়া হইবে, সেগুলি তাহাদের কর্মচারীরা পালন করিবেন না। সর্বশেষে, অন্যান্য সূত্র হইতে প্রেরিত সাহায্য তাহাদের কাছে পেঁছিবে না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের কোনো সোজাসুজি পথ নাই। উপরের তিনটি পন্থা অংশত বা সম্পূর্ণত জয়লাভের জন্য অবলম্বন করিতে হইবে। একমাত্র এই তিনটি পন্থার একটাও সন্তোষজনকভাবে রূপদানের ক্ষেত্রে সফল না হওয়ার জন্যই কংগ্রেস ব্যর্থ হইয়াছে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গত কয় বৎসরে অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিরোধের মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং সরকারেরও বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে সরকারের অস্তিত্বের গোড়া ধরিয়া টান দেওয়া এখনো সম্ভব হয় নাই, ১৯৩২-এর জানুয়ারির পর হইতে আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ সত্ত্বেও এবং সত্তর হাজার মানুষ কারারুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সরকার এখনো দাবি করিতে পারেন :—

১. তাহাদের সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।

২. তাহাদের পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।

৩. বেসামরিক প্রশাসন (রাজস্ব ও কর সংগ্রহ, আইন-আদালত ও জেল ইত্যাদির প্রশাসন) এখনো অক্ষত।

৪. সরকারী অফিসার ও তাহাদের সমর্থকগণের জীবন ও সম্পত্তি এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এখনো সরকার গর্ববোধ করিতে পারেন যে ভারতের সাধারণ মানুষ আজও তাহাদের প্রতি নিষ্ক্রিয়ভাবে শত্রুভাবাপন্ন। যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে অস্ত্রের সাহায্যে অথবা কার্যকরী অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে সরকার ও তাহার সমর্থকগণকে সক্রিয়ভাবে ভীতি প্রদর্শন না করিতেছেন, ততদিন বর্তমান সরকার অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন সত্ত্বেও অনির্দিষ্টকালের জন্য অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন।

গত এক দশকে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটিয়াছে, জনসাধারণের শান্ত আত্মসন্তুষ্টির ভাব কাটিয়া গিয়াছে, সমগ্র দেশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নবজীবনের আবেগে স্পন্দিত হইতেছে। সরকারী ভ্রূকুটি, কারারুদ্ধ হওয়া এবং লাঠিচার্জের ভয় দূর হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশের মর্যাদায় ভাঁটা পড়িয়াছে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কোনো শুভেচ্ছার কথা উঠিতে পারে না। ব্রিটিশ-শাসনের নৈতিক ভিত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা আজ উন্মুক্ত তরবারী ছাড়া আর কোনো-কিছুর উপর নির্ভর করিতেছে না। ভারত সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি সত্য স্বীকার করিতে হইবে যে 'স্বাধীন ভারত' এখনো ভবিষ্যতের বস্তু। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যেভাবে সম্প্রতি প্রকাশিত শ্বেত পত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে একটি ব্যাপার সুস্পষ্ট যে তাহারা সামান্য পরিমাণ সত্যিকারের ক্ষমতা ত্যাগ করিতে এখনো প্রস্তুত নয়। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ সরকার মনে করে যে ভারতীয় জনসাধারণের দাবি সাফল্যের সংগে প্রতিরোধ করিতে তাহারা যথেষ্ট শক্তিশালী। যদি তাহারা আমাদের প্রতিরোধ করিতে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহাতে বোঝা যায় ১৯২০-র পর হইতে ভারতীয় জন-সাধারণের বিপুল চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরাজ্যের লক্ষ্যের দিকে বোধগম্যভাবে অগ্রসর হইতে ব্যর্থ হইয়াছে তাই ভারতকে আর-একটি বৃহত্তর এবং আরো সর্বব্যাপী স্তরে সংগ্রাম আরম্ভ করার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্য চিন্তা-জগতে ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রস্তুতি অতি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। ইহা বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে। এই কাজের জন্য চিন্তাজগতের প্রস্তুতিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করিতে হইবে :—

১. ভারতীয় জনসাধারণের তুলনায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সবল ও দুর্বল দিক্‌গলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

২. ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তুলনায় ভারতীয় জনসাধারণের সবল ও দুর্বল দিক্‌গুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

৩. পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

৪. অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং এই পৃথিবীতে সমস্ত দিক্ হইতে স্বাধীনতার ক্রমিক বিকাশের অধ্যয়ন।

যখন এই অধ্যয়ন শেষ হইবে তখনই, তার পূর্বে নয়, আমরা আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা গড়িতে সমর্থ হইব।

যত দুঃখ ও ত্যাগই জড়িত থাকুক-না কেন, তাহা অস্বীকার করিয়া একদল সংকল্পদৃঢ় নরনারী ভারতের মুক্তি-সাধনের জন্য দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিবে। এই হইবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ। ভারতে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব বিকশিত হইবে কিনা তাহার উপর ভারত নিজেকে স্বাধীন করিতে ও পুনরায় স্বাধীনজাতির মতো জীবন যাপন করিতে পারিবে কিনা তাহা

নির্ভর করিতেছে। প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব-বিকাশের সামর্থ্য, স্বরাজ লাভের যোগ্যতা ও তাহার প্রাণচাঞ্চল্যের অগ্নিপরীক্ষা স্বরূপ হইবে।

আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন হইবে সংগ্রামী একটি বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী। এখন হইতে যে সংগ্রাম-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে এবং ক্ষমতা দখল পর্যন্ত অনুসৃত হইবে, তাহার সম্পূর্ণটা আমাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে ধরা পড়া চাই। মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা বিস্তৃতভাবে সংগ্রামের পদ্ধতির পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। তাই ভবিষ্যতের আন্দোলন এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহা মানুষের প্রকৃতি এবং ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি রাজনৈতিক অভিযান, যাহা কিনা মোটের উপর একটি বস্তুনিষ্ঠ আন্দোলন, তাহা পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর-আলোক (Inner Light) এবং আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

ক্ষমতা দখলের সার্থক সংগ্রামের একটি পরিকল্পনা ছাড়াও, নতুন ব্যবস্থা ভারতে কার্যকরী হইবার পর একটি পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা হইবে, আকাস্মিকতার উপর কোনো কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে নরনারী গোষ্ঠী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, তাহাদেরই নতুন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও বিকাশের দায়িত্ব নিতে হইবে, এবং সেই রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের দায়িত্বই তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমাদের নেতৃগণ যুদ্ধোত্তর নেতৃত্বের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত না হন তবে এমন সম্ভাবনা আছে অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির অনুরূপ বিশৃংখলার একটি পর্বের ভারতে পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। তাই ইহা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ভারতের যুদ্ধকালীন সেনাপতিদের যুদ্ধোত্তর সংস্কারের সমগ্র পরিকল্পনার রূপদান করিতে হইবে এবং এইভাবেই যুদ্ধের সময় এই দেশবাসীর আশা-আকাংক্ষার যোগ্য হইতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত না নারী-পুরুষের একটি নতুন প্রজন্ম নবরাষ্ট্র গঠনের পরে দক্ষতার ও যোগ্যতার প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া দেশ-পরিচালনার কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে ততদিন এই নেতাদের কাজ শেষ হইবে না।

ভবিষ্যতের এই দলটির কর্তব্য হইবে ভারতীয় জনসাধারণের প্রাক্তন নেতাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ। কেননা এই নেতারা গ্রেট ব্রিটেনের

বিরুদ্ধে পরবর্তী মারাত্মক সংগ্রামের পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আদর্শ নীতি, কার্য-সূচী ও কৌশল অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন এমন কোনো সম্ভাবনা নাই। ইতিহাসে আমরা ক্বচিৎ কখনো দেখিতে পাই যে একযুগের নেতারা পরবর্তী কালের নেতৃপদে আসীন হইয়াছেন। তবে ইহা খুব কম সময়েই ঘটে। তাঁহারা ব্যর্থ হইলেও ইহা গৌরব-হানিকর নয়। যুগের দাবিই উপযুক্ত মানুষ সৃষ্টি করে এবং ভারতেও ইহা ঘটিবে।

গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে 'জাতীয়' অভিযানের পর্যায়ে যে দল যোদ্ধা ও নেতার ভূমিকা পালন করিবে এবং নতুন ভারতের স্থপতি হইবে তাঁহারা যুদ্ধোত্তর সামাজিক পুনর্গঠনের কর্মে আহূত হইবেন। ভারতীয় সংগ্রামের দুইটি পর্যায় হইবে। প্রথম পর্যায়ে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একটি 'জাতীয়' সংগ্রাম পরিচালিত হইবে, ইহার নেতৃত্ব "জনসাধারণের দলের" হাতে থাকিবে যাহারা ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং সেই পার্টির নেতৃত্বে আন্তঃশ্রেণীসংগ্রামও পরিচালিত হইবে। সংগ্রামের এই পর্যায়ে সকল প্রকার বিশেষ সুবিধা, মান-মর্যাদা ও কায়েমী স্বার্থকে বিলুপ্ত করিতে হইবে যাহাতে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সাম্যের একটি শাসন (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্য) প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য ভারতের ডাক আসিবে। আমরা সকলেই জানি যে সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণা প্রবর্তনের মধ্য দিয়া বিশ্বসভ্যতায় একটি উল্লেখযোগ্য অবদান জোগাইয়াছিল, ঠিক সেইভাবে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স "স্বাধীনতা সাম্য বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের" আদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীর সংস্কৃতিতে এক আশ্চর্য অবদানের স্বাক্ষর রাখিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকে জার্মানী তাহার মার্ক্সীয় দর্শনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভাবে বিশ্বসভ্যতাকে দান করিয়াছিল। বিংশ শতকে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারার সরকার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পরবর্তী স্মরণীয় দানের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান আসিবে।

মাঝে মাঝে আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ জনসাধারণ খোলা মনে ভাবিয়া থাকেন। আমরা যদি প্রচারের সাহায্যে তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারি, তবে নাকি অনেক লাভবান হইব। যাহা হউক, আমি মনে করি না যে, ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ

জনসাধারণের খোলামন আছে। ইহা থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতে প্রশাসন ও শোষণ পরস্পরের সহযোগী। এই শোষণ শুধুমাত্র ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও ধনিকদের এক গোষ্ঠীর শোষণ নয়। ভারতের উপর শোষণ সামগ্রিকভাবে গ্রেট ব্রিটেনের শোষণ। ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধন একমাত্র সমাজের উচ্চস্তর হইতে আসে নাই। ইহা মধ্যবিত্তদের পকেট হইতে এবং সম্ভবত কিছুটা দরিদ্রতর শ্রেণীদের নিকট হইতেও আসিয়াছে। আরো বলিতে হয়, এমন-কি, গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর ইহা অসহ্য যে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ল্যাংকাশায়ারের ক্ষতির বিনিময়ে সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক। এই কারণে গ্রেট ব্রিটেনের মহান রাজনৈতিক দলগুলির কোনোটিই ভারতকে দলীয় সমস্যারূপে উপস্থাপন করে নাই। এই একই কারণে, এমন-কি যখন লন্ডনে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকেন, তখনো, ভারতে দমন ও নিগ্রহ সমানে চলিতে থাকে। আমি জানি যে শ্রমিকদলে কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষ স্বার্থপর বিবেচনার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন এবং তাঁহারা ভারতের প্রতি ন্যায় বিচারের আগ্রহের দিক হইতেও আন্তরিক। কিন্তু যতই আমরা তাঁহাদের প্রশংসা করি-না কেন, তাঁহাদের সংগে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আন্তরিক হোক-না কেন, সমস্যা একই থাকিয়া যাইতেছে যে তাঁহারা কখনোই তাঁহাদের দলের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিতে পারিতেছেন না। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতের সমস্যা সম্পর্কে, ডাউনিং স্ট্রীটে সরকার পরিবর্তনের ফলে কোনোও উন্নতি আশা করিতে পারি না।

যেহেতু রাজনীতি ও অর্থনীতি অংগাংগীভাবে পরস্পরের সংগে আবদ্ধ এবং ভারতে বৃটিশ শাসন শুধু রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য নহে অর্থ-নৈতিক শোষণের জন্যও স্থাপিত হইয়াছে— সেইজন্য ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে আমাদের কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রধানত একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুর অন্নসংস্থান, তাহাদের বস্ত্র ও শিক্ষা, জাতির স্বাস্থ্যবিধান— ভারত যতদিন শৃংখলাবদ্ধ, ততদিন এই-সব সমস্যা-গুলির সমাধান হইতে পারে না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পক্ষেত্রে বিকাশের ভাবনা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া দেওয়ার মতো অস্বাভাবিক ব্যাপার হইবে। আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় এই দেশ হইতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিলে ভারতের আভ্যন্তরীণ

অবস্থা কি হইবে? ব্রিটিশ প্রচারকে ধন্যবাদ দিতে হয় যে তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর সম্মুখে ভারত আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে পূর্ণ একটি দেশরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। এই দেশে নাকি ব্রিটিশ শক্তির দ্বারাই শান্তি রক্ষিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই ভারতের নিজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অতীতে ছিল। এমন দ্বন্দ্ব সব দেশেরই আছে। কিন্তু জনসাধারণের নিজেদের দ্বারাই এই সমস্যাগুলির সমাধান হইয়াছে। এইজন্যই ভারতের ইতিহাসে সুপ্রাচীনকাল হইতে মহান অশোকের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মতো আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পাই। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র ভূখণ্ডব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজিকার সংঘর্ষগুলি স্থায়ী প্রকৃতির এবং এই দেশে তৃতীয় দলের এজেন্টদের দ্বারা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হইয়াছে। আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই ব্রিটিশ শাসন যতদিন ভারতে বর্তমান থাকিবে, ততদিন ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য কখনোই স্থাপিত হইতে পারে না।

ইংল্যান্ডের কোনো রাজনৈতিক দলের কাছ হইতে আমরা কোনো কিছু আশা করিতে পারি না। এইজন্যই ইহা আমাদের উদ্দেশ্যের দিক হইতে অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতের পক্ষ হইতে আমাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের ক্ষেত্র সংগঠিত করা উচিত। এই প্রচারকে একই সংগে অতি অবশ্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক হইতে হইবে। না-ধর্মী দিকটায় পৃথিবীব্যাপী গ্রেট ব্রিটেনের এজেন্টদের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে প্রচারিত ভারত সম্পর্কিত মিথ্যাগুলি অস্বীকার করিতে হইবে। হাঁ-ধর্মী দিকটায় ভারতের বহুমুখী সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও তাহার নানা ধরনের অভিযোগগুলির প্রতি আমাদের পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জাতিক প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হইবে লন্ডন। ইহা দুঃখের বিষয় যে, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আন্তর্জাতিক প্রচারের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। কিন্তু আমরা এখন আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের দেশবাসীগণ আন্তর্জাতিক প্রচারের মূল্য উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ব্রিটিশদের প্রচার-নৈপুণ্যের মতো তাঁহাদের আর কোনো কিছুকেই সম্ভবত আমি এত প্রশংসা করি না। একজন ব্রিটিশ একজন জাত প্রচারক। তাহার কাছে ছোটো হাল্কা কামানের চেয়েও প্রচার বেশি শক্তিশালী। ইউরোপের আরেকটি দেশ ব্রিটেনের এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে এবং ইহা রাশিয়া।

ব্রিটেন যে রাশিয়াকে মনে মনে অপছন্দ করে, ইহা বিস্ময়কর নয়। ব্রিটেনের সাফল্যের রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া ফেলায় রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটেন ভীত।

ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ চরদের প্রতিকূল প্রচার এমন মাত্রায় পেঁছিয়াছে যে আমরা শুধুমাত্র ভারতের বাস্তব অবস্থা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা বলিলেই সংগে সংগে অনেকটা আন্তর্জাতিক সহানুভূতি লাভ করিতে পারিব। এখন আমি যে কয়েকটি দিকে পৃথিবীব্যাপী সক্রিয় প্রচার প্রয়োজন সেইগুলি উল্লেখ করিব।

১. ভারতে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের দীর্ঘকাল স্বীপান্তর, সম্প্রতি অনশন ধর্মঘটের ফলে তাঁহাদের দুইজনের সেখানে মৃত্যুবরণ।

২. ভারতীয়দের ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কঠোর প্রতিশোধস্পৃহা। (ভারতের বাহিরে এই বিষয়টি অজ্ঞাত যে বহির্ভারতে যাওয়ার জন্য অসংখ্য ভারতীয়কে ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। অন্যদিকে প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতে ফিরিয়া আসার জন্য ছাড়পত্রের আবেদন মঞ্জুর করা হয় না।)

৩. অসহায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য ভারতে, বিশেষ ভাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, উড়োজাহাজ হইতে বেশ সুসজ্জিত বোমাবর্ষণের অভ্যাস।

৪. জাহাজ-নির্মাণ শিল্পসহ ভারতের সব দেশজ শিল্প গ্রেট ব্রিটেনের ভারত শাসনের ফলে আজ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

৫. অটোয়া-চুক্তিসহ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভারতে জনপ্রিয় বহুবিস্তৃত বিরোধিতা। পৃথিবীকে জানানো উচিত যে ভারত কখনোই অটোয়া-চুক্তি গ্রহণ করে নাই। ইহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬. ভারত চায় তাহার সদ্যোজাত শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ। তাই শুল্ক সম্পর্কিত ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূল যে-কোনো প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতে প্রতিবাদ জনপ্রিয় হইয়াছে।

৭. ইংল্যান্ড খামখেয়ালীভাবে ভারতের সংগে এইভাবে মুদ্রামূল্য বিনিময়ের হার নির্ধারণ করিয়াছে যাহা ভারতের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। পৃথিবীর জানা উচিত এই বিনিময় হারকে হস্তগত করিয়া ব্রিটেন ভারতের কোটি কোটি টাকা কিভাবে লুণ্ঠন করিয়াছে।

৮. পৃথিবীকে আরো জানানো উচিত যে গ্রেট ব্রিটেন ভারতের ঘাড়ে

একটি মস্তবড়ো ঋণের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। এই ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা সম্মত নন। বহুকাল পূর্বে ১৯২১-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া-অধিবেশনে সরকারকে জানানো হইয়াছিল যে এই ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। ইহা একটি সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে এই ঋণ ভারতের স্বার্থে করা হয় নাই। ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে করা হইয়াছে।

একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে, বিশ্ব-অর্থনৈতিক ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের জন্য ভারতের পক্ষ হইতে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের অর্থনৈতিক অভিযোগগুলি জানাইয়া এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নে ভারতের যথার্থ মত প্রকাশ করিয়া সযত্নে একটি স্মারক-লিপি প্রস্তুত করা উচিত এবং তাহা বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রত্যেক সদস্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরা উচিত।

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পৃথিবীকে ভারতের বলা উচিত যে এই বিষয়ে ব্রিটিশ আন্তরিকতা ভারতবর্ষকে আদর্শস্থল হিসাবে বিবেচনা করিয়া প্রমাণ করা উচিত। এমন একটি দেশ যেখানে প্রায় ৮০ বৎসর ধরিয়া জনসাধারণকে নিরস্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে, যেখানে সমগ্র জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষত্বহীন করা হইয়াছে সেই দেশে সামরিক ব্যয় খাতে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৫০-এর বেশি ব্যয়ের যুক্তি থাকিতে পারে কি?

আমি নিশ্চিন্ত, যদি এই সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য পৃথিবীর গোচরে আনা যায়, তবে ইংল্যাণ্ডের উত্তর দেওয়ার মতো কোনো কিছুই থাকিবে না।

যখনই ভারতের প্রশ্ন কোনো বিশ্ব-কংগ্রেস বা এইজাতীয় কোনো অধিবেশনের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তখনই গ্রেট ব্রিটেনের চেলা-চামুণ্ডারা স্বভাবতই এমন একটা ওজর দেখান যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতের প্রশ্নটি একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। ইহা এমন একটি পরিস্থিতি যাহা ভারতীয়দের আর বেশি দিন মানিয়া নিতে অস্বীকার করা উচিত। যদি ভারত "লীগ অব্ নেশনস্"-এর সদস্য হয়, সে নিশ্চিত একটি জাতি। জাতি হিসাবে সকল অধিকার ও সুযোগ তাহার আছে। আমি জানি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের বর্তমান মর্যাদার পরিবর্তন যতদিন না হইতেছে, ততদিন আমাদের কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে। তথাপি অবিলম্বে সেই উদ্যোগ গ্রহণ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

শ্বেতপত্রের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবেচনার মধ্যে প্রবেশ করা আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। কেননা এই বিষয়বস্তুগুলি এখন বিবেচনার অযোগ্য। আমি শুধু বলিব যে দেশীয় নৃপতিগণের সহিত ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অসম্ভব ও গ্রহণের অযোগ্য। আমরা ভারতীয় জনসাধারণের ফেডারেশনের জন্য অর্থাৎ সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের জন্য নিশ্চয়ই কাজ করিব। কিন্তু মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড অথবা লর্ড স্যাঙ্কির খেয়াল মিটাইবার জন্য আমরা আইনসভাগুলির সরকারী আসনগুলিতে সরকারী প্রতিনিধিদের পরিবর্তে দেশীয় নৃপতিগণকে স্থান দানের বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারি না। একই সঙ্গে 'স্বাধীনতা' এবং 'রক্ষাকবচ' এই দুইয়ের কথা বলা নিরর্থক। যদি আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে রক্ষাকবচের কোনো অর্থ নাই। কেননা স্বাধীনতা নিজেই একমাত্র রক্ষাকবচ যাহা আমাদের অভীষ্ট। "ভারতের স্বার্থে রক্ষাকবচ"-এর কথা বলা আত্মপ্রতারণার নমুনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজ বলা সম্ভব নয় কখন আমরা জনসাধারণের পক্ষে সত্যকারের ক্ষমতা-লাভের উপযোগী সংবিধান পাইব। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না, জনসাধারণ যখন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, তখন তাঁহারা অস্ত্রলাভের অধিকার দাবি করিবেন। তাঁহারা পৃথিবীকে, বিশেষভাবে ব্রিটিশ সরকারকে, তখন বলিবেন : অস্ত্র গোটাও, নইলে অস্ত্র আমরা হাতে তুলে নেব।" এই বেদনাপীড়িত পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় অস্ত্র সংবরণ একটি মহান আশীর্বাদ। কিন্তু ভারতে যেমন দেখিতে পাই যে প্রায় ৮০ বৎসর ধরিয়া একটি পরাজিত জাতিকে জোর করিয়া নিরস্ত্র রাখা হইয়াছে, তখন ইহা শোচনীয়তম অভিশাপগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে বিরাজমান বহু-স্পর্ধিত 'প্যাক্স ব্রিটানিকা' একটি স্বাস্থ্যকর জীবনের শান্তি নয়, বরং ইহা কবরের শান্তি!

নতুন দলকে তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইলে যে দ্বৈত ভূমিকা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিতে সামর্থ্য লাভের জন্য এবং পরবর্তীকালে এক নতুন সামাজিক-ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য ইহাকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে এখন হইতেই আমাদের জনসাধারণকে এই কাজের জন্য তালিম দেওয়া উচিত। আমার নিজের মনে কোনো সন্দেহ নাই যে আমাদের স্বাধীনতা

লাভের পরে সাফল্য লাভ করিতে হইলে জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক চিন্তা এবং সজীব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন হইবে। পূর্ববর্তী প্রজন্মের এবং অতীতের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা খুব একটা কাজে লাগিবে না। আজিকার অবস্থা হইতে স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইবে। শিল্প, কৃষি, জমির রায়তীস্বত্ব, অর্থ, মুদ্রাবিনিময় হার, কারেন্সী, শিক্ষা, কারা প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে নতুন মত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা উদ্ভাবন ক'রতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা জানি, সোভিয়েট রাশিয়ায় সেই দেশের বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতির সংগে সংগতি রাখিয়া একটি জাতীয় (অথবা রাজনৈতিক) অর্থনীতির নতুন পরিকল্পনা বিকশিত হইয়াছে। এই একই জিনিস ভারতেও ঘটিবে। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে পিগু ও মার্শাল খুব কাজে লাগিবেন না।

ইতিমধ্যেই য়ুরোপে এবং ইংল্যান্ডে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই পুরাতন মতবাদগুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উঠিতেছে এবং ইহাদের স্থানে নতুন মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে। উদাহরণস্বরূপ আমি উল্লেখ করিতে চাই "সিলভিও গেসেল" (Silvio Gessel) কর্তৃক উদ্ভাবিত 'মুক্ত টাকার' নতুন মতবাদ (Theory of Free Money) জার্মানীতে ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রয়োগ করার পর সম্পূর্ণ কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতেও ইহা ঘটিবে। স্বাধীন ভারত পুঁজিপতি, জোতদার ও সম্প্রদায় বিশেষের একটি দেশ হইবে না। স্বাধীন ভারত হইবে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ। বর্তমান কালের ভারত হইতে স্বাধীন ভারতের সমস্যাগুলি হইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এখন হইতেই এই দেশের মানুষকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আগামী দিনের ভারতকে দেখিতে পান এবং পূর্ব হইতেই স্বাধীন ভারতের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভাকে এখন হইতেই শিক্ষা ও তালিম দেওয়া দরকার হইবে।

ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতেই প্রত্যেক মহান আন্দোলন শুরু হয়, এবং ভারতেও তাহাই ঘটিবে। আমাদের প্রথম কাজ হইবে একদল নরনারী সংগ্রহ করা। তাঁহারা সর্বাধিক ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। আমাদের ব্রতে যদি সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, তবে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারা

সর্বকালীন কর্মী হইবেন। তাঁহারা স্বাধীনতার ভাবনায় শ্রম ও ব্রতোদ্‌যাপন-কারী হইবেন। তাঁহারা কোনো ব্যর্থতাতেই নিরুৎসাহ হইবেন না। কোনো প্রকারের অসুবিধাতেই তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মহান উদ্দেশ্যের সেবায় কাজ করিতে ও অগ্রসর হইতে শপথ গ্রহণ করিবেন।

যখন "নৈতিক ভাবে প্রস্তুত" এই-সব নরনারীকে আমরা হাতের কাছে পাইব, তখন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। এবং এই-ভাবেই তাঁহারা তাঁহাদের কর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈজ্ঞানিক ও সমালোচনামূলক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহার ফলে একই জাতীয় অসুবিধা সত্ত্বেও সদৃশ সমস্যাগুলির অন্যান্য দেশে কিভাবে সমাধান করা হইয়াছে, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। একই সঙ্গে ইহার পাশাপাশি অন্যান্য যুগে ও দেশে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সম্পর্কে বিজ্ঞান ও সমালোচনানিষ্ঠ বিশ্লেষণ তাঁহাদের অতি অবশ্য করিতে হইবে। এই জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণের তুলনায় ব্রিটিশ সরকারের সবল ও দুর্বল দিকগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অগ্রসর হইবেন। ব্রিটিশ সরকারের তুলনায় ভারতীয় জনসাধারণের সবল ও দুর্বল দিকগুলির একই জাতীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাঁহাদের করিতে হইবে।

যখন এই বুদ্ধিগত শিক্ষাদানের কাজ শেষ হইবে তখনই ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় আমাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে। আর তখনই শুধুমাত্র যে কার্যসূচী অনুসরণ করিয়া ক্ষমতা লাভের পর নবরাষ্ট্র-গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হইবে, তাহার সম্পর্কেও ধারণা স্বচ্ছ হইবে। এই-ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে ক্ষমতালাভের পূর্বে ও পরে আমাদের কর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণায় সমৃদ্ধ প্রয়োজনীয় বুদ্ধিগত দিক্ হইতে যোগ্য, মহৎ উদ্দেশ্যের বেদীমূলে নিবেদিত দৃঢ়-সংকল্প একদল পুরুষ ও নারী আমরা চাই।

বিদেশী শাসন হইতে ভারতকে মুক্ত করার দায়িত্ব হইবে এই দলটির। ভারতে একটি নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপন এই দলের কাজ হইবে। যুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সমগ্র কার্যসূচীকে রূপদানের দায়িত্ব হইবে এই দলের। জীবন-যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা ও যোগ্যতা-

প্রাপ্ত নতুন প্রজন্মের নরনারী গঠনের কাজ হইবে এই দলের। সর্বশেষ কিন্তু গুরুত্বের দিক হইতে ন্যূনতম নয় এমন একটি দায়িত্ব এই দলকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইল, পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে সম্মানিত আসন-লাভের জন্য ভারতকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

এই দলকে সাম্যবাদী সংঘ বলা যাইতে পারে! এই দল হইবে সর্ব-ভারতীয় সুশৃংখল কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজের সর্বস্তরে সক্রিয় একটি দল। এই দলের প্রতিনিধি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে, কৃষক, নারী, যুব, ছাত্র ও অবহেলিত শ্রেণীর সংগঠনগুলিতে এবং প্রয়োজনবোধে মহান উদ্দেশ্যের স্বার্থে এমন-কি সংকীর্ণমনা বা সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিরও প্রতিনিধি এই দলে স্থান পাইবেন। দলটির কেন্দ্রীয় সমিতির নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় বিভিন্ন স্থানে ও স্তরে কর্মরত এই দলটির বিভিন্ন শাখা থাকিবে।

পূর্ণত বা অংশত একই লক্ষ্যাভিমুখী যে-কোনো দলের সহযোগিতায় এই দল কাজ করিবে। এই দল কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো দলের শত্রু হইবে না। একই সংগে পূর্বে বর্ণিত ইতিহাসের ভূমিকা পালনের বিশেষভাবে যোগ্যরূপে এই দল নিজেকে মনে করিবে।

সাম্যবাদী সংঘের পূর্বোল্লিখিত কার্যাবলী ব্যতীত নতুন দলটির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সাধারণ প্রচার-পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী সংঘের শাখাগুলি স্থাপন করা উচিত। ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক— এক কথায় সামগ্রিক স্বাধীনতার জন্য সাম্যবাদী সংঘ নিজেকে নিবেদন করিবে। জনসাধারণের সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রকারের বন্ধনের বিরুদ্ধে এই দল কঠোর সংগ্রাম করিবে। ন্যায়বিচার, সাম্য এবং স্বাধীনতার শাশ্বত আদর্শগুলির ভিত্তিতে যাহাতে স্বাধীন ভারতে নতুন রাষ্ট্র গড়া যায়, তাহার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সপক্ষে এই দল কাজ করিয়া যাইবে। অতীত যুগযুগান্তর-বাহিত ভারতের ঐতিহ্যের বাণী সমগ্র পৃথিবীকে দান করার চূড়ান্ত ব্রতোদ্‌যাপনের জন্য এই দল আত্মনিয়োগ করিবে।

কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি

জেনেভা হইতে হইতে প্রেরিত বিবৃতি।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি এবং তাহা হইতে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে পুনর্মুদ্রিত কয়েকটি বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমার সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক মতামতগুলি সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা গড়িয়া উঠিতে পারে। তদুত্তরে আমি বলিতে চাই ইউরোপে আসিয়া আমার দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমি পুনরায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলিতে চাই যে একদিকে যেমন বিদেশের বর্তমান আন্দোলনগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে আমাদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সহিত সংগতি রাখিয়া ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণও সমান জরুরী। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারত যে ভৌগোলিক এবং মনীষাগত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, সেই স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং জাতিগুলি সম্পর্কে আমরা একটি বিচারপরায়ণ এবং সহমর্মী দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইব। আমরা যারা ভারতবাসী—সেই আমাদের পক্ষে বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিগুলিকে বরাবরের মতো আলাদা করিয়া স্থির করা দরকার। আমি জানি যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত তাহার সঠিক বৈদেশিক নীতি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে যদি আন্তরিক সংগতি থাকে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে ইহা কার্যকর করিতে হইবে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সামাজিক রাজনৈতিক মতামত কিংবা পূর্বনির্ধারিত পক্ষপাতমূলক ধারণাগুলি যেন ভিন্নমতাবলম্বী দেশ বা জাতিগুলির বিরুদ্ধে অনিষ্টকর কোনো ভূমিকা গ্রহণ না করে। কেননা আমরা ওই-সব দেশ বা জাতির সহানুভূতিও লাভ করিতে পারি। বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইহা একটি মুখ্য সার্বভৌম নীতি—এবং এই নীতির ফলেই বর্তমান ইউরোপে সোভিয়েট রাশিয়া এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা শুধু যে সম্ভব তাহা নয়, বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিশ্বের যে-কোনো দেশের সহানুভূতিপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাইব।

আভ্যন্তরীণ-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে কমিউনিজম্ এবং

ফ্যাসিজমের মধ্যে যে-কোনো একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে— এ ধরনের মন্তব্য খুবই ভুল। আধুনিক জাতিসমূহের সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব অথবা মতাদর্শগুলির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ তত্ত্ব অথবা দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র তাহাদের ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা প্রয়োজনের ফলশ্রুতি নয়। মানব-জীবনের মতোই তাহারাও পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। ইহাও মনে রাখা দরকার যে আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মতাদর্শগুলির মধ্যে কয়েকটি এখনো পরীক্ষামূলকতার স্তরে রহিয়াছে। কালের পরীক্ষায় সেগুলির সাফল্য নির্ণীত হইবে, ইতিমধ্যে আমাদের বুদ্ধিবিবেচনাকে অন্য কোথাও বন্ধক দেওয়া উচিত নয়। আমি সর্বদা এই মতই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি যে বর্তমানের বিভিন্ন আন্দোলনগুলির মধ্যে যা-কিছু ভালো এবং গ্রহণযোগ্য ভারতের কাজ হইবে সেগুলির সমন্বয়মূলক একটি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। এতদুদ্দেশ্যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে-সমস্ত আন্দোলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি চলিতেছে বিচারবুদ্ধিশীল সহমর্মিতার দ্বারা আমাদের সেগুলি অনুধাবন করা দরকার। কোনো পূর্বপরিকল্পিত ধারণা বা গোঁড়ামিবশত আমরা যদি সেগুলিকে অবজ্ঞা করি সেক্ষেত্রে আমাদের নিবুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইবে।

আগামী ভারতীয় আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রধান সূত্রগুলি আমি এখানে বিবৃত করিতে চাই। প্রথমত, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের পূর্বেই সমগ্র ভারতকে একটি সবল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অধীনে সুসংহত হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, একটি জাতীয় সরকার বা শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্বেই সুনিশ্চিতভাবে একটি সুদক্ষ এবং সুনিয়ন্ত্রিত দল গঠন করিতে হইবে এবং সমগ্র জাতিকে সেই দলের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে। তৃতীয়ত, সুস্পষ্টভাবেই এই দলকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের পক্ষে নয়, জনসাধারণের পাশেই দাঁড়াইতে হইবে। এই দলকে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বন্ধন-মুক্তির জন্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের পাশে দাঁড়াইতে হইবে। সকলের জন্য সমান ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার জন্য এই দলকে একতার নীতি গ্রহণ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতি, ধর্ম এবং সম্পত্তির সবরকম কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতাগুলি ধ্বংস করিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এইরকমভাবেই প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলের সমান অধিকার-সম্পন্ন একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আগাইয়া যাইব, যে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের কোনো সমস্যা থাকিবে না। আমার এই দলের নাম হইবে 'ভারতের সাম্যবাদী সংঘ'।

জনসাধারণের মুখপাত্র

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের মুখপাত্র হিসাবে রূপান্তরিত করাই হইবে এই দলের আশু সমস্যা। তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছে যে প্রথমেই যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই সংস্থার গঠনবিন্যাসটি বদলাইয়া দিতে পারিতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস যেকোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারে তাহা প্রত্যাশা করাই নিরর্থক। কমিউনিস্টরা যখন অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস আসলে একটি বুর্জোয়া সংগঠন (প্রতিষ্ঠান) এবং এই রূপান্তরীকরণের ক্ষমতা তাহার নাই — আমি তাহাদের সহিত একমত নই। কংগ্রেসের এই বর্তমান কাঠামো বদলাইতে গেলে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে যুবক, শ্রমিক এবং কৃষক— দেশের এই তিন প্রধান শক্তিকে আমাদের আয়ত্তে লইয়া আসিতে হইবে। ব্রিটিশ আদলে রচিত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রটির আমূল সংস্কারসাধন করিলেই ইহা কার্যকর করা সম্ভব হইবে। অতএব আমাদের আশু কর্তব্যগুলির মধ্যে একটি হইল দলের সমগ্র দেশব্যাপী সংগঠনগুলিকে সংঘবদ্ধ করা এবং কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রের আমূল সংস্কারের জন্য বিক্ষোভ জানানো। এবং এগুলি করা হইলেই কংগ্রেস উপরি-পরিকল্পিত পথে বৈপ্লবিক নীতি এবং কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

ভারত-বিরোধী অপপ্রচার

৩ জুন ১৯৩৪ বেলগ্রেড হইতে প্রেরিত বিবৃতি।

'লন্ডন টাইমসে' প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি আমার চোখে পড়িয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে কলিকাতার মেয়র নির্বাচন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিবাদটি হইতেছে কর্পোরেশনের 'সেনগুপ্ত গোষ্ঠী' এবং 'বোস-গোষ্ঠী'-র লড়াই। এ ব্যাপারে আরো একবার আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে ১৯৩১ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে

পদত্যাগের পর হইতে, কংগ্রেস সংগঠন অথবা কলিকাতা কর্পোরেশনের দলীয় রাজনীতির সহিত আমার কোনো সংস্রব নাই। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে এই দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি পদত্যাগ করিয়াছিলাম যে বাংলাদেশে দলীয় রাজনীতির চিরতরে অবসান হওয়া উচিত এবং আমি যদি তাহা না করিতে পারি অন্ততপক্ষে আমার পক্ষে ইহা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। আমার ধারণা কলিকাতা কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক কোন্দলে জড়িত অথবা কর্পোরেশনের বাহিরে অন্যভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের লোকেরা ইহার সহিত আমার নামটি জড়াইয়াছেন।

ভারত-বিরোধী অপপ্রচার

স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের লোকেরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে যে ধরনের অপপ্রচার চালাইয়া যাইতেছে ভারতীয় জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রগুলিকে সে সম্পর্কে অবহিত করিতে চাই। নানা দেশেই আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধী অচ্ছুতদের বিরুদ্ধে কেন এবং কেনই বা তিনি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে অনশন করেন। বিগত বৎসরে ভিয়েনায় যখন প্রথম আমাকে এই প্রশ্নটি করা হয় প্রত্যুত্তরে আমি প্রশ্ন-কর্তাকে এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতার কথা জানাই। অন্যান্য অনেক দেশেই আমার কাছে এই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন আমি আবিষ্কার করি যে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত ইয়োরোপীয় দেশে এই সংবাদটি মুদ্রিত হয় যে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য-জনবিরোধী কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছেন!

মহাত্মা গান্ধীর ভাবমূর্তিটি ধ্বংস করিবার জন্য কয়েক মাস আগে সমস্ত ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে একটি গল্প চালু করা হইয়াছিল যে মহাত্মা গান্ধী একজন কমিউনিস্টে পরিণত হইয়াছেন। যেহেতু ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ-গুলি প্রবলভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল ইয়োরোপে যুগপৎ মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী দলের ভাবমূর্তিটি ক্ষতি-গ্রস্ত করা।

সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের মিথ্যা গুজব

সম্প্রতি ইয়োরোপীয় সংবাদপত্রগুলিতে একটি খবর ছাপা হইয়াছে যে কলিকাতার মেয়র হিসাবে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের নির্বাচনের ঘটনাকে

কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাংগা-জাতীয় একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। যে-সমস্ত ইয়োরোপীয় বন্ধু আমাকে এ প্রসংগে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, এ কথাও অবশ্য তাঁহাদের জানানো হইয়াছিল যে জনাব ফজলুল হকের সমর্থকদের মধ্যে একটি বড়ো অংশই ছিল হিন্দু কাউন্সিলরগণ এবং বিসংবাদটি কোনোক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাংগার কোনো ব্যাপার ছিল না। এ কথা বিশেষ করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইয়োরোপীয় সংবাদপত্রগুলি অনবরত এই-সমস্ত সংবাদ এবং রচনাদি প্রকাশ করিয়া যাইতেছে যে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানগণ অনন্তকাল ধরিয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত এবং একমাত্র ব্রিটিশ সরকারই শান্তি এবং শৃংখলা রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ এই-সব অপপ্রচারকদের সাজানো-গোছানো মিথ্যা-প্রচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা আমার মতো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমাদেরও সুসংগঠিত কার্যসূচীর ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রচারের প্রয়োজন আছে, এবং যত দ্রুত আমরা সেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে পারি ভারত এবং ভারতীয় জনগণের স্বার্থে ততই তাহা শুভংকর হইবে।

বেলগ্রেড। ৩ জুন ১৯৩৪

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

সরকার ও বিপ্লবী সম্প্রদায় সম্পর্কে

বিগত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত জয়েন্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভূতপূর্ব কর্মচারী মিঃ জে. সি. ফ্রেঞ্চ্ এবং ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের মিঃ এস. এইচ. মিল্‌স্ এই কথাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য সেখানে বর্তমান সরকারী নীতিই চালাইয়া যাওয়া দরকার এবং ভবিষ্যতে এই রাজ্যের অধিবাসীদের যেন স্বায়ত্তশাসনের কোনো অধিকার না দেওয়া হয়। এই যুক্তির স্বপক্ষে তাঁহারা দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং পুনরায় ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে সরকার বাংলা-

দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সর্বজনীন ক্ষমাপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও সেখানে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পুনরভ্যুত্থান ঘটে।

তাঁহাদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গেই আমি বলিতে চাই যে,

ক. প্রথমত আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ কোনো পরিকল্পনা অথবা সার্বভৌম ক্ষমাপ্রদর্শনের নীতি কখনোই গৃহীত হয় নাই।

খ. দ্বিতীয়ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিবার কোনো চেষ্টা করা হয় নাই এবং

গ. তৃতীয়ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সহিত জড়িত বলিয়া যে-সব ব্যক্তিদের সন্দেহ করা হইয়াছে তাহাদের মুখপাত্র বা প্রতিনিধিদের সহিত মীমাংসায় আসিবার জন্য কোনো কার্যকর উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

'ক'-শীর্ষক প্রথম বক্তব্য প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে সরকার যখনই সর্বজনীন ক্ষমাপ্রদর্শনের কোনো প্রস্তাব করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের রাজনৈতিক শাখা (পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চ) অথবা পুলিশ বিভাগ সর্বদাই ইহার বিরোধিতা করিয়াছে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার নিজের ক্ষেত্রেও ইহা ঘটিয়াছিল। আমাদের মুক্তি দিবার প্রস্তাবে বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের রাজনৈতিক শাখা শেষ দিন পর্যন্ত বিরোধিতা করে এবং বাংলাদেশের গভর্নর (স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন) স্বয়ং যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন তাহা হইলে 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের' নাগপাশ হইতে কোনোদিনই আমি মুক্তি লাভ করিতে পারিতাম না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা যে কোনোক্রমে মুক্তিলাভ করিলেও, মুক্তির পূর্বে এবং পরে তাহাদের যথেষ্ট হয়রানি ভোগ করিতে হয়। অন্তরীণদশা হইতে মুক্তির ব্যাপারে তাঁহাদের মানসিক অবস্থার কতদূর পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে ব্যাপারে যাচাই করিবার জন্য পুলিশ অফিসারেরা প্রায়ই তাঁহাদের নানারকম জিজ্ঞাসাবাদের পালা চালাইয়া যান এবং মুক্তির পরেও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এমন তীক্ষ্নভাবে তাঁহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখে যে তাঁহাদের সেই আপাতদৃশ্য স্বাধীন জীবনও নির্যাতিত জীবনেরই নামান্তর হইয়া

ওঠে। এই-সমস্ত অভিজ্ঞতার নীট ফল এই যে সর্বজনীন ক্ষমাপ্রদর্শনের এই সুমধুর অভিজ্ঞতা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক বন্দীই অনুভব করিয়া উঠিতে পারেন না।

প্রত্যাখ্যাত প্রস্তাব

'খ'-শীর্ষক বক্তব্য প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় তথ্য জানাই। চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যখন বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কারণগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে খতাইয়া দেখিবার জন্য একটি প্রস্তাব করেন, সরকার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 'ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে'র বিশিষ্ট সদস্য এবং মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক লেঃ কর্নেল বার্কলের ন্যায় প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন এই প্রস্তাবের রচয়িতা। কেবলমাত্র পুলিশ বিভাগের সুপারিশমতো প্রতিকার পন্থা না খুঁজিয়া সরকার যদি সত্য সত্যই একটি সুশৃংখল এবং বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে এই সমস্যাটির কারণগুলি অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে লেঃ কর্নেল বার্কলে হিলের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি হয়তো বা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইত না।

'গ'-শীর্ষক তৃতীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সংগে মাঝে মাঝে বোঝাপড়ায় আসিবার চেষ্টা করা হইলেও তথাকথিত এই সন্ত্রাসবাদী দলের নেতৃবন্দের সহিত কখনো সে-রকম কোনো প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি দ্বিতীয় দলের মুখপাত্র হিসাবে আলাপ-আলোচনা চালাইতেন তাহা হইলে সম্ভবত এই দলের সহিত আলোচনার প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা যখন যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই তখন সরকারের তরফে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের সহিত একটি বোঝাপড়ায় আসিবার প্রয়োজনীয়তাটি উপলব্ধি করা উচিত ছিল।

স্যার স্ট্যানলীর প্রচেষ্টা

কিন্তু এ প্রসংগে আমি অবশ্যই স্বীকার করি যে স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন যখন বাংলাদেশের গভর্নর ছিলেন তখন প্রয়াত মি. জে. এম. সেনগুপ্তের মাধ্যমে তিনি সে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু এ উদ্যোগ কার্যকর হয় নাই।

কেননা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীরা জানাইয়াছিলেন যে পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমে নয়, তাঁহাদের সহিত সরাসরি আলোচনা করিতে হইবে। সরকার এ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় এই আলোচনার অকাল-পরিসমাপ্তি ঘটে।

তথাকথিত এই সন্ত্রাসবাদী দলের সহিত আলোচনার ব্যাপারে সরকারেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। কেননা সহজ কারণটি এই যে বর্তমানে ভারতের কোনো জননেতার পক্ষে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। অন্ততপক্ষে দুটি ক্ষেত্রে সেই-সব জননেতাদের কথা আমি জানি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই কাজ করিতে গিয়া যাঁহারা পুলিশের সন্দেহভাজন এবং পরিণামে কারারুদ্ধ হন।

প্রধান প্রতিবন্ধক

বাংলাদেশের বহু ব্যক্তিই আন্তরিকভাবে অনুভব করেন যে পুলিশের রাজনৈতিক শাখার পক্ষে এই বোঝাপড়ায় আসিবার প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই যে, তাঁহারা তাহাদের নিজেদের পথেই চলিতে চান এবং অক্লান্তভাবে এই কথা আওড়াইতে থাকেন যে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ভারতের সার্বিক স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও কি এ কথাটি সমানভাবে খাটে না? তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সন্ত্রাসবাদী দলের সহিত আলোচনার অসম্ভাব্যতার কথাটি আমার কাছে একান্তই যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়।

বাংলাদেশের গভর্নর হিসাবে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে স্যার জন্ অ্যান্ডারসন ইংলন্ডে যে-সমস্ত ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে প্রত্যাশা করা গিয়াছিল যে কেবলমাত্র সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবে নয়, রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও তিনি নিজের দক্ষতা প্রতিপন্ন করিবেন। প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরিয়া স্যার জন্ অ্যান্ডারসন বাংলাদেশে আছেন কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের মৌলিক কারণগুলি অনুধাবন করা অথবা এই সমস্যাটির আমূল সংস্কার করার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করা হয় নাই।

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

কংগ্রেসের কোন্দল

'ইউনাইটেড প্রেস' মারফত প্রদত্ত বিবৃতি।

বাংলাদেশের কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কোন্দলের সালিশ মি. এম. এস. অ্যানে কর্তৃক প্রচারিত একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ওই বিবৃতিতে তিনি 'সেনগুপ্ত-গোষ্ঠী', 'বোস-গোষ্ঠী'— এরকম কথা ব্যবহার করিয়াছেন। খুবই দুঃখের কথা এই যে যদিও দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত আজ আর ইহলোকে নাই এবং আমার পদত্যাগের পর প্রায় তিনবছর ধরিয়া হয় আমি কারান্তরীণ অথবা নির্বাসিত দিন কাটাইতেছি তবুও দলীয় কোন্দলের সহিত আমাদের উভয়ের নাম জড়াইয়া আজও প্রচার করা হইতেছে। বিশেষ করিয়া আমার নামটি ব্যবহার সম্পর্কে পুনরায় এই বলিয়া আমার অসন্তোষ জানাই যে বিগত কিছুকাল ধরিয়া দলের মধ্যে যে বিসংবাদ চলিতেছে কোনো-রকমভাবেই তাহার সহিত আমার কোনো সংস্রব নাই। নিজেকে আমার অনুগামী অথবা সহকর্মী হিসাবে মনে করিতে পারেন বর্তমান বাংলাদেশের এমন কেহ আছেন কিনা আমি জানি না। এমন যদি কেহ থাকেন তাঁহার প্রতি আমার পরামর্শ এই যে কোনো কংগ্রেস সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদ বা ক্ষমতালাভের জন্য তিনি যেন অন্য কোনো কংগ্রেসীর সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত না হন এবং ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে আমার অনুসৃত দৃষ্টান্ত অনুসারে আগ্রহী সহকর্মীর নিকট স্বেচ্ছায় এই পদ বা ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

আমি পুনরায় স্পষ্ট করিয়া জানাইতে চাই যে গত জানুয়ারি, ১৯৩২ হইতে বাংলাদেশের কংগ্রেসীদের মধ্যে যে অন্তর্দলীয় কলহ চলিতেছে তাহার সহিত আমার কোনো সংস্রব অথবা তাহার প্রতি আমার কোনোরকম সহানুভূতি নাই। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা প্রসঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত এই যে দেশে ফিরিয়া নেতৃত্ব-লোভী বর্তমান বিবদমান কোনো দল অথবা গোষ্ঠীর সহিত আমি নিজেকে জড়াইব না। গোষ্ঠী-নির্বিশেষে সকল সৎ এবং দেশপ্রেমিক কংগ্রেসীদের একতাবদ্ধ করিবার একটি শেষ চেষ্টা আমি করিব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এই শেষ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় বাংলাদেশের কংগ্রেসী রাজনীতিতে আমি আর যোগদান করিব না এবং অধিকতর স্থায়ী ও কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিব।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধুদের কাছে মিঃ অ্যানেকে এই কথাটি জানাইতে

অনুরোধ করি যে তিনি যেন অতঃপর কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কলহের সহিত আমার নামটিকে আর না জড়ান।

কার্লসবাদ। ১১ অক্টোবর ১৯৩৪

ডাঃ আনসারির প্রতি শ্রদ্ধা

কলিকাতার একটি বাংলা দৈনিকে আমার নামে প্রকাশিত একটি বিবৃতি আমার চোখে পড়িয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে ডঃ আনসারি যখন ইয়োরোপে ছিলেন তখন নাকি তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে আমি কিছু অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছি। ঐ রিপোর্টটি সর্বৈব মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, ডাঃ আনসারি প্রসঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলিয়াছিলাম— এ কথা সত্য। কিন্তু সেই আলাপ-আলোচনা তো ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত পর্যায়ের এবং তাহা মোটেই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল না। প্রকৃত তথ্যটি নিম্নরূপ:

'সাম্প্রতিক ভিয়েনা সফরকালে ডাঃ আনসারি তাঁহার অসংখ্য রোগীদের লইয়া (ভূপালের মহামান্য নবাব ছিলেন যাঁহাদের অন্যতম) এত ব্যস্ত ছিলেন যে হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের পক্ষে তাঁহার নাগাল পাওয়া ছিল একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে প্রথমে ভাষণ-দানে সম্মতি জানাইয়া পরে তিনি সেই কথার খেলাপ করেন। পূর্ববর্তী কোনো একটি উপলক্ষে ভিয়েনার হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যেরা তাঁহাকে একটি ভাষণদানের অনুরোধ জানাইলে মিশরে তাহার কার্যকলাপের প্রসঙ্গ তুলিয়া সে প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হন কিনা এ ব্যাপারটি আমার জানা নাই।

ঐ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি অসত্য প্রতিবেদন রচনা করিয়া একই সঙ্গে ডঃ আনসারি এবং আমার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করিয়াছেন। আমার দুঃখ আরো বেশি এই যে আমি ডঃ আনসারিকে আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক বলিয়া মানি এবং তাঁহার প্রতি গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি।

কার্লসবাদ। ২৪ অক্টোবর ১৯৩৪

পোল্যাণ্ডে ভারতের একজন বন্ধু

১৯৩৩ সালে পোল্যাণ্ডে আমার ভ্রমণের সময় এমন কয়েকজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির সংগে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যাঁহাদের কয়েকজন ভারত সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির একটা সাধারণ মনোভাব ছিল। পোল্যাণ্ডবাসীরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করিয়া সম্প্রতি স্বাধীনতা অর্জন করায় তাঁহারা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে নিরত অন্য একটি জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের অধিকারী। আমার মনে পড়ে যে আমার কয়েকজন পোল বন্ধু আমাকে একবার দেশের অভ্যন্তরভাগে কৃষকদের জীবন দেখানোর জন্য গাড়িতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা একটি গ্রামীণ কৃষি-বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম কৃষকদের ছেলেমেয়েদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য সরকার যে নতুন বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করিয়াছিলেন ইহা ছিল তাহার অন্যতম। তত্ত্বাবধায়িকা একজন বৃদ্ধা মহিলা আমাদের বিদ্যালয়টি ঘুরাইয়া দেখান এবং আমাদের পরিদর্শনের শেষে তিনি দয়া করিয়া মহাত্মা গান্ধীর বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তিনি বর্তমানে কি করিতেছেন তাহা জানিতে চান। ইহা ছিল খুবই মর্মস্পর্শী ঘটনা।

বর্তমানে পোল জনগণের অন্যতম উদ্যোগ হইল যথাসম্ভব দ্রুত নিজেদের দেশের শিল্পরূপায়ণ। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেদের একটি বন্দর—ডিলিয়া বন্দর গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং ইহার ফলে যে ভূতপূর্ব জার্মান বন্দর ডানজিগ বর্তমানে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে গিয়াছে তাহার অভাব মিটিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের বাহির্বাণিজ্য উন্নয়নেরও প্রয়াস করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য দূতাবাস (কনসুলেট) খুলিতেছেন। ১৯৩৩ সালে বোম্বাইতে পোল বাণিজ্য দূতাবাস খোলা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্প খুবই উন্নত ; লজ গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রগুলির অন্যতম। সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও দ্রুত অগ্রগতি হইতেছে।

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসতে একটি প্রাচ্যবিদ্যা সমিতি আছে এবং এই সমিতি প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী। আমি প্রাচ্যবিদ্যা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সামাজিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম এবং আমি সেখানে আমাদের দুইটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

স্থাপনের জন্য একটি পোল-ভারতীয় সমিতি গঠনে আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলাম।

ছাত্রসমাজ, ছাত্র ও ছাত্রী উভয়েই, সদাজাগ্রত। ভারত-সহ বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে মহিলারা বিশেষভাবে আগ্রহী। তাঁহারা ভারতের ছাত্র ও যুব-সংগঠনগুলি সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংগঠনের নাম ছিল লিগা; লিগার মধ্যে যে-সব দেশের সঙ্গে তাঁহারা সংযোগ স্থাপন করিতে চান সেই-সব দেশের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া চক্র আছে।

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমি বিশেষ করিয়া একজন চিত্তাকর্ষক ব্যক্তির উল্লেখ করিতে চাই এবং তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল ওয়ারসতে। তিনি হইলেন অধ্যাপক স্ট্যানিস্ল এফ. মিকালস্কি; তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন সংস্কৃত ও ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়নে এবং তিনি ছিলেন ভারত-প্রেমিক।

১৮৮১ সালে পোল্যান্ডে অধ্যাপক মিকালস্কি-আইউয়েনস্কির জন্ম। তিনি ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ভিয়েনায় অধ্যাপক লিওপোল্ড ভি. সোজোডারের কাছে এবং ১৯১৪ সালে জার্মানীর গোটিংগেনে অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। কয়েক বৎসর তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়ারস-ওলনা ও জেকনিকা (Warsaw-Wolna Wszechnica) পোল অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে তিনি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবীরূপে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অধ্যাপক মিকালস্কি তাঁহার সমগ্র সময় নিয়োগ করিয়াছেন সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চায়। ১৯২৩ সালে কয়েকজন পোল প্রাচ্যতত্ত্ববিদের সহযোগিতায় তিনি ওয়ারস বিজ্ঞান সমিতির প্রাচ্যবিদ্যা-শাখা গঠন করেন।

অধ্যাপক মিকালস্কি পোল ভাষায় ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থের লেখক— নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইহাদের মধ্যে আছে :—

১. ভগবদ্‌গীতা, ১৯১২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২০; তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৬।
২. উপনিষদ (নির্বাচিত), ১৯১৩; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২২।
৩. রামের কামনা (রামায়ণের এক সর্গ), ১৯২০।

৪. ধম্মপদম্ (অনুবাদ), ১৯২৪।

৫. ঋকবেদের, চল্লিশটি শ্লোক, ১৯১৪।

৬. আত্মবোধ, ১৯২৩।

৭. ভগবদ্‌গীতা (ভূমিকা ও মন্তব্য সহ মূল সংস্কৃতে), ১৯২১।

ওয়ারস হইতে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত ওডিসির একটি পোল সংস্করণের ভূমিকায় অধ্যাপক মিকালস্কি রামায়ণ ও ওডিসির সম্পর্কের উল্লেখ করিয়াছেন এবং হোমার সম্বন্ধে গবেষণার জন্য রামায়ণ পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক মিকালস্কি পোল ভাষায় একটি বড়ো বিশ্বকোষ প্রকাশ করার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং তিনি ইহার জন্য ভারত, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় ভূগোল, ভারতীয় ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। ভারত-সম্পর্কিত বড়ো প্রবন্ধটিতে অনেকগুলি চিত্র ও একটি বহুরঙের মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৯২৪ সালে ওয়ারসতে অধ্যাপক মহাশয় ভারতের মহাকাব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯৩৫ সালে রোটারি ক্লাবের ওয়ারস শাখায় তিনি ভারতের সাধারণ সমীক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি ভারত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতেছেন। এই গ্রন্থাগারে বর্তমানে সংস্কৃত ভাষা এবং প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে দুই হাজারের বেশি বই আছে।

অধ্যাপক মিকালস্কি ছিলেন অতিথিপরায়ণতায় অপূর্ব। তিনি আমাকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণা হিসাবে উপহার দিয়াছিলেন নিজের এক গাদা বই।

অন্য একজন পোল অধ্যাপক, অধ্যাপক স্ট্যাসিয়াক ডজ্ নিজে বর্তমানে ভারত-ভ্রমণরত— ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক স্ট্যাসিয়াক একজন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ এবং ইয়োরোপের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

পোল্যান্ডে পোল-ভারত সমিতি ও সেইসঙ্গে ভারতে তাহার একটি শাখা গঠনের জন্য ইতিমধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন এ বিষয়ে একমাত্র যাহা দরকার তাহা হইল কাহারো অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করা।

১৯৩৫

রুমানিয়ায় একজন ভারতীয় কর্নেল

রুমানিয়ায় আমার সাম্প্রতিক ভ্রমণের সময় আমি বুখারেস্টে একজন চিত্তা-কর্ষক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। তিনি ডাঃ নরসিং মুলগুন্ড, রুমানীয় সেনা-বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের একজন লেঃ কর্নেল। আমি তাঁহার সম্বন্ধে এত আগ্রহী হইয়াছিলাম যে আমি তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার প্রথম জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং সেই বিবরণ আমার দেশবাসীদের অবগতির জন্য এখন লিখিতেছি।

তিনি জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় এবং তাঁহার বাড়ি ছিল দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর হইতে ষাট মাইল দূরবর্তী ভুবানাগির তালুকে। বোম্বাইতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর এবং সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান।

কলিকাতায় তিনি স্কটিশ চার্চেস কলেজে যোগ দিয়া এফ. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। একই সঙ্গে তিনি ডাঃ এস. কে. মল্লিকের জাতীয় মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই শেষোক্ত কলেজে তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ এস. কে. মল্লিক, ডাঃ ওয়াই. এম. বসু, ডঃ বি. সি. ঘোষ ও ডঃ এম. ডি. দাস। তিনি যথাসময়ে এফ. এ. পরীক্ষায় এবং জাতীয় মেডিক্যাল কলেজের এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি লন্ডন গিয়াছিলেন এবং এম. আর. সি. এস. ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময় তুরস্ক-বলকান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ডাঃ মুলগুন্ড তুরস্কের রেড ক্রেসেন্ট মিশনে স্বেচ্ছাসেবীরূপে যোগ দিয়াছিলেন। দুইটি মেডিক্যাল মিশনের একটির নেতা ছিলেন ডাঃ আনসারী এবং অপরটির নেতা ছিলেন ডাঃ আবদুল হোসেন। ডাঃ মুলগুন্ড এই শেষোক্তটিতে যোগ দিয়া-ছিলেন। তিনি শাতালজায় তুরস্ক বাহিনীর সঙ্গে ছয়মাসকাল শল্যচিকিৎসক রূপে কাজ করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি তুরস্ক সরকার হইতে 'অর্ডার অফ কম্যান্ডার অফ মাজিদিয়া' সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তুরস্ক-বলকান যুদ্ধে গ্রীস, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইলেও আবার একটি নূতন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহাতে সার্বিয়া ও গ্রীস বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। রুমানিয়া

এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তুরস্ক-বলকান যুদ্ধের সময় বুলগেরিয়া তুরস্কের বহু এলাকা দখল করিয়া লইয়াছিল বলিয়া তুরস্ক সেই-সব এলাকা পুনরুদ্ধারের এই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। রুমানিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর মিশনটি রুমানিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল।

রুমানিয়ায় ডাঃ মুলগুন্ড জিমনিকায় কর্মরত ছিলেন। সেখানে একটি সামরিক হাসপাতাল ছিল। তাহার পর রুমানীয় সেনাবাহিনীতে কলেরা আরম্ভ হইলে মেডিক্যাল মিশনের সহায়তা বিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সেবার পুরস্কার হিসাবে ডাঃ মুলগুন্ড রুমানীয় সরকারের নিকট হইতে 'অর্ডার অফ মিলিটারি ভার্চু' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহা ১৯১৩ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের শেষে মেডিক্যাল মিশনের অন্যান্য সদস্যরা ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন কি? ডাঃ মুলগুন্ড থাকিয়া গিয়াছিলেন। তিনি রুমানিয়াতেই নিজের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করার একটা কড়া তাগিদ অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ বিষয়ে কে তাঁহাকে সাহায্য করিবে তাহাই ছিল সমস্যা। সুখের বিষয় এই সময় তিনি সুপরিচিত রাজনীতিবিদ্‌ ডাঃ লুপু ও অধ্যাপক স্ট্যানকুলোনুর (Stanculeanu) সুনজরে পড়েন। তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল সেই দেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবার উপর। তাঁহার এই দুইটি বন্ধুর সাহায্যে এবং নিজের যুদ্ধবিষয়ক সেবার জোরে তিনি স্বাভাবিক সময় উত্তীর্ণ হইবার অনেক আগেই নাগরিক অধিকার পাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার অল্প পরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের সংগে সংযুক্ত চক্ষুরোগ চিকিৎসার ক্লিনিকে সহকারীর একটি চাকুরি পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রুমানিয়ার রাষ্ট্রীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ইহার পর তিনি রুমানীয় সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে সাব-লেফটেনান্ট হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

ইহা এপ্রিল ১৯১৫ সালের ঘটনা। ১৯১৬ সালের ১৫ আগস্ট রুমানিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। ১৯১৭ সালে ডাঃ মুলগুন্ড লেফটেনান্ট পদে ও ১৯১৮ সালে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি হইয়াছিলেন মেজর এবং ১৯৩৪ সালের মে মাসে আমি বুখারেস্টে আসার কয়েকদিন আগে তিনি লেঃ কর্নেল পদ পাইয়াছিলেন।

ডাঃ মুলগুন্ড কিংবা লেঃ কর্নেল মুলগুন্ড রুমানিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ

চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ পর্যন্ত তিনি ভরাডিয়ার চক্ষু-রোগের হাসপাতালের প্রধান ছিলেন আর ১৯২২ হইতে ১৯২৮ পর্যন্ত তিনি বুখারেস্টের সামরিক হাসপাতালের চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বুখারেস্টে আমার অবস্থানের সময় যুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রী তাঁহাকে সেনাবাহিনীর উপকারের জন্য একটি নূতন চক্ষুরোগের হাসপাতাল খোলার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

লেঃ কর্নেল মুলগুন্ড একজন রুমানীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দুইটি সন্তান, দুইটিই কন্যা, আছে। তাঁহাদের একটি সুখী পরিবার। তিনি নিজে রুমানিয়ায় খুবই সুপরিচিত এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই আমি কয়েকজন রুমানীয় বন্ধুর নিকট তাঁহার কথা শুনিয়াছিলাম। বুখারেস্টে থাকার সময় তাঁহার সঙ্গে অনেক সময় কাটানোর সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমরা দুইজনে যখন একসঙ্গে পথে বাহির হইতাম তখন রুমানীয় ভদ্রলোকেরা এবং সামরিক অফিসারেরা তাঁহাকে যেভাবে সম্বোধন করিতেন তাহা হইতে বোঝা যাইত যে তিনি সেখানে শুধু সুপরিচিতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন যথেষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিও।

যদিও তিনি ভারত হইতে দীর্ঘকাল বাহিরে আছেন এবং যদিও এখন তিনি রুমানীয় নাগরিক, তবু তিনি নিজের ভাষা ভুলিয়া যান নাই। মারাঠী ছাড়াও তিনি মোটামুটি ভালো হিন্দী বলিতে পারেন এবং এখনো সংস্কৃত সম্বন্ধে তাঁহার ভালো জ্ঞান আছে। তিনি সংস্কৃত প্রবাদ ও গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিতে খুব ভালোবাসেন। বুখারেস্টে লেঃ কর্নেল মুলগুন্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার পক্ষে খুবই আনন্দের ও সম্মানের বিষয় হইয়াছিল। আমার কোনো সংশয় নাই যে আমার দেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা এ বিবরণ পড়িবেন তাঁহারাও সমান আনন্দ পাইবেন। মুলগুন্ডের ঠিকানা স্ট্র্যান্ডা ক্যানজার্স ১৪. বুখারেস্ট।

১৯৩৫

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম

ইয়োরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে অবস্থান-কালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা।

দেশের স্বাধীনতা-অন্দোলনের সাম্প্রতিক কিছু বিপর্যয় সত্বেও আমি কিন্তু আজন্ম-আশাবাদী। পরিণামে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। এরকম একটি বৃহৎ আন্দোলনে মতপার্থক্য ঘটিবেই কিন্তু অভিন্ন উদ্দেশ্যব্রতী সহযোদ্ধাদের গুরুত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না এবং মাতৃভূমির শৃংখলমোচনের জন্য আমাদের সমস্ত বাহিনীগুলিতে সক্রিয় গতি সঞ্চার করিতে হইবে। জাতীয় মহদুদ্দেশ্যে যাঁহারা অশেষ দুঃখ বরণ করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন, এই সুযোগে তাঁহাদের প্রতি আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা এবং সারা দেশব্যাপী আমার শুভাকাংক্ষীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

দেশের বর্তমান ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির সহিত যোগ না থাকার ফলে অনেক তথ্যই আমার অজানা— এবং এরকম অবস্থায় আমার পক্ষে কোনো স্পষ্ট মতামত প্রকাশ করাও খুবই দুরূহ। তবুও দেশের সাধারণ পরিস্থিতিটি আমি আঁচ করিতে পারি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে বর্তমানে আমরা একটি রাজনৈতিক মন্দাদশার মধ্য দিয়া চলিতেছি। অতএব জনসাধারণের মনোবলকে উজ্জীবিত রাখাই এখন আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা। আমাদের আর-একটি দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে একের পর এক আমাদের দেশের রাজনৈতিক মহাগুরুনিপাত ঘটিতেছে। এই ধারার সর্বশেষ ঘটনা নাগপুর-সিংহ শ্রীযুক্ত অভয়ংকরের দুঃখজনক অকাল-প্রয়াণ। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের জাতীয় জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হইল।

কংগ্রেসের আইনসভায় যোগদান

পার্লামেন্টারি কার্যকলাপগুলিই আমাদের অভীষ্ট স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে— এই মিথ্যা আশার দ্বারা আমরা যেন প্রতারিত না হই এবং ইহার সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। পিছনে যদি

গণ-আন্দোলনের সমর্থন থাকে তাহা হইলে আইনসভাগুলি কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে পারে। তবে আমাদের পক্ষে অতিরিক্ত আইনসভামুখিতা সংগত হইবে না।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-সংক্রান্ত বিতর্ক

জাতীয় নীতির ভিত্তিতে যে ঐক্য সাধিত হয়— সেই ঐক্যতত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি। জাতীয় নীতিগুলি বিসর্জনের মূল্যে যে ঐক্য অর্জিত হয় সমগ্র জাতির পক্ষে তাহা মোটেই শুভংকর হয় না। সেই ঐক্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা রোয়েদাদের পরিপন্থী এবং সামগ্রিকভাবে সারা ভারতের পক্ষেই তা যথেষ্ট ক্ষতিকর। তিনি যে-কোনো সম্প্রদায়ভুক্তই হোন-না কেন, আমি এমন কোনো জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের কথা চিন্তাই করিতে পারি না অন্তরের অন্তস্তল হইতে যিনি এই অনিষ্টকর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির বিরোধিতা না করেন। সাম্প্রদায়িক এই রোয়েদাদের ভিত্তিতে যে ভারত আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা এক খণ্ডিত ভারত।

জয়েন্ট কমিটি রিপোর্টের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় কর্মপন্থা

সর্বদলীয় সম্মেলনে আমার আস্থা নাই। সাইমন কমিশনের প্রশ্নে কংগ্রেস যদিও লিবারেল বা উদারনৈতিকদের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের সূচনা-পর্বেই কংগ্রেসের সহিত তাঁহারা সম্পর্কচ্যুতি ঘটান। অতএব আসলে সর্বদলীয় কোনো কর্ম-পন্থাই গৃহীত হয় নাই। প্রকৃত সর্বদলীয় কর্মপন্থায় আমি বিশ্বাসী, কিন্তু নিছক সর্বদলীয় সম্মেলনে আমার আস্থা নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য দলগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার আবার যদি কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয় আবারও কিন্তু তাহার পক্ষে মধ্যপথে পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাব্য বিপদ থাকিয়া যাইবে। অতএব, আমার ধারণা, নিজের শক্তিতে যথাসাধ্য কাজ করাই কংগ্রেসের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

একই কারণে প্রস্তাবিত আইন-পরিষদের ব্যাপারে আমার কোনোরকম আস্থা নাই। আমি মনে করি ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার উত্তরাধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উপরই বর্তানো উচিত।

রাজনীতি হইতে গান্ধীজির বিদায়-গ্রহণ

আমি মনে করি না যে গান্ধীজি সত্য সত্যই রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়াছেন। কেননা কংগ্রেস তো তাঁহারই অনুসৃত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহারই গোঁড়া অনুগামীরা এখন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ভিতরে কাজ চালাইতেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই-সব কর্মীরা যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে ভাবনাচিন্তা করিয়া থাকেন; যতই দেশের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকুক-না কেন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতেতে তাঁহাদের কোনো স্থান নাই। আসলে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি কিন্তু সারা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো সংগঠন নয়; কেননা তাহা কেবলমাত্র কংগ্রেসের ভিতরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ-দলটিরই প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

হিটলার

আমি হিটলারের অনুরাগী— এটি আমার নিকট একটি খবর বটে! তাঁহার সাংগঠনিক শক্তির মধ্যে লক্ষণীয় অনেক কিছু থাকিলেও তাঁহার অনুসৃত নীতিগুলি ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর তিনি বৃহৎ পুঁজিপতিদেরই অনুগামী আর রাজনীতির দিক দিয়া ব্রিটিশপন্থী। ইয়োরোপীয় রাজনীতি-প্রসঙ্গে সাধারণভাবে আমার ধারণা এই যে তাহার শেষতম পরিস্থিতি সম্পর্কে যেমন আমাদের অবহিত থাকা উচিত, তেমনই এ কথা আমি অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে উপরি-উক্ত অভিজ্ঞতাপুঞ্জ এবং তাহার জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের নিজস্ব কর্মপন্থাগুলি নির্ধারিত হওয়া দরকার। একান্ত অন্ধভাবে ভারতে কমিউনিস্ট ও ফ্যাসিস্ট রীতি-নীতিগুলি কার্যকর করার প্রবণতার প্রতিও আমার সমর্থন নাই।

গান্ধীজির গ্রামীণ শিল্পসংস্থা আন্দোলন

গান্ধীজি প্রস্তাবিত 'নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংস্থার' ধারণাটিকে আমি স্বাগত জানাই এবং এটিকে আমি একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু কেবলমাত্র খাদির দ্বারাই গ্রামীণ পুনর্গঠন সম্ভব নয়। মুমূর্ষু গ্রামীণ শিল্পগুলির সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের দ্বারাই সুনিশ্চিতভাবে তাহা করা যাইতে পারে।

কার্লসবাদ । ১৯৩৫

বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যুগপৎ সর্বতোভাবে জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কয়েক বৎসরব্যাপী বিভিন্ন বহুমুখী, প্রগতিশীল ও গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত।

১০ জানুয়ারি ১৯৩৫

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ঐক্য-প্রস্তাব

জেনেভা হইতে সম্পাদককে বঙ্গীয় কংগ্রেস সভাপতির প্রেরিত পত্র।

সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আমার স্বল্পকালীন কলিকাতা অবস্থান-কালে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা আভাস আমি পাইয়াছি। সমগ্র প্রদেশবাসী জনসাধারণের মনে এই ধারণাই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে একদিকে সরকার এবং অন্যদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুর্ব্যবহারের ফলে এই প্রদেশের অবস্থা খুবই বিপন্ন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সংহতির অভাবই আমাদের এই বর্তমান সংকটের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এই অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান

সরকারের নিকট হইতে এই প্রদেশের জনসাধারণ কী ধরনের অন্যায় বা অবিচার লাভ করিতেছে দৃষ্টান্ত হিসাবে ১. জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর রিপোর্ট, ২. সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত-সংক্রান্ত রিপোর্ট (অন্যায়ভাবে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ) এবং ৩. বিনা-বিচারে দুই হাজারের বেশি জনসেবকদের জেলে আটক করার প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে সরকারী সিদ্ধান্তকে নিন্দা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা এবং অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বাদ দেওয়ার ঘটনাই বুঝাইয়া দেয় যে কংগ্রেসী নেতারা এই প্রদেশবাসীদের উপর কী ধরনের অন্যায় বা অবিচার চালাইয়া যাইতেছেন। বাংলাদেশের জন-

সাধারণের আশু কর্তব্য অনতিবিলম্বে এই দুটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানো।

এই দুটি প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যবৃন্দের যথাশীঘ্র সম্ভব একটি সভায় মিলিত হওয়া এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই মর্মে সুপারিশ করা উচিত যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত দুটিই বাতিল করিতে হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সুস্পষ্টভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব দাবি করা দরকার।

নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

কংগ্রেসের মধ্যে ছোটো-বড়োর ভেদ লুপ্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাদেশিক কমিটিকে একটি সংঘবদ্ধ ফ্রন্ট বা সংস্থায় পরিণত করিতে সাহায্য করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নবগঠিত কর্মপরিষদকে ভাঙিয়া দিয়া কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি নূতন কর্ম-সমিতি গঠন করিতে হইবে। কোনো সংশয় অথবা মর্যাদার প্রশ্ন যেন ইহার সহিত জড়িত না থাকে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে-কোনো বিক্ষুব্ধ সদস্য তাঁহার সহ-কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে প্রায়ই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আবেদন করিয়া থাকেন। এই সূত্রে তিনি যে-কোনো গোষ্ঠীভুক্তই হোন-না কেন, বাংলাদেশের সমস্ত কংগ্রেসীদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি তাঁরা যেন চিরতরে ত্যাগ করেন। এই শোচনীয় অভ্যাসটিই কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে অন্যদের হস্তক্ষেপ করিতে অথবা আমাদের নিজেদের ভিতরকার মতান্তরগুলি জীয়াইয়া রাখিতে সাহায্য করে।

প্রাদেশিক সম্মেলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জরুরী জাতীয় সমস্যাগুলি পর্যালোচনা এবং সমাধানের পন্থা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর একটি অধিবেশন আহ্বান করিবার

উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে আগামী কয়েক বৎসরব্যাপী একটি গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অন্তর্দলীয় কোন্দলের ক্ষেত্রে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূমিকা অনেকখানি, এবং কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসনিক ভূমিকাও আমাদের পক্ষে মোটেই গর্ব করিবার মতো নয়। একটি সুদৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস দল যদি গঠন করা যায় একমাত্র তাহার দ্বারাই কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং উপযুক্তভাবে নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব। অতএব আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে বাংলাদেশের বর্তমান কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ বিভেদপন্থা যদি চলিতেই থাকে তাহা হইলে কংগ্রেসের পক্ষে উচিত হইবে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে কোনোরকম দায়িত্ব গ্রহণ না করা।

কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রে যে অদলবদলগুলি করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে মন্দের ভাগই বেশি এবং সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত করাও সম্ভব নয়। প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিগুলির শক্তি এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সংখ্যাহ্রাস চরিত্রগতভাবে অগণতান্ত্রিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল। স্বয়ংশাসিত বিভিন্ন বোর্ড গঠন করিয়া প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সংগঠনের হাত হইতে সবরকম কার্যকর ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্পসংস্থা গঠনের ধারণাটি শুধুমাত্র খাদিভিত্তিক গ্রামীণ সংগঠনের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিমূলক এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা পাইবার যোগ্য সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে খাদি পরিধান করা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিতান্তই রক্ষণশীল এবং নিষ্প্রয়োজন কতকগুলি বিধিমাত্র। আবার সংগ্রামের মতাদর্শগত যে-সমস্ত পরিবর্তনগুলি বর্তমানে বিবেচনাধীন, সেগুলিও জনসাধারণের আরো বেশি সত্যনিষ্ঠ এবং অহিংস করিয়া তুলিবার পরিবর্তে বর্তমানের তুলনায় অধিকতর অসাধু করিয়া তুলিবে বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া এই-সমস্ত মতাদর্শগুলি আশ্রমের পক্ষেই বেশি উপযোগী। ভারতীয় জনগণের মুক্তিপ্রয়াসী রাজনৈতিক সংস্থার পক্ষে সেগুলি একেবারেই অবান্তর।

৩০ জানুয়ারি ১৯৩৫

এডেনে ভারতবাসী

ভিয়েনা যাত্রাপথে এডেন বন্দর হইতে প্রেরিত বিবৃতি।

এডেনে কিছুক্ষণ আমি বেশ চমৎকারভাবে কাটাইয়াছি। কয়েকজন এডেনবাসী ভারতীয় জাহাজে আসিয়া আমাকে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আনন্দিতচিত্তে আমি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এডেনের প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীদের মধ্যে দু হাজারেরও বেশি ভারতীয় আছেন। এখানকার ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকাংশই ভারতীয়দের হাতে। তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই আসিয়াছেন কাথিয়াওয়াড় হইতে। সময়টি সন্ধ্যার পরে হওয়া সত্ত্বেও এখানে বসবাসকারী জনৈক ভারতীয়ের বাড়িতে হৃদ্যতাপূর্ণ একটি গোষ্ঠী-বৈঠকের আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রথমে আমরা এডেনবাসী ভারতীয়দের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাদের আলাদা করিয়া দেখার ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া খুবই প্রবল ছিল। কেবল ভারতীয়েরাই নন, এডেনবাসী আরবেরাও ভারত হইতে এই বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-নিবেদন করেন। এডেনে বসবাসকারী স্থায়ী ভারতীয় নাগরিকরা এবং বিশেষভাবে পরবর্তীকালে উপনিবেশ-স্থাপনকারী জনসাধারণের মনে এই আশংকা জন্মাইয়াছিল যে ভারত হইতে বিচ্ছিন্নতার ফলে ভারতীয় জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন এবং তাঁহাদের দুর্গতি ঘটিবে। তাঁহারা আশা প্রকাশ করেন ভারত হইতে তাঁহাদের এইভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার জন্য সেখানে যেন প্রবল বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই পৃথকীকরণের পশ্চাতে সরকারের মনোভাবটি আসলে কী এই প্রশ্নের জবাবে তাঁহারা জানান যে ভারত যদি কোনোদিন স্বরাজ লাভও করে ভবিষ্যতে এডেনের উপর তাঁহারা ঔপনিবেশিক অধিকার কায়েম রাখিবেন। আগে এডেন বন্দরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ছিল কিন্তু তাহাদের ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সেখানে কেবল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন আছে এবং বর্তমানে এডেন, রয়াল এয়ারফোর্সের একটি শক্ত ঘাঁটি।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলন্ড যাওয়ার পথে আমি এডেনে আসিয়াছিলাম। পরবর্তীকালে এডেনের নানা উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে রাস্তাগুলি খুব চমৎকার এবং অনেক বড়ো বড়ো জমকালো বাড়িও

গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া সারা শহরে এখন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লক্ষণাদি দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতেও এডেনের উন্নতি অব্যাহত থাকিবে।

আমদানি-রপ্তানির একটি কেন্দ্র হইতেছে এই এডেন বন্দর। দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত চামড়া, কফি প্রভৃতি কাঁচামাল এই বন্দর মারফত ইয়োরোপে রপ্তানি করা হয়। বয়ন-শিল্পজাত পণ্য এবং তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার প্রতীক অন্যান্য নানা দ্রব্যাদিও ইয়োরোপ হইতে এই বন্দরপথেই বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

এডেনের পরিস্থিতি-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার পর ভারতের কথা ওঠে। এখানকার ভারতীয়রা স্বদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কেও অত্যন্ত ওয়াকিবহাল এ কথা জানিয়া আমি যথেষ্ট আনন্দিত বোধ করি। কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় খাদি-সহ আমাদের গ্রামীণ শিল্পগুলির সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের জন্য বোম্বাই কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে আমি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করি। অনুষ্ঠান শেষে সামান্য জলযোগান্তে আমরা গাড়িতে করিয়া সারা শহরটি ঘুরিয়া দেখি। জেটিতে একটি চমৎকার বিদায় অনুষ্ঠান হয় এবং আমাদের জাহাজ 'ভিক্টোরিয়া' যখন এডেন বন্দর ছাড়িয়া গেল, তখন মধ্যরাত্রি।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

ভারত-বিরোধী অশালীন চলচ্চিত্র

ভারতীয় চিত্র-প্রযোজকের প্রতি ভিয়েনা হইতে ইউনাইটেড প্রেসে প্রেরিত পত্র।

এই সপ্তাহের সংবাদপত্র মারফত জানিতে পারিলাম যে 'ইন্ডিয়া স্পীক্‌স্' নামে ভারত-বিরোধী একটি অশালীন চলচ্চিত্র সম্প্রতি আমেরিকায় প্রদর্শিত হইতেছে। রোমে থাকাকালে আমার কয়েকজন ইতালীয় বন্ধু ঘরোয়া এক প্রদর্শনীতে 'ইন্ডিয়া স্পীক্‌স্' নামক এই ছবিটি দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান। আমাদের জানানো হইয়াছিল যে ছবিটি বেশ ভালো এবং ইতালির জন্য এটি

কেনার যোগ্য কিনা সে সম্পর্কে আমাদের মতামত চাওয়া হইয়াছিল। আমরা সাতজন ছিলাম দর্শক— তিনজন ভারতীয় এবং চারজন ইতালীয়। সৌভাগ্য-ক্রমে সব ক'জন ইতালীয়ই ছিলেন আমাদের বন্ধু এবং দেখার সংগে সংগেই তাঁহারা ছবিটি যে কী ধরনের ঘৃণা এবং বিদ্বেষপূর্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন। এক কথায় ছবিটিকে মিস মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়ার'ই চিত্রভাষ্য হিসাবে আখ্যাত করা যাইতে পারে। ভারতের নোংরা নর্দমাগুলি কিংবা অর্ধনগ্ন দরিদ্রতম পার্বত্য উপজাতির লোকজনদের (আবার হয়তো বা অচ্ছুত কিছু লোকজনদেরও) দেখাইবার জন্য পরিচালক মহাশয় অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছেন। এই ছবির কিছুটা অংশ ভারতের বাহিরে তোলা, কিন্তু কিছুটা অংশ যে ভারতে তোলা হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। একমাত্র ভারতেই চলচ্চিত্র কিংবা ছবি তোলার ব্যাপারে বিদেশীরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই-সব 'মেয়ো'রা যে-কোনো একটি মুখোশের আড়ালে নিজেদের প্রকৃত মুখশ্রীটিকে ঢাকিয়া রাখিয়া আমাদের আতিথ্য ভোগ করে, এবং ভারত ত্যাগের পরমুহূর্তেই অসংকোচে আমাদের এই আতিথেয়তার অপব্যবহার করিয়া থাকে। 'ইন্ডিয়া স্পীকস্' নামক এই ছবিটির সংগে যে-সব ব্যাখ্যান বা ভাষ্য ব্যবহার করা হইয়াছে সেগুলি হয় মিথ্যা না-হয় অর্ধসত্য নানা তথ্যে বোঝাই। সারা ছবিতে এরকম কথা বলা হইয়াছে যে "একমাত্র ভারতেই পাপকে পুণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়।" ওই ছবিতে ভারতবর্ষ কেবল নোংরা আর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ— বাল্যবিবাহই সেখানকার রেওয়াজ, মৃতদেহগুলিকে সেখানে দাহ করা হয়— ভারতের এই পরিচয়ই সেখানে বড়ো করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই ছবিতে শুধু মাদুরার একটি মন্দির এবং দিল্লীর জুম্মা মসজিদ দেখানো ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য নানা দেশে সুপরিকল্পিত এই ভারত-বিরোধী অপপ্রচার বন্ধ করা সম্পর্কে কি কিছু করা যায় না ? আমি মনে করি প্রথমত অন্যান্য দেশে ভারত-বিরোধী এই কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া তোলা দরকার। সে-ক্ষেত্রে, বিদেশে প্রদর্শনের জন্য কেন সরকারী উদ্যোগে ভারত-বিষয়ক উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মিত হইবে না ? —আইন পরিষদে এই মর্মে প্রশ্ন তোলা দরকার। ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে এই ধরনের প্রচারচিত্র নির্মাণ করা হয়। এই-সব প্রচারের ফলে অধিক-সংখ্যক পর্যটকদের সমাগম হয় এবং তাহাদের নিকট সংগৃহীত অর্থ হইতে এই চিত্র-

নির্মাণের খরচ উশুল হইয়া থাকে। ভারত সরকার যদি অন্যান্য দেশে প্রদর্শন-যোগ্য এই-সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করিতে রাজি না হন, সে-ক্ষেত্রে বেসরকারী চিত্রপ্রযোজকদের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁহারা যেন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, নিসর্গসৌন্দর্য প্রভৃতির পরিচয়বাহী কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। আমি তাঁহাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আর্থিক দিক দিয়া এই প্রস্তাব লাভজনকই হইবে, এবং ছবিগুলি যদি উন্নত ধরনের হয় তাহা হইলে বিদেশে সেগুলি বেশ ভালো দামেই বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পের সহিত সংশিলষ্ট মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা করিয়া জানিয়াছি যে ভারত-বিষয়ক উন্নতমানের চলচ্চিত্রের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট আগ্রহী। বর্তমানে ভারতে নির্মিত কিছু কিছু চলচ্চিত্রের মান নিঃসন্দেহে, খুবই উন্নত ধরনের এবং এই-সব চিত্র-প্রযোজকেরা যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে শুধু যে তাঁহাদের অর্থাগমই হইবে তাহা নয় এইভাবে তাঁহারা জাতীয় স্বার্থসিদ্ধিরও পরিপোষকতা করিবেন। আশা করি, আমার এই প্রস্তাবটি ভারতীয় চিত্রপ্রযোজকেরা উপযুক্ত গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিবেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অভ্যুদয় এবং ভারতের ভবিষ্যৎ

ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রেরিত বিবৃতি।

কংগ্রেস-কর্তৃক গত বছরে গৃহীত নীতির মধ্যে যে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা গিয়াছিল বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে তাহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক এবং আইনানুগ প্রতিক্রিয়ার ফলেই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে। আমার বিনীত ধারণা এই যে বর্তমানে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড যে 'পার্লামেন্টারি পলিসি' বা নীতি গ্রহণ করিয়াছেন ১৯২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বরাজ দল কর্তৃক গৃহীত 'স্বরাজী নীতি' হইতে চরিত্রগত দিক দিয়া অনেকখানি আলাদা। যদিও স্বরাজ দলের ভিতরে মডারেট বা মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের লোকেরাও তখন ছিলেন, তবুও সে সময়ে স্বরাজ দল সারা দেশের

প্রতিনিধিস্থানীয় একটি সক্রিয় শক্তি এবং সংস্থা হিসাবে গণ্য হইত। পার্লামেন্টারি বোর্ড কিন্তু সেই ধরনের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন নয়। এরকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের ভিতরকার এই দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে যদি কোনো বিদ্রোহ মাথা চাড়া না দিত, তাহা হইলে জনসাধারণ অত্যন্ত সংগত-ভাবেই ভাবিতেন যে কংগ্রেস বুঝিবা মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস যেহেতু মৃত অথবা মুমূর্ষু নয় তাই বিদ্রোহ ঘটে এবং কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম হয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখাইয়া এই দলকে দাবাইয়া রাখার চেষ্টা করা অথবা এই দলের সদস্যদের চোখ-রাঙানো আধুনিক রাজনীতির অ আ ক খ জ্ঞানহীন মূঢ়তারই পরিচায়ক। ১৯২৩-এ যখন 'স্বরাজ দল' গঠিত হয় তখন এই ধরনের চেষ্টা করা হইয়াছিল, পরিণামে তাহা ওই দলের শক্তি এবং গুরুত্ব বৃদ্ধিতেই সাহায্য করে। আমার বক্তব্য এই যে বর্তমানে সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে চলিয়াছে।

যে প্রেরণা হইতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াও আমার আশংকা এই যে এই দলের ধ্যান-ধারণার মধ্যে কিছু অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত এই দলের নাম নির্বাচনটি তেমন ভালো হয় নাই। বর্তমানে 'সমাজতন্ত্রে'র নানা রূপ ও রঙ, এবং বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহার অন্তর্নিহিত অর্থও নানাপ্রকার। অতএব মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 'সমাজতন্ত্র' কিংবা স্পেনের সোশ্যালিস্টদের জংগী মত ও পথের যে নীতি— এই দুই সমাজতন্ত্রের মধ্যে সাধারণ কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কিছু কিছু লোকের কাছে আবার সোশ্যালিজম্ ও কমিউনিজম্ নিতান্তই সমার্থক। অতএব নানা মানুষ, নানা অর্থে যে পরি-ভাষাটি ব্যবহার করে সেটি ব্যবহার করা সংগত নয়।

এ ছাড়া, আমি যদি ভুল না করি, তবে আমার ধারণা পঞ্চাশ বছর আগে ইংলন্ডে যে 'ফেবিয়ান সোশ্যালিজম্'-এর চল ছিল তাহারই প্রভাবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। সেদিনের পর টেমস্ এবং গংগা নদী দিয়া অনেক জল গড়াইয়া গিয়াছে। বিশ্বমহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর পৃথিবীর নানা প্রত্যন্তে নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম রূপায়িত হইয়াছে এবং বর্তমানেও এত বেশি-সংখ্যক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে যে আধুনিক কোনো দলের পক্ষে চার-পাঁচ দশক আগেকার ইয়োরোপে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও পরিত্যক্ত মতবাদ অনুসরণ করিতে পারে না।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। সম্ভবত কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি মনে করে যে ইংলন্ডের জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির দ্বারা নয়, গণ-পরিষদের দ্বারাই ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব। ঐতিহাসিক-ভাবে ফ্রান্সেই প্রথম গণ-পরিষদ গঠিত হয় এবং তাহারই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও গণ-পরিষদ গড়িয়া ওঠে। ফ্রান্সের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে প্রথম যে গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে তাহার পর আরো দেড়শো বছর অতিবাহিত হয়। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে কেরেন্‌স্কির সরকারকে বিতাড়িত করিয়া বলশেভিকরা যখন বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন তখন তাঁহাদের প্রথম কাজই ছিল গণ-পরিষদকে বাতিল করিয়া দেওয়া। কেননা ঐ গণপরিষদে বলশেভিকরা ছিলেন একান্তই সংখ্যালঘু এবং গণ-পরিষদ যদি রাশিয়ার জন্য একটি সংবিধান রচনা করিত তাহা হইলে বলশেভিকদের এই সরকার আদৌ গঠিত হওয়াই সম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই যে আজ যদি বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতে একটি গণ-পরিষদ গঠিত হয়— সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি সংখ্যালঘু ভূমিকাই গ্রহণ করিবে। অতএব যে সংবিধান রচনায় কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা নিজেরাই সম্মত, সে সংবিধান কিন্তু রচনা করিবেন সেই-সব দল বা লোকেরা, যাঁহাদের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। অতএব তাঁহারা যদি হীনমন্যতায় না ভোগেন এবং নিজেদের নীতি, পন্থা, পদ্ধতি এবং কার্যক্রমের প্রতি তাঁহাদের আস্থা থাকে তাহা হইলে এইভাবে রাজনৈতিক আত্মঘাতের পথে না গিয়া সংবিধান রচনার সম্পূর্ণ অধিকার দাবি করাই তাঁহাদের পক্ষে উচিত হইবে। কেননা স্বাধীনতা-সংগ্রামী দলেরই দেশের সংবিধান রচনার অধিকার আছে।

আমার এই মন্তব্য আমার দেশবাসী অনেক ব্যক্তিরই 'গণতান্ত্রিক' এবং 'সাংবিধানিক' মনোবৃত্তিকে আঘাত করিতে পারে। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলিতে চাই যে বর্তমান বিশ্বের একটি বিশাল পরিধি জুড়িয়া গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, মধ্য-ভিক্টোরীয় পর্বের গণতন্ত্র-সম্পর্কিত ধারণাগুলি হইতে তাহা অনেকখানি আলাদা। বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত একটি পার্লামেন্টের বদলে বর্তমানে রাশিয়া একটি দলের শাসনাধীন এবং এই দলটি কিন্তু নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবেই দাবি করে। ঠিক একইরকম ভাবে ইতালি এবং জার্মানীতে বিশেষ একটি দল অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে দমন করিয়া বলপূর্বক সমস্ত ক্ষমতা দখল

করিয়াছে এবং ঐ বিশেষ দলটিও নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া দাবি করে। বিপরীতপক্ষে স্পেনে সোশ্যালিস্টরা যখন ক্ষমতাসীন ছিলেন, তাঁহারা মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্রেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। সম্ভাব্য ফলাফলের কথা বিবেচনা না করিয়াই শুভেচ্ছার উদার নিদর্শন হিসাবে তাঁহারা সর্বশ্রেণীর বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দান করেন। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা ক্যাথলিক এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলিকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেয়। ফলে খুব অল্প সময়ের ভিতরেই সোশ্যালিস্টদের শাসন-ক্ষমতা হইতে বিদায় লইতে হয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে 'রাজনৈতিক হারাকিরির' এটিই হইল উল্লেখ্যতম দৃষ্টান্ত।

কেবল রাশিয়াতেই যে মধ্য-ভিক্টোরীয় পার্লামেন্টারি পদ্ধতিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা নহে। আমরা ইতিপূর্বেই যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছি ইতালিতে সেই ফ্যাসিস্ট এবং জার্মানীতে নাৎসীরাও বিরোধী দলগুলির ভোটাধিকার কাড়িয়া লয় এবং নিজেদের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে।

ভবিষ্যতে যাহাতে কোনো ফাঁদে পড়িতে না হয় সেইজন্য এই-সমস্ত রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আমাদের অবহিত থাকা দরকার।

আমি মনে করি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নিজের মধ্যেই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরকার অগ্রণী চিন্তার লোকজনদের (র‍্যাডিক্যালদের) তাঁহারা নিজেদের পক্ষাভিমুখী করিতে পারিয়াছে এবং যদি সঠিক আদর্শ ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে সঠিক পথে আগাইয়া যায় তাহা হইলে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি একটি অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহা না হয় এবং বর্তমান কংগ্রেস নেতারা যে আদর্শগত অস্থিরতায় ভুগিতেছেন যদি তাঁহারা সেই দ্বিধা এবং দ্বন্দ্বের শিকার হন, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত জন-সাধারণ তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য অপর কোনো দলের দিকে ঝুঁকিবেন। আমাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ধারাগুলিকে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ঐক্যের মিথ্যা ধারণাগুলিকে ছাড়িতে হইবে। ১৯২৮-এর সর্বদলীয় কমিটি এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের অভিজ্ঞতাগুলি এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভাবনা-চিন্তা এবং কাজের মধ্যে ঐক্য থাকে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যের সার্থকতা। প্রকৃত ঐক্য অনন্ত

শক্তির উৎস, ভাসা-ভাসা অগভীর ঐক্য কিন্তু দুর্বলতারই পরিচায়ক। সাইমন কমিশনের ব্যাপারে সরকার উদারনৈতিক ভারতীয়দের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। এইরকম অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে সরকারের দ্বারা অবজ্ঞাত হইবার ফলেই তাহারা কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল, কংগ্রেসের ইতি-কর্তব্যের কথা কোনোরকম বিচার-বিবেচনা না করিয়াই সংগে সংগেই তাহারা ইংলন্ডের পথে পাড়ি জমান। এমন-কি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের প্রতিনিধিরা পর্যন্ত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করেন এবং এই বয়কটে তাঁহাদের সহিত যোগ-দানের জন্য ভারতীয় উদারনৈতিকদের প্রতি তাঁহারা আহ্বান জানান। কিন্তু এত বড়ো আত্মত্যাগে তাঁহারা সম্মতি জানাইতে পারেন নাই।

এই-সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীদের মতো কংগ্রেসী নেতারাও যে কিরূপে ভারতীয় উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি এতখানি আনুগত্য দেখাইতে পারেন তাহা আমার ধারণায় আসে না। নূতন সংবিধান বয়কট করা সম্পর্কে এই-সব উদারনৈতিক নেতারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে হাত মিলাইবেন— এ কথা আশা করা বাতুলতা মাত্র। প্রাথমিকভাবে যদি তাঁহারা এরকম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণও করেন সরকারী আনুকূল্যসূচক সর্বপ্রথম কোনো প্রস্তাবের সংগে সংগেই কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কংগ্রেসী সহ-কর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। এই-সমস্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, যে দল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক, ভারতের সংবিধান রচনা করিবার জন্য এবং স্বরাজলাভের পর যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সামগ্রিক কর্মসূচীও বাস্তবায়িত করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে প্রস্তুত থাকা দরকার। যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজনৈতিক দলগুলি ভাঙিয়া দিবার প্রশ্ন ওঠে না। কংগ্রেস যদি জয়লাভ করে তবে কংগ্রেস সংগঠনটিকেও অবলুপ্ত করিবার কোনো প্রশ্নই উঠে না। গান্ধী, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক (এখন যিনি কামাল পাশা নামেই পরিচিত) এবং তাঁহার দল তুরস্কের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়লাভের পর জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী রূপায়ণ এবং তুরস্ককে স্বনির্ভর করিয়া তুলিবার জন্য যেমন ক্ষমতাসীন ছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও আমাদের অনুরূপ করাই উচিত। "স্বরাজ লাভের পূর্বে এবং পরে দলীয় একনায়কতন্ত্র"— ভবিষ্যতের জন্য এটিই আমাদের স্লোগান হওয়া উচিত।

আবার অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমি বলিতে চাই যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যদি সত্য সত্যই আগামীদিনের দল হিসাবে গড়িয়া উঠিতে চায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির হিসাব-নিকাশগুলি বুঝিয়া লইতে এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির রূপরেখা রচনা করিতে হইবে। অন্তর্নিহিত হীন-মন্যতাকে চিরতরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আগামী ভারতবর্ষের পুরা দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল কি তাহা পারিবে? যদি পারে বর্তমান পরিস্থিতিতে দিশারী আলোর জন্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য যাঁহারা ব্যাকুল দেশের সেই-সব বিক্ষুব্ধ মুক্তিকামীদের সুনিশ্চিতভাবেই তাঁহারা সংঘবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৫ মার্চ ১৯৩৫

সুপরিকল্পিত ভারতবিরোধী অপপ্রচার : একটি প্রতিবাদ

ভিয়েনার চলচ্চিত্রগৃহগুলিতে 'বাঙালী' নামক ভারত-বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ভিয়েনার আর্চবিশপকে লিখিত প্রতিবাদপত্র।

মান্যবর!

এই পত্র মারফত যে বক্তব্য আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি তাহা যেমন আপনার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তেমনি দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান ভিয়েনায় আপনার চেয়ে যোগ্যতর এমন কোনো ব্যক্তি নাই ভারত-সম্পর্কিত এই বিষয়টি লইয়া ভারতের স্বপক্ষে উপযুক্ত বিচার-বিবেচনার জন্য যিনি এটিকে গ্রহণ করিতে পারেন।

যে বিষয়ে আমি লিখিতেছি, সেটি একটি চলচ্চিত্র। নাম 'বাঙালী'। 'রহস্যময় ভারতবর্ষের চাঞ্চল্যকর একটি চলচ্চিত্র'— শিরোনামে ছবিটি এখন ভিয়েনার বিভিন্ন চলচ্চিত্র-গৃহে প্রদর্শিত হইতেছে। ভারত এবং ভারতবাসী-দের সম্পর্কে এই ছবিটিতে অসত্য তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং যে-সব ভারতীয়েরা এই ছবিটি দেখিয়াছেন অথবা ইহার কথা জানিয়াছেন তাঁহারা সকলেই প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ। ভারত এবং ভারতবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভিয়েনায় যদি কোনো ভারতীয় দূতাবাস থাকিত, নিঃসন্দেহে, সরকারীভাবে

তাঁহারা এই বিষয়টি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এ রকম কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলেই, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে সেখানকার সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে আমি যে মর্যাদার অধিকারী তাহার কথা স্মরণ করিয়া এবং ভারতের রাজধানীর ভূতপূর্ব মেয়র হিসাবেও আমি আপনাকে সেই অনুরোধ জানাইতেছি।

মহামান্য! আমি জানি যে অস্ট্রিয়ায় বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব প্রসঙ্গটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রথম সুযোগে আপনাকেই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিতে চাই।

নিপুণ প্রচার

ছবিটি যিনিই দেখিয়াছেন এক নজরেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ইহার মধ্য দিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রচার চালানো হইয়াছে। ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য বর্তমানে যে আন্দোলন চলিতেছে এবং যে আন্দোলন পৃথিবীর নানা প্রত্যন্তের মানুষজনের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ হইতে এই প্রচার অত্যন্ত সময়োচিত। গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে প্রচারিত বিশেষ কোনো প্রচারের সহিত ভারতবাসীদের কোনো সম্পর্ক নাই কিন্তু অতি প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধাত্রীভূমি হিসাবে ভারতবর্ষ যে সুনামের অধিকারী, ভারতের সুনাম ও স্বার্থের পরিপন্থী যে অপপ্রচার— আমরা তীব্রভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই।

প্রতিবাদের প্রধান কারণগুলি

মান্যবর! প্রকৃত একজন ভারতবাসী হিসাবে আমাদের আহত আত্মমর্যাদার প্রধান কারণগুলি এখন আমি আপনার নিকট পেশ করিতেছি।

১. ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত নায়ক মহম্মদ খানকে (গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত কর্নেল স্টোনের বিপক্ষে) এখানে প্রধানত একটি নৃশংস অমানবিক পাশব-চরিত্র হিসাবেই চিত্রিত করা হইয়াছে।

২. মহম্মদ খানের আদেশে ব্রিটিশ অফিসারদের উপর অত্যাচারের যে-সব

দৃশ্য দেখানো হইয়াছে সেগুলি অত্যন্ত বীভৎস এবং আপত্তিকর এবং সেগুলি দর্শকদের মনে ভারতবাসীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা জাগাইয়া তোলে। আমি ভাবিয়া পাই না ভিয়েনার পরিশীলিত দর্শকদের নিকট কিভাবে এই দৃশ্যগুলি দেখানো হইতে পারে।

সীমান্তবাসী লোকেরা তাঁহাদের উন্নত চরিত্র, নীতিজ্ঞান এবং অতিথি-পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত। এই তথ্য হইতে খুব সহজেই এই ধরনের অপ-প্রচারের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। এ ছাড়া ব্রিটিশ সরকার এই-সব নিরাশ্রয় মানুষদের উপর বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া তাহাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেন, এবং নারী-শিশু-নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেন। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও সীমান্তবাসী এই জনসাধারণ কখনোই ব্রিটিশের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। 'লীগ অফ নেশন্‌স্‌'-এর কার্যবিবরণী যাঁহাদের জানা আছে, এ কথা তো তাঁহাদের সকলেরই জানা যে এমন-কি শান্তির সময়েও ব্রিটিশ সরকার ভারত-সীমান্তে বোমাবর্ষণ করিতে রাজি হয় নাই। অতএব 'বাঙালী' নামক এই ছবিটিকে এমন-কি শান্তির সময়েও গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে ভারত সীমান্তে গোলাবর্ষণ করিবার একটি সংগত অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাইবার প্রচেষ্টা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

৩. এই ছবিতে ভারতীয়দের একটি ভীরু কাপুরুষ জাতি হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কেননা এমন-কি একটি শূকর দেখামাত্রও তাহারা জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। এ-সব তথ্য কিন্তু সর্বৈব মিথ্যা।

৪. এই ছবিতে ব্রিটিশদের ত্রিশকোটি ভারতবাসীর 'রক্ষক' (ত্রাণকর্তা) হিসাবে দেখানো হইয়াছে। ব্রিটিশেরা ভারত জয় করিয়াছেন—তাঁহাদের এ দাবিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা যদি নিজেদের ভারতবাসীদের স্বার্থরক্ষাকারী এবং পরিত্রাতা বলিয়া দাবি করেন নিশ্চয়ই তাহার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাইব।

মহানুভব! পরিশেষে এই ব্যাপারে অনতিবিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি এবং অস্ট্রিয়ায় এই চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী বন্ধ করিবার ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাই।

অবিলম্বে যদি তাহা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্ততপক্ষে এইটুকু করা যাইতে পারে যে, ছবিটি দেখানোর আগে এ কথা ঘোষণা করা হইবে—

ভারতবাসীরা এই ছবিটিকে তাঁহাদের চরিত্র এবং নীতির একটি বিকৃত উপস্থাপনা বলিয়াই মনে করে এবং এই ছবির বীভৎস এবং আপত্তিকর দৃশ্যগুলির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছে। ভিয়েনায় প্রদর্শিত কোনো বিশেষ দেশের প্রতি অমর্যাদাসূচক চলচ্চিত্রের ব্যাপারে ইতিপূর্বে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

আপনার নিকট এই যে আবেদনপত্র আমি পেশ করিতেছি আমার ধারণা কুৎসা এবং মিথ্যারটনার বিরুদ্ধে নিজের দেশের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী প্রবাসী যে-কোনো প্রকৃত দেশপ্রেমিক ইহাকে আন্তরিক স্বাগত জানাইবেন।

আমাদের এই বক্তব্যের প্রতি বিবেচনাপরায়ণ এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য আপনার প্রতি আমার অগ্রিম কৃতজ্ঞতা এবং গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১৭ এপ্রিল ১৯৩৫

ভারতে নারী-জাগরণ

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নারীজাতির ভূমিকা প্রসঙ্গে ভিয়েনা কল-ক্লাবে প্রদত্ত ভাষণ।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে ভারতের নারী-আন্দোলনকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: ক. সামাজিক ও শিক্ষামূলক, খ. আন্দোলন-মুখী এবং গ. রাজনৈতিক।

সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে বোম্বাই এবং পুণার সেবাসদন বাংলাদেশের 'সরোজনলিনী অ্যাসোসিয়েশন' এবং অধ্যাপক কার্ভে প্রতিষ্ঠিত পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই-সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য : ১. বালিকা এবং মহিলাদের শিক্ষাদান করা, ২. শিক্ষকতা ও নার্সিং বৃত্তিতে এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপারে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের মধ্যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ৩. মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত জ্ঞানবিস্তার করা।

যদিও এগুলি বিভিন্ন নামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, তাহাদের কর্মপদ্ধতি কিন্তু প্রায় একই ধরনের।

কর্মক্ষেত্রগুলি

'অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স্‌ কন্‌ফারেন্স্‌', 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স্‌ ন্যাশনাল কাউন্সিল' এবং 'উইমেন্‌স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্‌' প্রমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি আন্দোলনমুখী কাজকর্মসমূহ চালাইতেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি নারী-জাতির সমানাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছে এবং এগুলিকে আধুনিক 'নারী মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান'গুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলারা তাহাতে যোগদান করেন।

ভারতীয় নারীসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি মুখ্যত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগেই পরিচালিত হইয়া থাকে। গ্রামীণ স্তর হইতে শুরু করিয়া উচ্চতর কর্মসমিতি পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বস্তরে মহিলাদের স্থানলাভের সুযোগ আছে। এমন কি কংগ্রেস সভাপতি হিসাবেও মহিলারা নির্বাচিত হন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেত্রীদের মধ্যে মহিলা-কবি সরোজিনী নাইডু অন্যতমা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে পুরুষ এবং মহিলা কর্মীরা দুঃখকষ্ট সমানভাবেই বরণ করিয়া থাকে। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি মহিলাকে কারারুদ্ধ করা হয় কিন্তু এই ঘটনা ভারতীয় নারীদের উৎসাহ এবং উদ্যমকে নির্বাপিত করিতে পারে নাই। বর্তমানে তাঁহারা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সংগঠনাধীন থাকিয়া কাজ করিতে রাজী নন, একান্তভাবে স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনও তাঁহারা গঠন করিয়াছেন।

বর্তমানে এমন কোনো কর্মক্ষেত্র নাই যেখানে স্ত্রীলোকদের কোনো ভূমিকা নাই। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শিল্প, সাহিত্য, শারীরচর্চা, যুব-আন্দোলন এবং রাজনীতি— প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মহিলারা অত্যন্ত আগ্রহী-ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রাখিয়াই ভারতের নারীসমাজ বর্তমান স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুদক্ষ মৌলিক কিংবা মহান সাহিত্য-ব্রতী হইতে শুরু করিয়া যোগ্য প্রশাসক পর্যন্ত বিচিত্র এবং বহুমুখী কর্ম-ক্ষেত্রগুলিতে মহিলারা তাঁহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় মহিলাদের তুলনায় ভারতীয় মহিলারা অধিকতর সুযোগের অধিকারিণী,

কেননা ইয়োরোপে ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনের মতো কোনো আন্দোলন তাঁহাদের করিতে হয় নাই। ভারতে বর্তমানে পুরুষেরা যে সামান্য অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন মহিলারাও তাহার সমানাধিকারিণী। এবং তাঁহাদের সক্রিয় উদ্যমের ও সংগঠনগুলির সাহায্যে ভবিষ্যতে যে-সমস্ত অধিকার তাঁহারা অর্জন করিবেন ভারতের নারীজাতিও তাহার অংশভাগিনী হইবেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সর্বক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়া ভারতের নারীজাতি সব রকম সমালোচনার ঊর্ধ্বে তাঁহাদের স্থান করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের দাবিগুলিও অপ্রতিরোধ্য মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ যেমন উজ্জ্বল হওয়া উচিত, তেমনই ভারতের নারীজাতির ভবিষ্যৎও একদিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

২২ এপ্রিল ১৯৩৫

বিদেশে ভারত-বিরোধী কুৎসা প্রচারের নিষ্পত্তি

চলচ্চিত্র এবং সংবাদপত্র মারফত আমেরিকায় ভারত-বিরোধী অপপ্রচার এবং ভারতবাসীদের পক্ষে তাহার নিষ্পত্তি করিবার কর্মপন্থা সম্পর্কে অভিমত।

সুইজারল্যান্ডে অবস্থানকালে আমি জানিতে পারি যে আইন পরিষদে 'ইন্ডিয়া স্পীকস' এবং 'বেঙ্গলী' নামক চলচ্চিত্র দুইটি লইয়া নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। এ কথা জানিয়া আমি বিশেষ করিয়া আনন্দিত যে যে-সমস্ত দেশে এই-সব ঘৃণ্য চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইতেছে সেখানকার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভারত সরকারকে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে বলা হইয়াছে। আসলে আমাদের সামনে দুইটি পরিপূরক কর্মপন্থা খোলা আছে। প্রথমত কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং দ্বিতীয়ত এই ধরনের চিত্রনির্মাতা দেশগুলির চলচ্চিত্র বয়কট। এ ক্ষেত্রে প্রথমত বয়কট করিতে হইবে আমেরিকান ফিল্ম এবং তাহার পর আমেরিকান জিনিসপত্রও।

প্রথমে জেনেভা এবং পরে মিউনিখেও 'বাঙালী' নামক চলচ্চিত্রটি আমি প্রদর্শিত হইতে দেখিয়াছি। শুধুমাত্র যে ছবিটি প্রদর্শনের ব্যাপারেই তাহা নয়, ছবিটির প্রচারের জন্যও যে-সব চমৎকার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে

তাহাও বিশেষ করিয়া চোখে পড়ার মতো স্পষ্টতই এ ব্যাপারে অঢেল টাকা খরচ করা হইতেছে।

চীনাদের ভূমিকা

অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা কী ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারে ভিয়েনায় সে ব্যাপারে আমি খোঁজখবর লইয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখি যে একবার ভিয়েনায় প্রদর্শিত একটি ছবিতে দেখানো হয় যে একদল চীনাদস্যু চীনের জাতীয় পতাকা কুওমিন্টাং ফ্ল্যাগ উড়াইয়া তাহাদের দস্যুবৃত্তি চালাইতেছে। এই ঘটনার বিরুদ্ধে চীনা রাষ্ট্রদূত সংগে সংগেই তাঁহাদের প্রতিবাদ জানান। কিছু আলাপ-আলোচনার পর এই ধরনের বোঝাপড়া হয় যে ছবিটি দেখানোর আগে এই কথা ঘোষণা করা হইবে যে চীনা দস্যুদের বিষয়ে তোলা এই ছবিতে চীনা দস্যুদের দ্বারা চীনের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের বিরুদ্ধে চীন সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন। চীন সরকারের নীতি হইতেছে দস্যুবৃত্তি দমন করা। অতএব এই ধরনের প্রচার বিভ্রান্তিকর এবং দুরভিসন্ধিমূলক।

আর-একটি ক্ষেত্রে ভিয়েনায় বার্নার্ড শ'-র রচনার ভিত্তিতে নির্মিত একটি ছবি দেখানো হইয়াছিল, যেখানে বলকান দেশের জেনারেলদের হাস্যকরভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। ওই দেশাগত ছাত্ররা কোনো কূটনৈতিক পন্থা-পদ্ধতির মধ্যে না গিয়া যে সিনেমায় ছবিটি দেখানো হইয়াছিল সোজা সেখানে যায় এবং ভাঙচুর করে। শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, পরদিনই ভিয়েনার কর্তৃপক্ষ ছবিটি নিষিদ্ধ করেন। মিশর, ইরাক, আফগানিস্তান এমনকি আইরিশ ফ্রি স্টেটেরও পর্যন্ত বিদেশে দূতাবাস আছে, কিন্তু আমাদের কোথাও কোনো দূতাবাস নাই। আর বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাও এত নগণ্য যে তাঁহাদের দ্বারা কোনো কার্যকর প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হইয়া ওঠে না। আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে বিকল্পটি আছে তাহা হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ সরকারের উপর এমন এক চাপ সৃষ্টি করিতে হইবে যাহার ফলে তাঁহারা কূটনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারটির উপর আমি জোর দিতে চাই যে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আর অপেক্ষা না করিয়া পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজধানীগুলিতে ভারতীয় দূত নিয়োগের জন্য আমাদের আন্দোলন শুরু করা দরকার। কানাডাবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে

এবং আইরিশ স্বার্থরক্ষার জন্য বার্লিন এবং প্যারিসে তাঁহাদের রাষ্ট্রদূত থাকিতে পারে, তবে কেনই বা ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ভারতের কোনো রাষ্ট্রদূত থাকিবে না? ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাই হোক-না কেন, আন্তর্জাতিক পদমর্যাদায় ভারত তো কানাডা এবং আইরিশ ফ্রি স্টেটের সহিত একই পর্যায়ের কেননা ভারত লীগ অফ্ নেশন্সের আসল সদস্যদের অন্যতম।

জার্মান সংবাদপত্রগুলি

আমার দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে জানাইতে চাই যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং ক্ষতিকর মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও চলচ্চিত্রই কিন্তু ভারত-বিরোধী প্রচারের একমাত্র মাধ্যম নয়। বই এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও তাহা করা হয়। বইপত্রের উপর খবরদারি করা হয়তো শক্ত, কিন্তু অনেক দেশেই সংবাদপত্র এবং অন্য পত্র-পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। যেমন জার্মানীর মতো দেশে সংবাদপত্রগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৩৩-এ জার্মানী পরিদর্শনকালে আমি লক্ষ্য করি যে সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল সমস্ত রচনা চাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা যে-সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী (সোশ্যালিস্ট) এবং উদারনৈতিক (লিব্যারাল) সংবাদপত্রগুলিতে এই ধরনের রচনাদি প্রকাশিত হইত, কার্যত সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যদিকে ইংলন্ডকে খুশি করিবার জন্য নাৎসীদের (ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির) উদ্যোগে ভারত-বিরোধী রচনাদির প্রকাশ কিন্তু অব্যাহতই থাকে।

জার্মান কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মিউনিখ এবং বার্লিনের প্রবাসী ছাত্র ফেডারেশনের তরফেও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। প্রত্যুত্তরে জার্মান কর্তৃপক্ষ জানান যে তাঁহারা এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেন। কিছুকাল বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি জার্মানীর নানাস্থানে আবার ভারত-বিরোধী অপপ্রচার লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই ধরনের ভারত-বিরোধী অপপ্রচারের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করি। ভারত-ভ্রমণান্তে ১৯৩৩-এ জনৈক জার্মান সাংবাদিক মিউনিখের একটি সংবাদপত্রে লেখেন যে, তিনি ভারতবর্ষে বিধবাদের জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতে এবং বোম্বাইয়ের রাজপথে মৃতদেহগুলি অবহেলাভরে ফেলিয়া রাখিতে দেখিয়াছেন। এই ধরনের গল্পগুলি যদি ছাপার অক্ষরে

প্রকাশিত হয় এবং এই-সব মিথ্যা অপবাদ যদি খণ্ডন করা না হয় তাহা হইলে সভ্য মানুষজনদের কাছে ভারতবাসীদের পক্ষে মুখ দেখানোই শক্ত হইয়া উঠে। যে-সব কাগজপত্রে এই ধরনের অদ্ভুত এবং ক্ষতিকর গল্পকাহিনী ছাপা হয় তাহারা কিন্তু সাধারণত ওই-সব অপবাদের বিরুদ্ধে লেখা প্রতিবাদপত্র ছাপিতে অস্বীকার করেন।

কালসাপ পোষা

এখানে একটি কথা বলার মতো এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশে ভারতের মুখে চুনকালি মাখাইবার দায়িত্ব যাঁহারা গ্রহণ করেন ভারতে অবস্থানকালে তাঁহারাই কিন্তু বেশ ভালোভাবেই ভারতীয় আতিথ্য ভোগ করিয়া থাকেন। একটি দৃষ্টান্তের কথা বলি। জার্মানীর ড্রেসডেন-প্রবাসী জনৈক বন্ধু আমাকে লেখেন যে বেঙ্গটবার্গ নামক সুপরিচিত এক স্ক্যানডিনেভীয় ভদ্রলোক ড্রেসডেনে ভারত-বিরোধী কিছু আপত্তিকর চলচ্চিত্র দেখান। বন্ধুটি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে তিনি জানান যে ভারতে তিনি অনেক রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে দিন কাটাইয়াছেন, তাঁহার মতামতকে তাই তিনি সামান্যই গ্রাহ্য করেন। আমাদের প্রবাদে বলা হয় 'দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা।' আমার আশংকা, এই-সব রাজা-মহারাজাদের প্রায় ক্ষেত্রেই দুধকলা দিয়া কালসাপ পুষিতেই দেখা যাইবে।

চলচ্চিত্র-শিল্পের বিশুদ্ধির জন্য ভিয়েনার মহামান্য আর্চবিশপ একটি আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই 'বাঙালী' নামক চলচ্চিত্রটি প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমি একটি পত্র লিখিয়াছি। আমার আশংকা এ ব্যাপারে মহামান্য আর্চবিশপ মহাশয় সম্ভবত এখন একটু অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িয়াছেন। কেননা ছবিটি একদিকে যেমন ভারতীয়দের অবমাননাকর এবং ঘৃণ্য মূর্তিতে উপস্থাপিত করিয়াছে, অন্যদিকে ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ চরিত্রের মহিমা ও সেখানে কীর্তিত। আর গ্রেট ব্রিটেনের প্রভাব তো সারা ইয়োরোপেই বিস্তৃত এমন-কি সোভিয়েট রাশিয়াতেও।

২৫ এপ্রিল ১৯৩৫

ব্রিটিশের সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি

কোনো ভারতীয় দৈনিকপত্রে প্রকাশিত বক্তব্য।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির জ্ঞান অতি সামান্যই। এখানে সাধারণভাবে এই ধারণাটি চালু যে মহাত্মা গান্ধী একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গান্ধীজি যে পরাজিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯৩০-এ আট বছর পরে দ্বিতীয়বার বিরাট আন্দোলন চালু করিবার সময় দু'টি বিষয়ের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমত তিনি আশা করিয়াছিলেন যে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা ভারতের অসামরিক শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। এবার তিনি আরো আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার আন্দোলনের নৈতিক চরিত্র ব্রিটিশ জনচৈতন্যে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিবে যাহার ফলে ভারতের সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সে স্বপ্ন সফল হয় নাই।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

অসহযোগ আন্দোলন যতই জোরদার এবং সমাজের নানাস্তরের বিপুল জন-চিত্তজয়ী ভূমিকা গ্রহণ করুক-না কেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে একেবারে অচল করিয়া দিবার মতো প্রবল ক্ষমতা তাহার ছিল না। প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার কিন্তু তাহার প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাইয়া যায়। এ ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক আবেদনও ব্রিটিশ জনচৈতন্যে খুব অল্পই সাড়া জাগাইতে পারে। এগুলিই অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ, এবং ইহার ফলে ১৯৩৪-এ গান্ধীজি নিজেই এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

গান্ধীজির সহায়ক শক্তিগুলি

প্রশ্ন ওঠে মহাত্মা গান্ধী পিছনে শক্তিগুলি আসলে কি? প্রসন্নচিত্তে দরিদ্র ভিখারীর মতো জীর্ণ কাপড়ের টুকরো-পরা, মাত্র নব্বই পাউণ্ড ওজনের শীর্ণ-কায় এই মানুষটির অসীম ক্ষমতার গোপন রহস্যটি কি? উত্তর কিন্তু খুবই সোজা। উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের দিক হইতে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ এই মানুষটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে-একাত্ম। ভারতের

রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের জন্য ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও তাহার পিছনে। নির্মল-চরিত্র মানুষের এই খ্যাতি এবং আবেদন না থাকিলে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজি হয়তো এত বিরাট একজন মানুষরূপে চিহ্নিত হইতেন না। কিন্তু পিছনে সুসংবদ্ধ একটি দলের জোর না থাকিলে বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোনোক্রমেই তিনি বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইতেন না।

কংগ্রেস ও গান্ধীজি

অসহযোগ আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহারের সংগে সংগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যপ্রণালীরও বদল ঘটে। কংগ্রেসের ভিতরকার একটি গোষ্ঠী সাংবিধানিক এবং আইনসংগত উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট এবং আইন পরিষদের বিতর্কে (আলাপ-আলোচনায়) অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে অন্য আর-একটি গোষ্ঠী সর্বাগ্রে দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হন। সাময়িকভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও কংগ্রেস এবং জনগণের উপর আগের মতোই তাঁহার প্রভাব ছিল অসীম। দলের বর্তমান নেতৃত্ব তাঁহারই হাতে গড়া এবং কংগ্রেসের বর্তমান কার্যসূচী ও কর্মপন্থাও তাঁহারই সম্মতিতে নির্ধারিত। এইভাবে আজও পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে সর্বাপেক্ষা বড়ো শক্তি।

সংস্কারবিরোধী মধ্যপন্থীরা

পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য ব্রিটিশ সরকার যে-সব সংস্কারমূলক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন যুগপৎ ভারত এবং ইয়োরোপের আগ্রহ এখন তাহার প্রতি কেন্দ্রীভূত। এ ব্যাপারে বল্‌ড্‌ইন এবং চার্চিলের মধ্যে যে মতান্তর দেখা দিয়াছে ভারতের পক্ষে তাহা একান্তই গুরুত্বহীন। বল্‌ড্‌ইন ভারতকে যে-সব সুযোগ-সুবিধা দিবার পক্ষপাতী, চার্চিলের মতে হয়তো বা ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণেরই নামান্তর।

তবুও ভারতের সবচেয়ে গোঁড়া মধ্যপন্থী রাজনীতিকরাও বল্‌ড্‌ইনের দেওয়া এই প্রস্তাবকে স্বাগত না জানাইয়া প্রত্যাখ্যানই করিতেছে। প্রস্তাবিত

এই নূতন সংস্কারগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক নানা পার্লামেন্টারি সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে।

সরকারী হস্তক্ষেপ এবং ক্ষমতাহীন মন্ত্রী

বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী মন্ত্রিগণ আইনপরিষদের নিকট দায়িত্ববদ্ধ হইলেও ইংলন্ডের ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাহার প্রতি আনুগত্যপরায়ণ গভর্নরদের ঐ-সব মন্ত্রিদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার এবং এমন-কি যে-কোনো বিভাগের শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইবারও ক্ষমতা থাকিবে। ইহা ছাড়াও উচ্চতম পর্যায়ের সরকারী আমলারা প্রাদেশিক মন্ত্রিবর্গের শাসন-সীমার এক্তিয়ারভুক্ত থাকিবেন না। তাঁহাদের যাবতীয় আনুগত্য থাকিবে ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রতি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এই শাসনের কেন্দ্রে থাকিবেন ভাইসরয়। তিনি গভর্নর জেনারেলও বটে। এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের চেয়ে তাঁহার অগ্রাহ্য বা না-মঞ্জুর করিবার বিশেষ ভেটো (veto) ক্ষমতা থাকিবে অনেক বেশি।

ফেডারেল বাজেটের শতকরা প্রায় আশি ভাগের ক্ষেত্রেই আইন পরিষদের পার্লামেন্টারি অনুমোদন গ্রহণ না করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। বৈদেশিক, আর্থিক এবং সামরিক— এই ধরনের নানা বিভাগকে পার্লামেন্টারি নিয়ন্ত্রণ-সীমার বাহিরে রাখা হইয়াছে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট কিংবা সরকার সামান্যতম এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না, যাহার ফলে ইংলন্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

হিন্দু-বিরোধী এবং রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষক ব্যবস্থাসমূহ

প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে হিন্দু-প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রটিক নানা কৃত্রিম বিধি-নিষেধের দ্বারা সংকুচিত করার চেষ্টা করা হইতেছে এবং তাহার ফলে নূতন এই সংবিধানের কার্যকর ভূমিকাটিকে ছাঁটিয়া বাদ দিবার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভারতীয় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই হিন্দু এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দাবিগুলির পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের সক্রিয় ভূমিকা রহিয়াছে। অতএব এই সংস্কারের জটিল নানা বিধিবিধানের ফলে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নৈতিক (?) এবং ধর্মীয় দিক হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

জনসাধারণ তাঁহাদের সংখ্যাগত গুরুত্ব অপেক্ষা আরো অনেক বেশি প্রতিনিধিত্ব লাভ করিবে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে অংশগ্রহণেচ্ছু রাজন্যবর্গকে সরকার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিতে চান। এইভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টে ভারতের রাজন্যবর্গকে অধিকতর প্রতিনিধিত্ব দানের ব্যবস্থাদি করিয়া ইংরাজেরা আশা করেন যে পার্লামেন্টে তাঁহারা ইংরাজের বশংবদ একটি শ্রেণী হিসাবে কাজ করিবেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রাধিকার নিরর্থক

ব্রিটিশ সরকার যদি তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার একটি বড়ো অংশ ভারতীয় জনগণকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইতেন তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ভারতের জাতীয়তাবাদী দলের একটি বেশ বড়ো এবং প্রভাবশালী অংশ ইংরাজদেরই পক্ষাবলম্বন করিতেন এবং তাহার ফলে বেশ বহুদিনের জন্যই এই দলটি অনেকখানি পঙ্গু হইয়া পড়িত। প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধী দল হিসাবে এই দলটি কিন্তু বাধাহীনভাবেই তাঁহাদের ভূমিকা পালন করিয়া যাইবেন। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য আরো বেশি আসন মঞ্জুর করিয়া এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাইবে না। কেননা মঞ্জুরিকৃত এই-সব আসনের সঙ্গে প্রকৃত ক্ষমতার কোনো যোগ নাই; অতএব এই আসন-মঞ্জুর করার ব্যাপারটি কিন্তু এমন-কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসাধারণকেও সন্তুষ্ট করিবে না।

রাজন্যবর্গের দ্বিধা

এখনো পর্যন্ত যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার তাঁহারা ভোগ করিতেছেন পাছে সেগুলি হারান, এই ভয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গ পরিকল্পিত এই ফেডারেশনে যোগদান করিতে দ্বিধা করিতেছেন। কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত তাঁহাদের এলাকাগুলি নিজেদের আন্দোলনের বাহিরে রাখিয়াছে। কিন্তু সরকারের ইচ্ছানুযায়ী যদি তাঁহারা এই ফেডারেশনে যোগ দেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের আন্দোলন অনিবার্যভাবেই তাঁহাদের এলাকাগুলিতে ছড়াইয়া পড়িবে।

অন্যান্য শক্তি

এই কারণগুলি ছাড়াও ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করিবার মতো কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য শক্তিগুলিও রহিয়াছে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নির্দেশে পরিচালিত পেজেন্টস্ অর্গানাইজেশন, এবং কংগ্রেসের ভিতরকারই যে জঙ্গী সংগঠন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি নামে পরিচিত, তাঁহারাই এ-রকম দুটি শক্তি।

নূতন আন্দোলনের ডাক

একদিকে অপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাস্পৃহা এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি— ইহার ফলে সারা দেশ খুব সহজেই আর-এক সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। অতএব এই নূতন সংবিধান চালু করিবার ঘটনাটি দেশে নূতন এক গণ-আন্দোলনের সংকেত হিসাবে কাজ করিতে পারে। সমগ্র ভারতবাসী আন্তরিকভাবে চান যে গান্ধীজী তাঁহাদের মধ্যে জীবিত থাকুন। আর যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারই নেতৃত্বে আবার এই নূতন আন্দোলন পরিচালিত হইবে।

জেনেভা। ৭ জুন ১৯৩৫

আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা

ভিয়েনার সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

'ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান সোসাইটি' স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক বছর আগে একদিকে অস্ট্রিয়ার অন্যদিকে ভারতের নরনারী লইয়া গঠিত দুইটি দল ভিয়েনায় মিলিত হয়। ঘটনাচক্রে আমাকেও ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। বারো মাস আগে কেন আমরা এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবার এবং কেনই বা ভিয়েনাতেই আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে কথা জানিতে সম্ভবত আজ আপনারা আগ্রহ বোধ করিবেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে সারা পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে

এবং তাহার ফলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও ভারতীয় জনসাধারণের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে— ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগে বহির্বিশ্বের সংগে ভারতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বিদেশে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আলো ছড়াইয়া দিবার জন্য ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা (সংস্কৃতিদূতেরা) সমগ্র এশিয়া মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বণিকেরা যেদিন পৃথিবীর সর্বত্র পর্যটন করিতেন এবং আপনারা সবাই জানেন যে সেকালে ভারতবর্ষকে সোনা ও মধুতে ভরা এক রোমান্সের দেশ হিসাবে গণ্য করা হইত। ভারতাভিমুখী সমুদ্র-পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপীয় নাবিকেরা বহু ভৌগোলিক অভিযান চালাইয়াছিলেন। সেকালের পর হইতে ক্রমে ক্রমে ভারত যতই বহির্বিশ্ব হইতে গুটাইয়া লইয়াছে ততই সে দুর্ভাগ্য এবং ধ্বংসের একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। খুব সাম্প্রতিককালেও নিজের এলাকা-বহির্ভূত কোনো কিছু জানিবার আগ্রহও ভারতের মধ্যে দেখা যায় নাই।

এখন সব-কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে। আজ ভারত বহির্বিশ্বের সহিত আবার যোগাযোগ স্থাপন করিতে চায়। তাহার আগ্রহ আগের মতো কেবল-মাত্র ইংলণ্ডেই কেন্দ্রীভূত নয়। আভ্যন্তরীণ নানা সংকট সত্ত্বেও ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (লীগ্ অফ নেশনস্-এর) প্রকৃত সদস্যদের একজন এবং বিশ্বজাতি-পরিবারের একজন সদস্যও বটে। তাই বিশ্বের নানা ঘটনায় তাহাকেও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিতে হইবে। ভারতীয় জন-মানসে এই সচেতনতা ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে যে অবশিষ্ট বিশ্বের সহিত বিচ্ছিন্নতাই আমাদের বর্তমান অবনতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই সচেতনতার প্রকাশই লক্ষ্য করা যায় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়োরোপীয়ান সোসাইটি'র মধ্যে। মধ্য-ইয়োরোপের সংগে— বিশেষ করিয়া অস্ট্রিয়া এবং ভারতের মধ্যে একদিকে সাংস্কৃতিক এবং অন্যদিকে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্রমিক উন্নতি সাধন— ইহার মধ্য দিয়াই সমিতির দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে হয়তো বা অস্ট্রিয়া একটি ছোটো দেশ, কিন্তু মধ্য ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে এই দেশের অবস্থান। অতএব প্রথমেই আমরা অস্ট্রিয়া এবং ভারতের মধ্যে উন্নত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিব— ইহাই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু ভিয়েনা — সে তো কেবল অস্ট্রিয়ার প্রধান শহর নয়, ড্যানিয়ুব-

তীরের রানী নয়— মধ্য-ইয়োরোপের কেন্দ্রবর্তী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শহর এই ভিয়েনা। অতএব ভিয়েনাই যে আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর হইবে— ইহাই কি স্বাভাবিক নয়? শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিয়েনার ভূমিকা অনেকখানি। বাণিজ্যিক যোগাযোগের ব্যাপারেও অনুকূল অবস্থান এবং চমৎকার সুযোগ-সুবিধার দিক হইতেও ভিয়েনার গুরুত্ব কম নয়।

ভারত পূর্বগৌরবে ফিরিয়া আসিতেছে

ভারতেরও, মধ্য ইয়োরোপকে, বিশেষ করিয়া অস্ট্রিয়াকে অনেক কিছু দিবার আছে। ভারত আবার তাহার পূর্বগৌরবে ফিরিয়া আসিতেছে। ভারতের বিদ্বজ্জন এবং বৈজ্ঞানিকেরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন এবং এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে অবশিষ্ট বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেও ভারত মূল্যবান কিছু অবদান রাখিতে সমর্থ হইবে।

পৃথিবীতে ভারত আর শুধুমাত্র কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসাবেই পরিচিত থাকিবে না এবং ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটিতেছে— বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই তথ্যটি সম্ভবত আপনাদের নিকট আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হইতে পারে।

মাত্র বারোমাস আগে আমাদের এই সোসাইটি শুরু হয়। ক্ষমতা আমাদের সীমিত, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আমাদের অনেকখানি। এই কয় মাস যাবৎ আমরা ভারত এবং মধ্য ইয়োরোপের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হইয়াছি। আমরা যে খুব বিস্ময়কর কিছু ফলাফল দেখাইতে পারিয়াছি তাহা আমরা দাবি করি না। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে. আমরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করিতে পারিয়াছি এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি। সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত আমরা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় দিতে পারি নাই। বর্তমানে আমরা তাহা শুরু করিতেছি মাত্র এবং আশা করি পরবর্তী বার্ষিক সভায় এ-বিষয়ে আমরা আমাদের আরো ভালো একটি পরিচয় আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার দেশবাসীর পক্ষ হইতে এই সমিতির উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়ের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন জানাই। এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে

আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় একদিকে মধ্য ইউরোপ তথা অস্ট্রিয়া অন্যদিকে ভারতের পক্ষে কল্যাণকর নানা সফলতা অর্জন করিতে পারিব এবং কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য হিসাবে 'ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান সোসাইটি'র প্রতি আপনারা যে সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইয়াছেন সেজন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৬ জুন ১৯৩৫

ভারত-বিরোধী কুৎসা প্রচার

বিদেশে ভারত-বিরোধী প্রচার প্রসঙ্গে 'ইউনাইটেড প্রেস' মাধ্যমে বিবৃতি।

আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে ভারতীয় প্রচার সম্পর্কে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কার্যকর প্রচারের জন্য দুইটি জিনিস খুব দরকারী ১. উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা স্বীকৃত প্রতিনিধিবর্গ এবং ২. ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল। এ কথা বলাই বাহুল্য টাকা-পয়সার পরিমাণ যত বেশি হইবে প্রচারও তত বেশি কার্যকর হইবে। আমাদের যদি সত্যসত্যই কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে তবে প্রচুর টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক জরুরী কাজ করিয়া উঠিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় এমন বহু ভারতীয় আছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কোনো-রকম সাহায্য ছাড়াই কেহ বা ব্যক্তিগতভাবে, আবার কেহ কেহ বা তাঁহাদের নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নামে, ভারত-সম্পর্কিত নানা জরুরী প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে যদি বিদেশে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করা সম্ভব হইত তাহা হইলে অতিরিক্ত কোনো টাকা-পয়সা খরচ না করিয়াও দেশ তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক বেশি কাজ পাইতে পারিত। প্রয়াত পুণ্যশ্লোক বিঠলভাই প্যাটেল প্রায়ই বলিতেন যে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে যদি তিনি কথা বলিতে পারিতেন তাহা হইলে বিদেশে তাঁহার কার্যকলাপ আরো অনেক বেশি কার্যকর হইতে পারিত। এবং আমার মতো গৌণ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাও ওই একই ধরনের। টাকা-পয়সার অভাবই

যদি কংগ্রেসের একমাত্র সমস্যা হয় তবে কংগ্রেস কি অন্ততপক্ষে আমাকে (এবং আমার মতো অন্যান্য কর্মীদেরও) কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবার এবং কথাবার্তা বলিবার অধিকার দিবেন ? সে-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনোরকম আর্থিক সাহায্য ছাড়াই অনেক বেশি দেশসেবার পরিচয়ের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের দেশের উন্নততর একটি পরিচয় তুলিয়া ধরিতে পারি। আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের (সভাপতির) কাছে খুব সোজাসুজি এই প্রশ্নটি রাখিলাম, এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুরূপ সোজাসুজি একটি উত্তরেরও প্রত্যাশা জানাই।

এই প্রসংগে এই মুহূর্তে আমার বক্তব্য এই যে আভ্যন্তরীণ নানা প্রশ্নে আমাদের মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ থাকেও বা বৈদেশিক প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে যেন তাহা কোনোরকম বাধা হইয়া না দাঁড়ায়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা যে মতই পোষণ করি-না কেন যে মুহূর্তে আমরা বিদেশের মুখোমুখি হইব সেই মুহূর্তে যেন উদ্দেশ্য এবং কার্যসূচীর দিক দিয়া আমরা অভিন্ন ঐকমত্যে উপনীত হই। কার্যসূচীটি মোটামুটিভাবে এই ধরনের

১. ভারত সম্পর্কিত মিথ্যা অপপ্রচারের বোঝাপড়া করা।

২. সারা পৃথিবীকে ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের স্বরাজের জন্য লড়াই সম্পর্কে অবহিত করা।

এবং ৩. সাধারণভাবে দর্শন শিল্প এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের সাফল্যের সংগে পৃথিবীর মানুষকে পরিচিত করানো।

আর মিঃ ভি. জে. প্যাটেলের উত্তরাধিকার সম্পর্কে এই পর্যায়ে আমার বক্তব্য এই যে যদিও ন' মাস (বা তারও বেশি) আগে প্রোবেট (আদালতে ইচ্ছা-পত্রের নকল) মঞ্জুর করা হইয়াছিল তবুও এখনো পর্যন্ত টাকা কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের (Executor) হাতেই আছে এবং এ-ব্যাপারে বহু সময় বৃথাই নষ্ট হইতেছে।

২১ জুলাই ১৯৩৩

২

চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে প্রেরিত বক্তব্য।

বিদেশে ভারত-বিষয়ক প্রচার প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের জন্য আমি যে বিবৃতিটি পাঠাইয়াছিলাম ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে, বিশেষ করিয়া 'ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার' কাগজটির সমালোচনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের অভিযোগগুলি অনুধাবন করার পর এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে এই-সব প্রচারের অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচুর ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ রহিয়াছে। প্রথমেই আমার বক্তব্য এই যে এই ধরনের প্রচারকার্যগুলি লোকের খামখেয়ালিপনা চরিতার্থ করিবার মতো বিষয় নয়। এগুলি বরং আমাদের দৈনন্দিন জাতীয় কর্মপন্থারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের ক্ষেত্রে যদি আমি বিদেশে এই ধরনের প্রচারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করিতাম তাহা হইলে আমাদের কংগ্রেস-তহবিলের শোচনীয় অবস্থার কথা জানা সত্ত্বেও আমি এ ব্যাপারে এতখানি আগ্রহী হইতাম না।

আয়রল্যান্ডের দৃষ্টান্ত

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে যে-সব দেশ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে গভীর মনোযোগের সহিত তাহাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখি যে তাহারা এই ব্রতে একান্ত নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে আয়ারল্যান্ডের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এখানে চেক্ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগের প্রতি আমি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রায় কুড়ি বছর ধরিয়া ড. মাশারিক্ (অধুনা প্রেসিডেন্ট) ড. বেনেশ (বর্তমান বিদেশমন্ত্রী) এবং অন্যান্যেরা সুপরিকল্পিত নিষ্ঠার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রচারকার্য চালাইয়া গিয়াছেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর এ-বিষয়ে তাঁহাদের অবিচল নিষ্ঠার সুফল ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের ফরাসী ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বন্ধুদের সাহায্য না পাইলে চেক্ নেতারা কোনোক্রমেই তাঁহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিতেন না।

এমন-কি স্বাধীনতা লাভের জন্য সামরিকবাহিনীর উপর নির্ভরশীল দেশ বা ব্যক্তিরাও বিদেশে প্রচার এবং তাহার ফলে যে বৈদেশিক সহানুভূতি লাভ

করা যায় সে বিষয়টিও ত্যাগ করিতে পারেন না। দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্রিটিশদের সহিত সংগ্রামরত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকানদেব কথা স্মরণীয়। তাঁহাদেরও ফরাসীদের সহানুভূতি এবং সমর্থনের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইয়াছিল। জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে দেশ হিংসাত্মক কার্য-কলাপের আশ্রয় গ্রহণ করে না বিদেশে প্রচারকার্য চালানো তাহার পক্ষে একান্ত জরুরী। তাই আমরা দেখি যে হাঙ্গেরী খুব সুচিন্তিত নিষ্ঠার সঙ্গে বৈদেশিক প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। কেননা তাহার আশা এই যে, যে ত্রিয়ানোঁর চুক্তি তাহার মতে অন্যায় এবং অযৌক্তিক, এইরকম শান্তিপূর্ণ প্রচার পদ্ধতির সাহায্যে সে ওই চুক্তির সংশোধন ঘটাইতে পারিবে। যেহেতু হিংসাত্মক পন্থাকে আমরা মানি না এবং অহিংসপন্থায় স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাসী অতএব বৈদেশিক প্রচারকার্য চালানো আমাদের পক্ষেও একান্ত জরুরী, এবং তাহা আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপন্থারও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

সরকার যখন বহুবার এই কথা বলিয়াছেন যে কংগ্রেসীদের দ্বারা পরি-চালিত সংবিধানসম্মত (আইনানুগ) এবং শান্তিপূর্ণ কোনো ক্রিয়াকলাপে তাঁহাদের কোনো আপত্তি নাই, তখন আমাদের এই ধরনের কর্মপন্থাতেও তাঁহাদের কোনোরকম আপত্তি থাকিতে পারে না।

এই কার্যের পরিধি এবং উদ্দেশ্য

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এই প্রচারকার্যের পরিধি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট ভুল ধারণা বর্তমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম ধারণা থাকিতে পারে যে এই ধরনের প্রচারকার্য চরিত্রগত দিক দিয়া আসলে কোনো গোপন, বৈপ্লবিক এবং ব্রিটিশ-বিরোধী ব্যাপার। কিন্তু আমি অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতে চাই যে এই ধারণা যদি আদৌ কাহারো মনে থাকে, তবে তাহা একান্তই ভিত্তিহীন। কেননা চরিত্রের দিক দিয়া প্রচার নামক ব্যাপারটিই অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য একটি বিষয় এবং স্বরূপত তাহা গোপন এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতিরও বিরোধী। তাহাছাড়া এই প্রচার তো ব্রিটিশ-বিরোধী নয়, ইহা হইবে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে একটি ব্যাপার। ইয়োরোপ-প্রবাসের দিনগুলিতে প্রচার সম্পর্কে আমি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, এবং তাহার ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে এ কথা আমি বলিতে পারি যে, যে মুহূর্তে আমরা ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার

শুরু করিবার চেষ্টা করিব ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহা হইবে আমাদের উদ্দেশ্য-পরিপন্থী কাজ।

আমাদের সমস্ত কাজকর্মের বিরোধিতা করিবার জন্য ইয়োরোপের প্রত্যেক প্রধান প্রধান শহরে এম্‌ব্যাসি, কনস্যুলেট, অসংখ্য বেসরকারী সংস্থা প্রভৃতি সহ ব্রিটিশদের এক বিশাল প্রচারযন্ত্র রহিয়াছে। তাহাছাড়া স্বভাবতই মানব-চরিত্রের ধর্মই এই যে কাহারো অনুপস্থিতিতে আমরা যদি তাহাকে আক্রমণ করি; সে-ক্ষেত্রে অন্যের সহানুভূতি আমরা লাভ করি না বরং তাহা হইতেও বঞ্চিত হই। অন্যদিকে ভারতপন্থী বা ভারতীয় স্বার্থানুকূল প্রচারাদি চালাইয়া গেলে জনমানসেও আমাদের প্রভাব (ভাবমূর্তি) অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এবং ব্রিটিশ সরকার যদি আমাদের এই ন্যায্য প্রচারপন্থকে দমন করিতে চায় তাহা হইতে স্বাভাবিকভাবেই ভ্রান্তনীতি গ্রহণের দরুন তাহারা জনসমর্থন লাভে বঞ্চিত হইবে।

ভ্রান্ত ধারণা দূর করা দরকার

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত আমার পূর্ববর্তী বিবৃতিতেই আমি বলিয়াছি যে এই প্রচারকার্যের ব্যাপারটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

১. ভারতবিরোধী মিথ্যা অপপ্রচার রোধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ইয়োরোপে এরকম একটি ধারণা বহুল প্রচারিত যে ভারতে বিধবাদের পুড়াইয়া মারা হয় এবং মাত্র পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে বালিকাদের বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। বেশ কয়েক দশক ধরিয়া অভিসন্ধি-পরায়ণ নানা দুষ্টচক্রের এই ধরনের প্রচার চলিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ না করার ফলেই এইরকম সব ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় বছরখানেক আগে ভারত-প্রত্যাগত জনৈক জার্মান মহিলা সাংবাদিক মিউনিখের একটি সংবাদপত্রে লেখেন যে ভারতে তিনি বিধবাদের জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতে দেখিয়াছেন। এই ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রতিবাদ উত্থাপিত না হয় তবে লোকে তাহাকেই সত্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে।

২. ভারতের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করিবার জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

ভারতের বিশালতা এবং আভ্যন্তরীণ গুরুত্বের কথা বিবেচনাপূর্বক বলা যায় যে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ভারত-সংক্রান্ত সরাসরি তথ্য খুব সামান্যই পৌঁছায়। এবং যেটুকু সামান্য তথ্য বিদেশে যায় প্রায়শই সেগুলি বিকৃত এবং অসত্য হয়।

৩. জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববাসীকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

আমার মতে এই বিষয়ে কাজ করাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি। কেননা বিশ্ববাসীকে যদি আমরা আমাদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি সম্পর্কে অবহিত করিতে পারি, তাহা হইলে একদিকে যেমন আমরা ভারত-সম্পর্কিত মিথ্যা ধারণাগুলি দূর করিতে পারিব, তেমনি আমাদের দেশের আসল পরিচয়টিও তুলিয়া ধরিতে পারিব। আমাদের বিরুদ্ধে যে-সব প্রচারকার্য চালানো হয় এবং এখনো হইতেছে তাহার আসল কথাটি এই যে আমরা একটি অসভ্য জাতি, আমাদের মেয়েরা অত্যন্ত হীন দাসত্ব-শৃংখলে বাঁধা থাকে এবং আমাদের সমাজটিও অজস্র অন্তর্কলহে ছিন্নভিন্ন। এবং এই অসত্য অপবাদটি শুধু ভারত নয়, সমস্ত এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় নারীদের বিরুদ্ধে মিস্ মেয়ো এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এই মিথ্যা এবং অভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারের বিরোধিতা করিতে গেলে অতীতে এবং বর্তমানেও ভারতীয় নারীদের বহুমুখী কৃতিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করিতে হইবে। সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমি ইহা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি এবং যথেষ্ট সুফলও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

একটি চীনা পরিকল্পনা

সম্প্রতি চীনা নেতারা ইয়োরোপে সাংস্কৃতিক প্রচারের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জেনিভায় তাঁহারা মূলকেন্দ্র (হেড্কোয়ার্টার) স্থাপন করিয়াছেন এবং বেশ বড়ো একটি বাড়িতে (ভিলা) একটি চীনা গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিল্প ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে চীনা কৃতিত্বের নানা পরিচয়ও তাঁহারা ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি বছর জেনিভায় চীনা শিল্পকর্মের একটি প্রদর্শনী করা হইতেছে এবং জেনিভা হইতে এই-সব প্রদর্শনযোগ্য বস্তুগুলি ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে

পাঠানো হয়। গত এপ্রিলে আমাদের জেনিভা অবস্থানকালে তাঁহারা দশ বছর বয়স পর্যন্ত চীনা শিশুদের আঁকা ছবির অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। আগামী নভেম্বরে লন্ডনে একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইবে এবং তাহার জন্য এক জাহাজ-বোঝাই অমূল্য চীনা শিল্প-সম্ভারও লন্ডনে আনা হইতেছে। ইয়োরোপীয়রা যখন ঐ প্রদর্শনীতে যাইবেন, স্বতন্ত্র কোনো প্রচার ছাড়াই চীনারা যে খুবই সুসভ্য এবং সংস্কৃতিবান জাতি, সে কথা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে ধারাবাহিকভাবে সুপরিকল্পিত প্রচার-কার্য চালানোর ফলেই চীনারা সভ্য দুনিয়ার সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছেন। মাঞ্চুকুও সংক্রান্ত চীন-জাপান বিরোধের ঘটনা হইতেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা এ ক্ষেত্রে জাপানের বিরুদ্ধে এবং চীনের অনুকূলেই সমস্ত দুনিয়ার সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়। চীন যে এই সহানুভূতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই নিশ্চয়ই সামরিক দুর্বলতাই তাহার কারণ। কিন্তু চীনা জনসাধারণ আন্তর্জাতিক সহমর্মিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং আরো বেশি মাত্রায় তাহা অর্জনের জন্য তাহারা কৃত-সংকল্প। চীনা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থাকিলেও এই প্রচারকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি বড়ো অংশ কিন্তু বেসরকারী ব্যক্তিরা জোগাইয়া থাকেন।

ব্রিটিশপন্থী প্রচার

এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, সম্প্রতি অন্যান্য দেশে ব্রিটিশপন্থী প্রচারের জন্য প্রিন্স অফ ওয়েলসের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংলন্ডে 'দি ব্রিটিশ কাউন্সিল ফর রিলেশনস উইথ ফরেন কান্ট্রিজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। এই সংস্থার সভাপতি লর্ড টাইরেলের মতে পাঁচটি সরকারী দপ্তরের সহযোগিতায় এবং বিদেশ-মন্ত্রকের (দপ্তরের) দৃষ্টান্তক্রমে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সরকারী অর্থকোষ হইতে ইহাকে দু হাজার পাউন্ড অনুদান মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৩ জুলাই তারিখের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' মন্তব্য করিয়াছেন : "জাতীয় মর্যাদা এবং প্রচারের জন্য ফরাসী এবং ইটালী সরকার এখন বাজেটে প্রতি বছর এক মিলিয়ন পাউন্ড হারে অর্থসংস্থান করিতেছেন। সম্প্রতি একই উদ্দেশ্যে আগামী বছরের

জন্য জাপানও এক হাজার পাউন্ড বাজেট-বরাদ্দ করিয়াছেন, এবং রাইখের আভ্যন্তরীণ ব্যয় ছাড়াও তাহার বাহিরেও জার্মান প্রচারমন্ত্রক প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। অনুরূপভাবে আমরা যদি আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তিটির সম্প্রচার চাই তাহা হইলে আমাদের ছ হাজার পাউন্ড অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা দরকার। এই অর্থ যে সবটাই সরকারী তহবিল হইতে আসিতে হইবে তাহা নয়।"

উপরোক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে ভারত-সম্পর্কিত প্রচারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মারের' মতো পত্রিকাগুলিও এত দায়িত্বহীন এবং ছেঁদো কথাবার্তা লিখিয়া থাকেন যে তাহা অত্যন্ত দুঃখ-জনক বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চাশ বছর আগে ইংলন্ডে ভারতবিষয়ক প্রচারকার্য যদি ব্যর্থ হইয়া থাকে— তাহার কারণ হইতেছে ১. ত্রুটিপূর্ণ প্রচারপদ্ধতি এবং ২. এই ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য সম্পূর্ণ ভুল লোক নির্বাচন। ইন্ডিয়ান রিফর্মার ইয়োরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিবান জন-সাধারণের মনে ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধা সঞ্চারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অসংখ্য ভারত-প্রচারকদের এবং ভারত-হিতৈষী বন্ধুদের ভূমিকাটি বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অবস্থাটি এইরকম যে বিদেশে ভারত সম্পর্কে সাধ্যমতো প্রচারকার্য চালাইয়া যাইবার মতো বহু ভারতীয়ই আছেন। কেবলমাত্র প্রশ্ন এই যে প্রথমত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাঁহাদের উপর এই জাতীয় পরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া এই কমিটিকে আরো সুদক্ষ এবং কার্যকরভাবে রূপায়িত করিবেন কিনা!

২৭ জুলাই ১৯৩৫

বাংলায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের প্রয়োজন

২১ জুলাই ১৯৩৫ চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়কে লিখিত অভিমত।

আমি আপনার ১৯৩৫ সালের ১৭ মার্চ তারিখের দীর্ঘ এবং চিত্তাকর্ষক চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। নানা কারণে বিলম্বে উত্তর দানের জন্য আমি দুঃখিত। প্রথমত, আমি আমার চিঠিগুলিতে এত স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে যাহা বলিয়াছিলাম তাহার পুনরাবৃত্তি করা আমি প্রয়োজন মনে করি নাই। দ্বিতীয়ত, আমি অনুভব করিয়াছিলাম যে আমার প্রথম চিঠি যদি আপনাকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাইতে ব্যর্থ হইয়া থাকে তাহা হইলে এতদূর হইতে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে তাহা করা বোধহয় অসম্ভব ছিল। তৃতীয়ত, আমি আশা করিয়াছিলাম যে যেখানে আমার যুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে সেখানে সময়ের অতিক্রমণ আপনার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে এবং সব শেষে গুরুতর পুনরারম্ভের পথে আমার স্বাস্থ্য আংশিক বাধা স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এখন যে আমি আপনার চিঠির জবাব দিতে যাইতেছি তাহার কারণ এই যে, কয়েকটি মহল হইতে সম্প্রতি আমাকে বুঝানো হইয়াছে যে আপনার চিঠির জবাবের জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা চলিতেছে।

প্রারম্ভে আমি বলিতে চাই যে আপনি আমার চিঠির দ্রুত প্রচার সম্বন্ধে কেন অভিযোগ করিয়াছেন তাহা আমি জানি না। যতদিন পর্যন্ত আমি নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলাম ততদিন বর্তমান জরুরি সমস্যা সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং, জনগণের একটা সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি মুক্তি লাভ করিবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র পুনরায় একটি বিবৃতি দেওয়ার সুযোগ আমার লওয়া উচিত। এই চিঠিটি প্রকাশ করা অনুচিত হয় নাই, কারণ ইহার বিষয়বস্তু তো কেবল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির জন্য নয়— বরং বৃহত্তর জনসমাজের জন্য।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ও কংগ্রেসের মনোভাব

আপনার চিঠিতে আপনি যে-সব প্রশ্ন তুলিয়াছেন সেইগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে যখন নূতন সংবিধান পার্লামেণ্টে বিবেচিত হইতেছিল তখন ইহা সংশোধিত না হওয়ার জন্য তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে

কংগ্রেসের উদাসীন মনোভাব অধিক দায়ী— ইহা আমার নিশ্চিত অভিমত এবং ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মনোভাবকে কার্যত সম্মতিদান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। একটি জনসংস্থা বরাবর সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া আসিয়া হঠাৎ তাহা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হইবার সময় তাহাকে বাদ দিতে অসম্মত হইলে তাহার আর অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। কংগ্রেস যখন এইরূপ একটি বিরাট ভুল করিতেছিল তখন খাঁটি চিন্তাশীল সকল মানুষের কর্তব্য ছিল অগ্রসর হইয়া আসা এবং রোয়েদাদের বিরোধিতা করা। আর আপনার দলের কর্তব্য ছিল সমগ্র বাংলাকে ইহার বিরুদ্ধে সমবেত করা। আপনার দলের কয়েকজন সদস্য আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী এই রোয়েদাদের বিরোধিতা করিত তাহা হইলে অন্য গোষ্ঠী ওয়ার্কিং কমিটিকে সমর্থন করিতে ছুটিত— এই ধরনের যুক্তিও চলে না। অন্যান্য লোকেরা কি করিত না করিত তাহা না ভাবিয়া আপনাদের ঠিক কাজ করা উচিত ছিল।

যাহা হউক, আমি এখন আপনাকে অনুরোধ করিব যে আপনারা বিষয়টিকে মৃত বলিয়া ধরিবেন না। তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নিশ্চিত ঘটনা নয় এবং যে সংবিধান ঐক্যের নীতির উপর নয়, বিভেদের নীতির ভিত্তিতে রচিত তাহা ভয়ংকর রকমের খারাপ। একটি জনপ্রিয় সংবিধানের জন্য আমাদের বিক্ষোভ যখন চালাইয়া যাইতে হইবে তখন একই সংগে সেই সংবিধানের জাতীয় ভিত্তির দাবি আমাদের অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।

মনোভাবের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক

আমি এখন আপনার চিঠির কেন্দ্রীয় প্রশ্নে আসিব। তাহা হইল এই যে উভয় গোষ্ঠীর সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কার্যকরী পরিষদের পুনর্গঠন সম্ভব নয়। আমার আশংকা যে এই পদক্ষেপের পিছনে যে উদ্দেশ্য তাহা আপনি অনুধাবন করেন নাই এবং তাহার ফলেই আপনার আপত্তি। যে দুর্ভাগ্যজনক বিরোধ এখনো চলিয়াছে তাহার ফলে বাংলাকে কোন্ অবস্থায় টানিয়া নামানো হইয়াছে তাহা কি আপনি উপলব্ধি করেন? খোলাখুলি আলোচনা প্রসংগে কিংবা বিস্মরণের মুহূর্তে অন্যেরা আপনাদের পিছনে আপনাদের সম্বন্ধে কী বলেন তাহা কি আপনি শুনিয়াছেন? দেশের অন্যান্য অংশের আপনাদের সহ-কংগ্রেস কর্মীদের চোখে আপনারা যে ঘৃণার বস্তু হইয়া

উঠিয়াছেন সে সম্বন্ধে আপনি কি সচেতন? আপনারা যেভাবে দেশবন্ধুর অমূল্য উত্তরাধিকারের অপব্যবহার করিয়াছেন সেজন্য আপনারা কি লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করেন? যদি সে অনুভব থাকে তাহা হইলে শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা কি আপনারা করিয়াছেন? অন্য দলকে দোষী করিয়া লাভ নাই। বিবাদের জন্য সর্বদাই দুই জনের প্রয়োজন হয়। আপনারা সংখ্যাগুরু বলিয়া আপনাদের দায়িত্ব বৃহত্তর এবং সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী বলিয়াই আপনাদের উদ্যোগী হইতে ও এইরূপ উদার মনোভাব দেখাইতে হইবে যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আপস হইতে পারে। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে অন্তত আপনাদের এই সন্তুষ্টিবোধ থাকিবে যে, একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসাবে আপনারা আপনাদের কর্তব্য করিয়াছেন এবং আপনারা বৃহত্তর জনসমাজের সম্মুখে যুক্তি দিয়া নিজেদের সমর্থন করিতে পারিবেন। ইহা ভুলিয়া যাইবেন না যে আজ সাধারণ মানুষের চোখে অন্য গোষ্ঠীর মতো আপনারাও সমান দোষী। আমাকে এ কথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে দিন যে যতদিন এই বিরোধ চলিবে এবং তাহার ফলে কংগ্রেসের উর্ধ্বতন পরিষদে বাংলাকে জাতিচ্যুত বলিয়া গণ্য করা হইবে, ততদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃত্ব শ্রীকিরণশঙ্কর রায় কিংবা শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্তের হাতে থাকুক— তাহাতে কিছু যায় আসে না। যে ন্যক্কারজনক মনোবৃত্তি গোটা ইতিহাস জুড়িয়া অভিশাপস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, বাংলাকে চিরদিনের মতো তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই মনোবৃত্তি হইল যে "দেশ উদ্ধার হয় তো আমার দ্বারা হোক, নয়তো হয়ে কাজ নেই"। দলের বর্তমান বিরোধের দরুনই আমি চাই যে আপনি নূতন পথে গিয়া আত্মবিলোপ ছাড়া সম্ভাব্য উদারতম মনোভাব দেখান। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী যদি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকে তাহা হইলে তাহার উদারভাবে কাজ করিতে কখনো ভীত হওয়া উচিত নয়। কোনো একজন ব্যক্তির কাছে যাঁহারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি বাঁধা না রাখেন, তাঁহারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশাধিকার পান না। আমি চাই না যে আপনারা ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রবেশাধিকার না পান। আমি চাই না যে আপনারা ওয়ার্কিং কমিটির অনুকরণ করুন। বরং আমি চাই যে আপনারা ওয়ার্কিং কমিটির অনুসরণ করুন। বরং আমি চাই যে আপনারা বাংলায় নূতন একটি সম্মিলিত দল গড়িয়া তুলুন— যাহাতে থাকিবেন আমাদের অতীতের

বিরোধ-নির্বিশেষে আমাদের সর্বোত্তম মানুষেরা। আমাদের যদি কোনো দেশপ্রেমবোধ থাকে তাহা হইলে আমাদের এই বিরোধকে কবর দিতে হইবে এবং বহু গভীরে কবর দিতে হইবে। আমি যে পথের কথা বলিয়াছি সে পথে আপনারা অন্য গোষ্ঠীর সর্বোত্তম মানুষদের সংঘবদ্ধ করার সুযোগ পাইবেন। আপনারা ধরিয়া নেন কেন যে আপনাদের সমস্ত সদস্য ন্যায়পন্থী এবং আপনাদের বিরোধীরা সকলেই অন্যায়কারী? এখন যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতেছে না সেই অবস্থায় আমার উপদেশ আরো বেশি গ্রহণীয় হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আপনাদের মনোভাবে অপর পক্ষের অনুকূল সাড়া না পাওয়া যায় তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা খারাপ যাহা ঘটিতে পারে তাহা হইল এই যে কার্যকরী পরিষদের মধ্যে সমান শক্তিশালী দুইটি গোষ্ঠী বিবাদ করিয়া চলিবে। যেহেতু এই বিবাদের মধ্যে কোনো নীতির বালাই নাই এবং ইহা মূলত ব্যক্তিগত—এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলির ফল আর যাহাই হউক জনজীবনের উপর সেগুলির কোনো গুরুত্ব দেখা দিবে না। আপনি যদি মনে করেন যে অন্য গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে আমার আশঙ্কা যে আপনাদের জনজীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা আছে। আর আপনারা এ কথা কেন ভুলিয়া যান যে যদি কার্যকরী পরিষদ কাজ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে হস্তক্ষেপ করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তো আছেই।

কেবলমাত্র রোগের লক্ষণ

অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে এবং কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিগুলি পুনর্গঠন প্রসঙ্গে অপর গোষ্ঠীর অনুদার ও অন্যায় মনোভাবের কথা আমাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি তো রোগের লক্ষণ মাত্র। আমি আপনাদিগকে রোগের মূল ধরিয়া টান দিতে বলিয়াছিলাম। আপনারা যদি তাহা করেন তবে লক্ষণগুলি অবলুপ্ত হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজ যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে জেলাগুলিতেও অধিকাংশ কাজ আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে। যেরূপ বলা হইয়া থাকে সেইভাবে যদি অন্য গোষ্ঠীতে এমন লোক থাকিয়া থাকেন যাঁহারা আপসবিরোধী ও যে-কোনো অবস্থায় শত্রুতা চালাইয়া যাইবেন তাহা হইলে আপনাদের কাজ হইবে তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা এবং

উদার নীতির দ্বারা তাঁহাদের বিরোধিতার অবসান ঘটানো। কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠন প্রসঙ্গে কয়েকজন বন্ধু অন্যান্য পদ্ধতিগত অসুবিধার কথা তুলিয়াছেন— কিন্তু এ-সব প্রশ্ন ওঠে একমাত্র এই কারণে যে ঐক্য সম্পাদনের ইচ্ছার অভাব রহিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কার্যকরী পরিষদ ভাঙিয়া দিবার পর এবং সকল সদস্যের সাধারণ পদত্যাগের পর কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারা যায়। কার্যকরী পরিষদের বর্তমান মুসলমান সদস্যেরা যদি উভয় গোষ্ঠীর কোনোটির অন্তর্ভুক্ত হন তাহা হইলে সেই গোষ্ঠীর ভাগ্যের উপর তাঁহাদের ভাগ্যও নির্ভর করিবে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি স্বাধীন সদস্য হন এবং তাঁহাদের বর্তমান প্রতিনিধিত্ব যদি ন্যায়সংগত হইয়া থাকে তাহা হইলে নূতন কার্যকরী পরিষদের সেই প্রতিনিধিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত হইবে। অন্য গোষ্ঠী যদি একমতাবলম্বী না হয়— যদি তাহার মধ্যে কয়েকটি উপদল থাকে তাহা হইলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে এই গোষ্ঠীগুলিকে নূতন কার্যকরী পরিষদে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া যাইতে পারে।

এই পত্রে আমি এ কথাও বলিতে চাই যে বর্তমান বিরোধগুলির জন্য মূলত দায়ী ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্রগুলির দ্বারা সমর্থিত কলিকাতার কংগ্রেস কর্মীরা এবং এ-বিষয়ে মফস্বলের সদস্যদের কোনো দোষ ছিল না পূর্বে আমার এইরূপ একটা ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু এখন আমার অভিমত এই যে মফস্বলের সদস্যদেরও দলীয় কোন্দলে ইন্ধন জোগানোর কাজে একটা ভূমিকা আছে এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে সকল দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া যায় না।

জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মনোভাব

আমার মুসলমান বন্ধু ও সহকর্মীদের আমি বলিতে চাই যে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতি আমার বিরোধিতা আমার সাধারণ মনোভাবের কোনো পরিবর্তন সূচিত করে না; বরং তাঁহারা পূর্বে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী সম্বন্ধে যে নিন্দাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার স্থলে বর্তমানে যে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের মনোভাব দেখাইতেছেন তাহা এ কথাই প্রমাণ করে যে তাঁহারা মৌলিকভাবে মত পরিবর্তন করিয়াছেন। ডাঃ আনসারি ও জাতীয়বাদী মুসলমানগণকে খুশি করার জন্য যে এ-বিষয়ে কংগ্রেস-নীতি

নির্ধারিত হইয়াছে— এই গোপন তথ্য এখন সর্বজনবিদিত। যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এ পর্যন্ত একভাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এখন এই রোয়েদাদের মুখে কিভাবে সেই বিরোধিতা ত্যাগ করিবেন তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁহাদের পূর্বের মনোভাব কি কৃত্রিম ছিল? কিংবা তাঁহারা কি সম্প্রতি মৌলিকভাবে মত পরিবর্তন করিয়াছেন? এই দুইটির যেটিই সত্য হউক, সে-ক্ষেত্রে আমাদের চিরন্তন জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নূতন সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করার জন্য আমাদিগকে দোষী করা যাইতে পারে না।

ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস দলের প্রয়োজন

আপনার চিঠিতে আপনি কর্পোরেশনের কার্যাবলীর গুরুত্ব ছোটো করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্দেহ এই যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান সংকটের অধিকাংশের জন্য দায়ী হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা কর্পোরেশনে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে চান। দেশবন্ধুর তিরোধানের পর হইতে এই ব্যক্তিদের জন্যই কর্পোরেশনে কংগ্রেস দল নিজের অস্তিত্ব যে যুক্তিসংগত তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই এবং এই ব্যক্তিরাই কর্পোরেশন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি— উভয়ত্র বর্তমান বিবাদ-বিসংবাদ জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং কংগ্রেসের বৃহত্তর স্বার্থে এখন হইতে এ ঘোষণা করা অত্যাবশ্যক যে বাংলায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের উদ্ভব না হইলে ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কর্পোরেশনের পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের কিছু করার থাকিবে না। যুগার্জিত ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালে ঐক্যবদ্ধ দল হিসাবে কংগ্রেস কর্পোরেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। বর্তমানে সে যদি তাহা না করিতে পারে, তাহা হইলে ইতিমধ্যে আহমেদাবাদ, এলাহাবাদ ও পাটনায় যেরূপ হইয়াছে সেইভাবে কংগ্রেসের উচিত গোটা বিষয়টি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ানো।

উপসংহারে আমি যে কথা পূর্বে বলিয়াছি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে চাই যে অবিলম্বে বাংলায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস দল গঠিত হওয়া উচিত এবং এই লক্ষ্য সম্পাদনের জন্য যে-কোনো স্বার্থত্যাগ করা উচিত। আমি যদি আমার দেশবাসীদের ঠিকভাবে চিনিয়া থাকি তাহা হইলে যে-সব

ব্যক্তি হৃদয়ের বিশালত্ব লইয়া এই কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং বর্তমান বিরোধ স্থায়ী করার কুপ্রয়াসের অবসান ঘটাইবেন তাঁহাদিগকে তাঁহারা অভ্যর্থনা জানাইবেন। আর নিজের সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে শৃঙ্খলা-বদ্ধ পদ্ধতিতে কাজ করিতে ইচ্ছুক ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস দল যদি আমি না পাই তাহা হইলে দেশে ফিরিবার পর আমি বাংলায় কংগ্রেস রাজনীতিতে আর যোগ দিব না— এই আমার সিদ্ধান্ত।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস -কর্তৃক প্রচারিত।

বিশ্বের জাতিসমূহের মিলন-কেন্দ্র

জেনেভা সম্পর্কে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর নিকট ব্যক্ত মতামত।

আন্তর্জাতিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে যাঁহার আগ্রহ আছে তাঁহার নিকট জেনেভা অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক কোনো স্থান নাই। জেনেভায় যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া আছে তাহার জন্য চিরাচরিত সুইস নিরপেক্ষতা ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী লীগ অফ নেশনস্ বা জাতিসংঘের উপস্থিতি। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সকল সংগঠনের জেনেভা-মুখীনতা লক্ষণীয়, যেখানে তাহারা শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দপ্তর খোলে। সেখানকার সকল সংস্থাগুলির বিবরণ দেওয়া অসম্ভব— তবে আমি মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিব।

ধর্মীয় ও দার্শনিক বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ তাঁহারা থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও বাহাই সমিতির মতো সংগঠনগুলি দেখিয়া আনন্দিত হইবেন। সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়াও থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক বসে। বাহাই সমিতিতেও সাপ্তাহিক বক্তৃতা হয় এবং তাহার পর বিনা মূল্যে চা-জলপানাদি দেওয়া হয়। এইরকম সব অনুষ্ঠানে প্রাচ্যবাসীদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানো হয়। ১৯৩৩ সালে জেনেভাতে থাকার সময় আমার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে একাধিকবার বক্তৃতা করার সুযোগ হইয়াছিল। এমন-কি সুফীদেরও একটি ছোটো গোষ্ঠী সেখানে আছেন এবং একটি চমৎকার রুশীয় গির্জা আছে। একমাত্র হিন্দুদেরই সেখানে কোনো কেন্দ্র নাই।

বাহাই আন্দোলনের মূল কর্মকেন্দ্র হইল প্যালেস্টাইনের হাইফাতে; কিন্তু সম্প্রতি এই আন্দোলনের জন্মস্থান পারস্যেও বাহাইদিগকে কাজ করার অনুমতি পারস্য সরকার দিয়াছেন।

নারীদের আন্তর্জাতিক লীগ

শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারীদের আন্তর্জাতিক লীগ সামাজিক সংগঠন-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই সংগঠনটির আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী এবং ১৯৩৩ সালে মার্কিন অর্থে ইহার যাত্রারম্ভ হয়— সদাশয়া দাত্রী হইলেন পরলোকগতা জেন অ্যাডামস্ নাম্নী একজন আমেরিকান মহিলা। মাদাম দ্রেভে (Madame Drevet) নামে একজন ফরাসী মহিলা ইহার সেক্রেটারি ছিলেন। নারীদের লীগ মূলত সারা পৃথিবীর নারীদের অধিকার লইয়া এবং সাধারণভাবে মানবিক অধিকার ও বিশ্বশান্তির জন্যও সংগ্রাম করে। একটি আবাসভবন লীগের ব্যুরোর সংগে সংযুক্ত আছে এবং তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানের নারীরা বাস করেন। ১৯৩৩ সালে সেখানে একজন বহুগুণসম্পন্না ভারতীয় মহিলা ছিলেন। তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এই ধরনের একটি সংগঠন পৃথিবীর যে-কোনো অংশের নারীদের যে-কোনো সমস্যা কিংবা অভিযোগ লইয়া কাজ করে; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিভাবে এই সংগঠনটিকে কাজে লাগাইতে হয় তাহা আমরা জানি না। নারীদের লীগ, লীগ অফ নেশন্সের মাধ্যমে এবং তাহার সহযোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। লীগ অফ নেশন্সের দপ্তর ইহাকে যুগপৎ ভয় ও সমীহ করে এবং নারী-সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে ইহার সহযোগিতা গ্রহণ করে। কোনো শিক্ষিতা ও জনজীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্না ভারতীয় মহিলা যদি নারীদের লীগে যোগ দেন তাহা হইলে তিনি ভারতের প্রভূত সেবা করিতে পারেন।

অহিফেন-বিরোধী ব্যুরো

অহিফেন-বিরোধী তথ্য ব্যুরো আর-একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন; ইহার পরিচালক একজন স্পেনীয় ভদ্রলোক, নাম মিঃ এ. ই. ব্ল্যাংকো (Mr. A. E. Blanco)। মিঃ ব্ল্যাংকো জীবনের প্রথম হইতে অহিফেন সেবনের কুফল ও মাদক ভেষজের বিশ্ব-সমস্যা এবং কিভাবে ইহার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব— সে-

বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এই বিষয়টি জানিবার জন্য বহু বৎসর চীনে কাটাইয়াছিলেন। পরে তিনি তাহার প্রিয় বিষয়টি সম্বন্ধে সেবার সুযোগ পাইবার আশায় লীগ অফ নেশনসের অহিফেন-বিরোধী শাখায় যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হতাশ হইয়া বিরক্তি সহকারে লীগ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং আমেরিকার আর্থিক আনুকূল্যে জেনেভায় অহিফেন-বিরোধী তথ্য ব্যুরো নামে একটি বেসরকারী ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জনগণের অবগতির জন্য ব্যুরো অহিফেন ও মাদক ভেষজ সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। লীগ যাহাতে নিষ্ক্রিয় না হইয়া পড়ে ব্যুরো সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং লীগ অফ নেশনসের অহিফেন-বিরোধী কার্য-কলাপের সহিত গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে। আমি যখন বিগত মার্চ মাসে লীগের কেন্দ্রীয় অহিফেন বোর্ডের সভায় যোগ দিয়াছিলাম তখন দর্শক গ্যালারির প্রথম সারিতে মিঃ ব্ল্যাংকোকে দেখিয়াছিলাম। আমি ভারতের ক্ষেত্রে অহিফেনের কুফল সম্বন্ধে মিঃ ব্ল্যাংকোর সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বহুবার গভীরতম অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে কোনো ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই বিষয়টি গ্রহণ করেন নাই।

দণ্ডবিধি সংস্কার

দণ্ডবিধির সংস্কারের জন্য হাওয়ার্ড লীগ নামক অন্য একটি উপযোগী সংস্থার কথা উল্লেখ করিতে আমার ভুল হওয়া উচিত নয়। এই সংস্থার কাজ হইল সারা পৃথিবীর বন্দীদের প্রতি অসদাচরণ সম্পর্কিত। ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র লণ্ডনে অবস্থিত। আমি ১৯৩৩ সালে জেনেভায় এই সংস্থার সেক্রেটারি একজন প্রবীণা ও সহানুভূতি-সম্পন্না মহিলার সহিত দেখা করিয়াছিলাম এবং ভারত ও আন্দামানের কারাগারগুলিকে ও বিনা বিচারে আটক বন্দীশিবিরে আমাদের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যে আচরণ করা হয় সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে লণ্ডনে কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি পেশ করার পূর্বে তাঁহার আরো বেশি বিশ্বাসজনক প্রমাণাদি প্রয়োজন। তিনি যে-ধরনের "প্রমাণ" চান তাহা সংগ্রহ করার অসুবিধার কথা আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আলোচনার পরে পরেই আমি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের বন্দীদের সম্বন্ধে

পূর্ণতর তথ্যাদি চাহিয়া ভারতে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু কোনো উত্তর না পাওয়ায় দুঃখিত হইয়াছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে ভারতে বন্দীদের বিষয় সম্পর্কিত একটি সংগঠন থাকা অত্যাবশ্যক। এই ধরনের সংগঠন দণ্ড-বিধি সংস্কারের জন্য হাওয়ার্ড লীগের মতো সংস্থাকে যথোচিতভাবে কাজে লাগাইতে পারে। ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যান্ডে মানবিক অধিকারের লীগ নামে একটি করিয়া সংস্থা আছে। এই সংস্থা রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অসদাচরণ সহ সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার সংকোচন লইয়া কাজ করে। এই সংস্থাটিকেও আমরা কাজে লাগাইতে পারি। আমি সম্প্রতি জেনেভায় মানবিক অধিকার লীগকে ফরাসী মানবিক অধিকার লীগের সহযোগিতায় শ্রী এম. এন. রায় সম্পর্কিত বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

শিক্ষা-ব্যুরো

শিক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যুরো আর-একটি চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সারা পৃথিবীর শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাম্প্রতিকতম সংবাদ সংগ্রহ করে। ইহা বহু দেশের এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের অনুদানে চলে। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানের সুবিধা এই যে পৃথিবীর সকল অংশের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্যোগের পূর্ণতম এবং সাম্প্রতিকতম সংবাদ আপনি একটিমাত্র সূত্র হইতে পাইতে পারেন। যে-সব দেশের, যেমন দক্ষিণ-আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রের, এরূপ অনুভূতি আছে যে তাহারা শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ, সেই-সব দেশ এই সংস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে।

জেনেভার কয়েকটি রাজনৈতিক ও অর্ধ-রাজনৈতিক সংগঠনের উল্লেখ না করিলে এই ক্ষুদ্র বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমি আমার আগের একটি চিঠিতে ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে সেখানে চীনাদের একটি বড়ো কেন্দ্র আছে। ইহা অংশত চীন সরকারের এবং অংশত বেসরকারী ব্যক্তিদের সহায়তায় চলে। ইয়োরোপস্থিত চীনা দূতাবাস ও বাণিজ্য সংস্থাগুলি (কনস্যুলেট) রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করে বলিয়া জেনেভায় এই সংগঠন একমাত্র সাংস্কৃতিক প্রচারে নিজেকে সীমিত করিয়া রাখে। গুরুত্বের দিক হইতে পরবর্তী সংগঠন হইল সিরীয় নেতা আমির চেকিব আস্‌লান ও মন-জারির। জেনেভায় ইঁহাদের একটি কেন্দ্র আছে। ইঁহারাও সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী

দলের দাবিগুলি প্রচারের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিরিয়ার এই-সব জাতীয় বীরের সহিত সাক্ষাৎ খুব আনন্দদায়ক ও উৎসাহদায়ক হইয়াছিল। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম যে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের চমৎকার উপলব্ধি আছে। এসিয়াবাসীরা ছাড়া, জেনেভায় ইয়োরোপীয় কয়েকটি দলেরও কেন্দ্র আছে। উদাহরণস্বরূপ ক্রোটদের কথা বলা যায়। ইঁহারা স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য কেন্দ্রীভূত ও একনায়কত্ব-প্রধান যুগোশ্লাভ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন এবং সেখানে ইঁহাদেরও একটি কেন্দ্র আছে।

পি-ই-এন ক্লাব

আমাদের লেখক লেখিকা ও সম্পাদকগণ ব্যবহার করিতে পারেন এরূপ অপর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হইল পি (পোয়েট বা কবি), ই (এডিটর বা সম্পাদক), এন (নভেলিস্ট বা ঔপন্যাসিক) ক্লাব। ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র লন্ডনে ও মিঃ এইচ. জি. ওয়েল্স ইহার সভাপতি। ইহা লেখক-লেখিকাদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশে পালা করিয়া প্রতি বৎসর ইহার কংগ্রেস বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে ভারতে পি-ই-এন ক্লাবের একটি শাখা আছে— তবে ইহা কাজ করে বলিয়া মনে হয় না। পি-ই-এন ক্লাবের ভারতীয় শাখার উচিত প্রতি বৎসর পি-ই-এন কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করা। ইয়োরোপে বহু যোগ্য ভারতীয় আছেন তাঁহারা সহজে ও সানন্দে এ দায়িত্ব লইতে পারেন এবং এইভাবে আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করাইতে পারেন। সম্প্রতি অপর একটি আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেস সংগঠিত হইয়াছে এবং ইহার সমর্থকদের মধ্যে আছেন মঁসিয়ে রোমাঁ রোলাঁ, আঁদ্রে জিদ, আঁরি বারবুস (ফ্রান্স), টমাস মান, হাইনরিখ্ মান (জার্মানী), কার্ল কাপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া), ম্যাক্সিম গোর্কি, শোলোকভ (রাশিয়া), ভেল টুকল্যান (স্পেন), জন ডস প্যাসোস (আমেরিকা) প্রমুখ বামপন্থী লেখকগণ। পুরাতন সংস্থাটি অপেক্ষা এই নূতন সংস্থাটির সহিত যুক্ত হওয়া ভারতীয় লেখকদের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। যাহা হউক, আমাদের লেখকদের পক্ষে কোনো-না কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার অন্তর্ভুক্তি অত্যাবশ্যক।

গত যুদ্ধের সময় হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র ইয়োরোপে এবং

বিশেষভাবে জার্মানীতে স্নাতকোত্তর বিদ্যার্জন ও কলকারখানায় হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য আসিতেছেন। যেখানে ব্রিটিশ কারখানাগুলি ভারতীয় শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে নানারূপ আপত্তি তুলিতেছে সেখানে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত জার্মান কারখানাগুলি তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছে। তদনুসারে ১৯২৩ সাল হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় জার্মান-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও কারখানায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং তাহারা জার্মানীকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, জার্মানীতে নূতন শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব ভারতীয় ছাত্রদের কাছে ধীরে ধীরে অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। আমি যখন প্রথম ১৯৩৩ সালে জার্মানী পরিদর্শনে গিয়াছিলাম তখন আমার কাছে এইরূপ অভিযোগ আসিয়াছিল যে ভারতীয়দের পক্ষে জার্মান কারখানায় প্রবেশ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সময়ের গতির সংগে এই-সব অভিযোগ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ দিতেছি।

ভারতীয়দের পক্ষে বন্ধ কারখানা

একজন ভারতীয় ছাত্র— যিনি একটি জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভেষজ রসায়ন শাস্ত্রকে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে লইয়া ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন— হাতে-কলমে কাজ শিখিবার জন্য জার্মান কারখানায় প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। অপর একজন ছাত্র যিনি শিল্পকেন্দ্রিক রসায়নে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট করিয়াছেন তিনি কয়লার আলকাতরা-পাতন শিক্ষার জন্য জার্মান কারখানায় প্রবেশের সুযোগ পাইতে অসমর্থ। অপর একটি প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র যিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠক্রম সমাপ্ত করিতে চলিয়াছেন তাঁহাকে সিমেন্স অ্যান্ড হানস্কে সহ সব বড়ো কারখানা হাতে-কলমে কাজ শিখাইতে অস্বীকার করিয়াছে। আর-একটি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র যিনি সুতিকলে প্রশিক্ষণ লইতে চান, তিনি সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হইয়া শেষ পর্যন্ত লজে একটি পোলিশ সুতিকলে ঢুকিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আমরা উপরোক্ত শোচনীয় অবস্থা জোড় হস্তে মানিয়া লইব, না ইহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিব— তাহা আমি ভারতের জননেতাদের এবং শিল্প-নেতাদের কাছে জানিতে চাই। এইরূপ অবস্থায় অন্যান্য দেশ কী করিতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজের অভিমত দিতেছি।

প্রথমেই আমি বলা আবশ্যক মনে করি যে বর্তমান মুহূর্তে নিজেদের ইচ্ছানুসারে শিক্ষানবিশ হিসাবে বিদেশী ছাত্রদের লইবার স্বাধীনতা জার্মান কারখানাগুলির নাই। এরূপ প্রতিটি বিষয় সিদ্ধান্তের জন্য জার্মান সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি বোর্ডের কাছে পাঠাইতে হয়; ডঃ শাখ্‌ট এই বোর্ডের সভাপতি।

তুরস্ক, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশ যখন বিদেশী সংস্থাগুলির কাছে বহু পরিমাণে মাল সরবরাহের নির্দেশ দেয় তখন তাহারা শর্ত করিয়া লয় যে ঐ-সব কারখানায় তাহাদের দেশের কিছু সংখ্যক লোককে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। জার্মানী সহ সকল দেশের সংস্থাগুলি অপরিহার্যরূপেই এ শর্ত মানিয়া লয়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যে বিদেশ হইতে প্রভূত মাল ক্রয় করে অথচ এরূপ কোনো শর্ত আরোপ করে না। ওই অবস্থার জন্য যেমন ভারত সরকার তেমনই ভারতীয় নেতৃবৃন্দও দায়ী।

প্রতিকারের বিধান

এখন প্রশ্ন হইল, ইহার প্রতিকার কি? কার্যে রূপায়িত করা যায় এরূপ কয়েকটি বিকল্প প্রতিকারের কথা আমি বলিতেছি। প্রথমত, ভারতীয় আইন-সভার সদস্যগণকে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাইতে হইবে যে ভারত সরকার যে-সব দেশ হইতে বহুল পরিমাণে পণ্য ক্রয় করেন সেই-সব দেশ যাহাতে ভারতীয় ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ শিক্ষার সুযোগ দেয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয় কিংবা ভারত সরকার যদি অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ উদ্দেশ্যে ভারতীয় বণিক সভাকে এইরূপ সকল দেশের বণিক সভাগুলির কাছে সরাসরি আবেদন জানাইতে হইবে। এই পদক্ষেপ যদি না গ্রহণ করা হয় কিংবা ইহা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে এইরূপ সব দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নিজস্ব প্রতিনিধি (কিংবা প্রতিনিধিগণ) মারফত প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। এ-পদক্ষেপও যদি না লওয়া হয় কিংবা ইহা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে যে-সব ভারতীয় শিল্পপতি বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করেন তাঁহাদিগকে বিদেশী ব্যবসায়ী সংস্থার কাছে পণ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দানের সময় এমন সব শর্ত করিয়া লইতে হইবে যাহাতে কিছু সংখ্যক ভারতীয় এই-সব কারখানায় প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পান।

সর্বাপেক্ষা বেশি কার্যকর উপায় হইল ভারত সরকারের সক্রিয় হওয়া। কিন্তু তাঁহারা কি সক্রিয় হইবেন? আমাদের আইনসভার সদস্যারা চেষ্টা করিয়া দেখুন। তাঁহারা যদি ব্যর্থ হন তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে এই-সব ইয়োরোপীয় দেশে বণিক সভা সরকারের উপর এবং শিল্পের উপরও বিরাট প্রভাবের অধিকারী। ভারতীয় বণিক সভা যদি প্রকৃত পদ্ধতিতে অন্য একটি দেশের বণিক সভার কাছে আর্জি পেশ করে তাহা হইলে এই শেষোক্ত সংস্থা, সহানুভূতির ফলে না হউক ভারতের সহিত তাহার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এই ভয়ে, অন্তত সাড়া দিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং আইনসভার গৃহীত ব্যবস্থা ব্যর্থ হইলে ভারতীয় বণিক সভার উচিত প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়া।

কংগ্রেস কী করিতে পারে

এ-বিষয়ে তৃতীয় বিকল্প ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রসর হইয়া আসা। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে বহু দেশে কংগ্রেসের বিরাট মর্যাদা আছে এবং জনগণের এ উপলব্ধি আছে যে এই সংগঠন ভবিষ্যৎ ভারত সরকারের প্রতীক। সেইজন্য কংগ্রেস যদি আবেদন জানায়, তবে অনেক দেশে অনুকূল সাড়া জাগিতে বাধ্য, কেননা তাহারা জানে যে কোনো দেশে ভারতীয়-দের প্রতি যথোচিত আচরণ না করা হইলে সেই দেশ হইতে আগত পণ্যাদি বয়কট করার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে।

সব শেষে, ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিরা যখন কোনো দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন তখন তাহারা এই দাবি করিতে পারেন যে সে দেশের কারখানা-গুলিতে কিছু-সংখ্যক ভারতীয় ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে। আমি কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে জানি যাঁহারা কতিপয় শিল্পপতির দেশপ্রেম-সঞ্জাত অনুরূপ দৃঢ় দাবির ফলে ইয়োরোপের কারখানায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। আমি এমন কিছু সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় শিল্পপতির কথাও জানি তাঁহারা এইভাবে ভারতীয় ছাত্রদের সহায়তা করিবার সুযোগ থাকা সত্বেও তাহা করিতে সম্মত হন নাই। আর এই শিল্পপতিরাই যখন পণ্য উৎপাদন করেন তখন তাঁহারা দাবি করেন যে দেশপ্রেমের স্বার্থে আমরা যেন তাহা ক্রয় করি।

উপরোক্ত চারটি প্রতিকার বিধানই একযোগে চেষ্টা করিয়া দেখা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। জার্মানীতে হাতে-কলমে কাজ শিখিতে আগ্রহী ভারতীয়

ছাত্রদের অবস্থা দিনের পর দিন আরো কঠিন হইয়া উঠিতেছে এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অন্যান্য দেশের সুযোগ

১৯৩৩ সালে জার্মানীতে এই আসন্ন বিপদের কথা অনুধাবন করার পর হইতেই আমি অন্যান্য দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া চলিয়াছি যাহাতে জার্মানী শেষ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষানবিশদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেও তাহারা যেন বিপন্ন না হইয়া পড়েন। আমি সানন্দে এ-কথা জানাই যে অন্যান্য দেশে ভারতীয়দের জন্য সুযোগ বর্তমান এবং আমরা যদি নিশ্চিত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করি তাহা হইলে এই সুযোগ আরো বাড়ানো যায়। স্কোডার মতো চেকোশ্লোভাক সংস্থাগুলি সানন্দে ভারতীয় শিক্ষানবিশ গ্রহণ করিবে। ম্যারেল্লি অ্যান্ড পিরেল্লির মতো ইটালীয় সংস্থাগুলিতে অনুরূপ সুযোগ আছে। পোল্যান্ডের লোজ-স্থিত কাপড়ের কলগুলির সহায়তাও পাওয়া যাইবে। অবশ্য এ কথা না বলিলেও চলে যে এই-সব দেশ আমাদের যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ দিলে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতাও তাহাদের দিকে প্রসারিত করিতে হইবে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি

এ-কথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইবে যে ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদের কেবল মূলধন ও রাষ্ট্রীয় সহায়তার প্রয়োজন নয়— প্রযুক্তিবিদ্ বিশেষজ্ঞও চাই। আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বিনা বাধায় মূলধন, শ্রমিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণে বহু সময় লাগে। ১৯১৭ সাল হইতে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে আমরা যদি অসহায়ের মতো বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছে আত্মসমর্পণ এড়াইতে চাই তাহা হইলে আজ হইতেই আমাদিগকে এই সমস্যাটির প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হইবে। দিল্লীতে যখন ভারত-জাপান বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা চলিতেছিল তখন জাপান-কর্তৃক আমাদের কাঁচা তুলা ক্রয়ের একটি শর্ত ছিল; কিন্তু জাপানী সুতিকলগুলিতে আমাদের শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে একটি কথাও শোনা যায় নাই।

ইহা হইতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির কথা উঠে। ভারত-জাপান চুক্তির পথ অনুসরণ করিয়া জার্মানী, ইটালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সংগে আমাদের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার সময় আসিয়াছে। আমাদের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও যথোচিত বাণিজ্যিক ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য এই ধরনের চুক্তি অত্যাবশ্যক। জার্মানীর মতো দেশ ভারত হইতে যত জিনিস না কিনে তত জিনিস ভারতে বিক্রয় করিবে কেন? পক্ষান্তরে চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো দেশ আমাদের নিকট হইতে যত পণ্য ক্রয় করে সে তুলনায় আমরা তাহার নিকট হইতে কম পণ্য কিনিব কেন?

বিভিন্ন দেশের সংগে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন ছাড়াও আমাদের ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রয়োজন অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন। অন্যান্য দেশে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিশ্র সংগঠন ও মিশ্র বণিকসভা স্থাপন করা হয়। ধরুন আমরা যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাই তাহা হইলে ভারতে আমাদের একটি ভারত-চেকোশ্লোভাক সমিতি ও ভারত-চেকোশ্লোভাক বণিক সভা স্থাপন করা উচিত। অন্যান্য যে-সব দেশ সম্বন্ধে আমরা আগ্রহী তাহাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংগঠন থাকা উচিত। এই পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে প্রাগ, ভিয়েনা ও রোমে সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই-সব দেশের সহিত সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অনুরূপ সংগঠন ভারতে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন এবং ভারতে ও ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে মিশ্র বণিকসভা থাকা উচিত।

২৪ আগস্ট ১৯৩৩

ভি. জে. প্যাটেল ও উইল

কার্লসবাদ হইতে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বরের নিকট প্রেরিত ভি. জে. প্যাটেলের উইল প্রসঙ্গে বিবৃতি।

পরলোকগত শ্রী ভি. জে. প্যাটেলের উইল সম্বন্ধে আমি এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রচার হইতে বিরত রহিয়াছি। যাহা হউক, এ-বিষয়ে আগ্রহী বন্ধুদের সংগে আমি অবশ্য পত্রে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছি। তাঁহাদের কয়েকজন দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে আমি তাঁহাদের যাহা জানাইয়াছি তাহা এখন

সাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত যাহাতে এ-বিষয়ে সমান আগ্রহী বৃহত্তর পরিধির মানুষেরা ইহা জানিতে পারেন।

সম্মানিত উইলকারকের উইলের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ :

"উল্লিখিত চারটি দানের ব্যবস্থা করিবার পর আমার সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ হস্তান্তরিত হইবে (জানকীনাথ বসুর পুত্র) কলিকাতার ১, উডবার্ন পার্ক নিবাসী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে এবং ভারতের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও বিশেষ করিয়া অন্যান্য দেশে ভারত সম্পর্কিত প্রচারের জন্য। উক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক কিংবা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি কিংবা মনোনীত ব্যক্তিগণ কর্তৃক এই অর্থ ব্যয়িত হইবে।"

একটি পবিত্র ন্যাস

লোকান্তরিত সেই মহান পুরুষের কাছে যে কারণ সর্বাধিক জ্ঞাত সেই কারণে, হয়তো সাধারণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা সমমতাবলম্বী হওয়ায় এবং আমার উপর তাঁহার অধিকতর আস্থা থাকার দরুন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমার উপর এই মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সেই দায়িত্ব আমার কাছে পবিত্র ন্যাস বিশেষ এবং আমি সে দায়িত্ব পালনের জন্য আমার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

আমি ইতিপূর্বে যে-সব বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ করিয়াছি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি যে উইল অনুসারে আমার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া আমি কাজের পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয়—উভয় বিষয়েই জনসাধারণকে পরিপূর্ণরূপে অবহিত রাখিব। জনসাধারণের সেবক হিসাবে আমার কর্তব্য ছাড়াও আমি কেন এরূপ করিব সে সম্বন্ধে একটি অতিরিক্ত কারণ আছে। আমাদের যদি ধারাবদ্ধ রীতিতে ও কার্যকর পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয় তাহা হইলে পরলোকগত নেতা যে অর্থ উইলে দিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রতুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সুতরাং অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। পরলোকগত শ্রী ভি. জে. প্যাটেলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তিনি দেশে ফিরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং তাঁহার অবর্তমানে আমাকে তাহা করিতে হইবে। ইহা না বলিলেও চলে যে জনসাধারণকে পরিপূর্ণরূপে অবহিত না রাখিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা যায় না।

আমার আরো বলা উচিত যে এই উত্তরাধিকারের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে যে-সব বন্ধু তাঁহার কর্মপরিকল্পনায় ও নীতিতে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস

করিতেন তাঁহাদের সহায়তা ও পরামর্শ লইবার ইচ্ছা আমার আছে। এই পর্যায়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে কঠিন তবে আমি বলিতে পারি যে আমি শ্রী কে. এফ. নরিম্যান, শ্রী এস. এ. ব্রেলভি, শ্রী আর. ভবন, শ্রীদীপনারায়ণ সিং প্রমুখ বন্ধুদের সহায়তা চাহিবার ইচ্ছা রাখি। আমার উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে তাহা পালন করার ব্যাপারে আমি সম্মানিত দাতার অভিপ্রায় ও ধ্যানধারণাকে এবং আইনের বিধান নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলিব। তাঁহার অন্যতম অভিপ্রায় ছিল আইনের সীমার মধ্যে থাকিয়া কাজ করা।

উইলের শর্তগুলি হইতে ইহা পরিষ্কার যে আমাকে একমাত্র অছি নিযুক্ত করা হইয়াছে। উইলের ব্যবস্থা অনুসারে ও আইনের প্রয়োজন অনুসারে আমি দায়িত্বপূর্ণ ও বৈধ পদ্ধতিতে কাজ করিতে প্রস্তুত; কিন্তু পরলোকগত নেতার প্রতি আনুগত্যবশত আমি সম্ভবত একমাত্র অছি হিসাবে আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করিতে পারি না।

২৭ আগস্ট ১৯৩৫

ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে

ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি আবেদন।

"১৮১৮ সালের ১১১ নং নিয়ন্ত্রণবিধির ব্যবস্থা অনুসারে আমি ভারতের ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে বিনা বিচারে বন্দী হইয়াছিলাম এবং ১৯৩৩ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্দী ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে যদিও আমি পুনঃপুনঃ জানিতে চাহিয়াছিলাম কেন আমাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তবু সরকার হইতে সে-বিষয়ে আমাকে কিছুই জানানো হয় নাই। যখন আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং যখন সরকারী চিকিৎসকগণ ও সরকার-কর্তৃক নিয়োজিত চিকিৎসা-বোর্ড পুনঃপুনঃ সুপারিশ করিয়াছিলেন যে আমাকে চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত, তখন আমাকে সে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে কেন বন্দী করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নাই।

কয়েকদিন আগে ইংলন্ড হইতে আগত কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে সেখানে আমার বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রচার চালানো হইয়াছিল যে আমি ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সন্ত্রাসবাদীগণ ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের দমন করার জন্য বাংলা সরকারের হাতে এত ব্যাপক ও বহুদূরগামী শক্তি আছে যে যদি এইরূপ অভিযোগের পিছনে সামান্যতম ভিত্তি থাকিত তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে বাংলা সরকার বহু পূর্বে আদালতের সম্মুখে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন, বিশেষ করিয়া আমি যেখানে পুনঃপুনঃ দাবি তুলিয়াছিলাম যে আমাকে হয় বিচারের জন্য পাঠানো হউক, নয় মুক্তি দেওয়া হউক। সন্ত্রাসবাদের সমস্যা সম্বন্ধে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিষ্কার ব্যাখ্যা আছে আমার বই 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এ (উইশার্ট)। আমি এখন আপনাদেরই জিজ্ঞাসা করি যে যখন আপনাদের হাতে অভিযুক্ত করার মতো কল্পনাযোগ্য ব্যাপকতম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে আপনারা অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাকে কেন স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, এমন-কি, গোপনে তাহা যাঁহাকে জানাইতে আপনারা সম্মত হন নাই, তাঁহার বিরুদ্ধে এই দুর্নাম প্রচার ন্যায়সংগত কিনা তাহা আপনারাই বলুন।

১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমার ইয়োরোপ-যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে যখন আমাকে পাসপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল তখন আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করিয়াছিলাম যে আমাকে ইংলন্ডে ও জার্মানীতে যাইতে দেওয়া হইবে না— এই মর্মে নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল। একই সঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক আমাকে জানানো হইয়াছিল যে আমি যদি পাসপোর্টের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করিতে চাই তাহা হইলে ইয়োরোপে থাকাকালে আমি যেন ভারতসচিবের কাছে আবেদন করি। ১৯৩৩ সালে ইয়োরোপে আসার পর আমি ইংলন্ড ও জার্মানী পরিদর্শনের অনুমতি চাহিয়া ভারত-সচিবের কাছে আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে একমাত্র জার্মানী পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে আমি একজন ব্রিটিশ প্রজা ও কেম্ব্রিজের একজন স্নাতক হইলেও আমি ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে পারি কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে যাইতে পারি না।

ভারতে আমার এই 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'-এর প্রচার নিষিদ্ধ করার মধ্যেও অনুরূপ একটি অন্যায় নিহিত আছে, কেননা এই বইটি একজন

ব্রিটিশ প্রকাশক -কর্তৃক প্রকাশিত ও গ্রেট ব্রিটেনে ইহার প্রচার অনুমোদিত। তাহা হইলে ইংরাজী আইনের কি ব্রিটেনে একটি ব্যাখ্যা ও ভারতে অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রযোজ্য ?

১৯২১ ও ১৯৩১ সালের মধ্যে আমি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু আমার সমস্ত কাজ ছিল উন্মুক্ত ও সন্দেহাতীত। এই সময়সীমার মধ্যে আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতার মেয়রের মতো সব গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। এমন-কি আজও আমি বংগীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

আমি বিশ্বাস করি যে ইংলন্ডে, সংখ্যায় যতই কম হউক, এমন মানুষ এখনো আছেন যাঁহারা ন্যায় ও নীতির ধারক এবং উপরের বিষয়টি সম্বন্ধে আমি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।"

লণ্ডন। ৩১ আগস্ট ১৯৩৫

ইটালী-আবিসিনীয় যুদ্ধ

ইটালী-আবিসিনীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপরিস্থিতি যে-রূপ লইতেছে সে সম্বন্ধে অস্ট্রিয়া হইতে ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রেরিত মন্তব্য।

আবিসিনিয়ার সমর্থনে সর্বত্র এমন সহানুভূতির ঢেউ উঠিয়াছিল যে, প্রথমে হয়তো একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া অন্যত্র খুব কম লোকই গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধবাজ দলের প্রকৃত মতলব যে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী ছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। যে জাতিসংঘকে (লীগ অফ নেশনস্) ইটালী অবজ্ঞা করিতেছিল তাহার প্রতি ব্রিটেনের নবোদিত প্রেম সম্বন্ধে ফ্রান্স ছিল সন্দিহান, কেননা ফরাসীদের অজ্ঞাতসারে ও তাহাদের অনুমোদন ছাড়াই যে ইংগ-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল এবং যে-চুক্তি ভার্সাই সন্ধি লংঘন করিয়া জার্মানীর অবৈধ অস্ত্রসজ্জাকে বৈধ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহার কথা সে (ফ্রান্স) তখনো চিন্তা করিতেছিল। ফরাসী সন্দেহবাদীরা নিজেদের সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে জাপান

যখন জাতিসংঘকে অবজ্ঞা করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় চীনকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং উভয়ে জাতিসংঘের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যখন বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত হইয়াছিল তখন ব্রিটেন ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

আমি এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ব্রিটেন যখন তার অধীন সমস্ত দেশ সহ আর-একটি যুদ্ধে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তখন দৈব ঘটনার মতো একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। অকস্মাৎ দূরে দিগ্বলয়ে দেখা দিয়েছিল হিটলারের ছায়া এবং তাহার ফলে ইটালীকে আক্রমণোদ্যত গ্রেট ব্রিটেনের প্রসারিত বাহুদ্বয় হইয়া পড়িয়াছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

ব্রিটেনের কূটনীতি

ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ গ্রেট ব্রিটেনে ও বিদেশে তাঁহাদের ইটালী-বিরোধী নীতি সম্বন্ধে জনমত গঠনে যে কূটনীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমি বিস্ময়াভিভূত। ১৯১৪ সালের শ্লোগান হইল "জাতিসংঘকে বাঁচাও"। এমন-কি ব্রিটিশ শ্রমিক দল ও ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট দলও গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় (রক্ষণশীল) সরকারের সামিল হইয়াছিল। ম্যাক্সটন, ফেনার, ব্রকওয়ে ও ম্যাকগভার্নের নেতৃত্বাধীন স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের একটি ছোটো গোষ্ঠী মাত্র ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো সাহস ও সাধুতা দেখাইয়াছিল এবং ঘোষণা করিয়াছিল যে এরূপ একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ব্রিটিশ শ্রমিকদের কোনোপ্রকার স্বার্থ নাই। কিন্তু সরকারের সমর্থনে অভিমতের যে ঐকতান সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের প্রয়াস গিয়াছিল ডুবিয়া। পিছনে এই ধরনের প্রকৃত গরিষ্ঠ জাতীয় সমর্থন লইয়া স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর জেনেভায় জাতিসংঘের মঞ্চ হইতে ইটালী ও বিশ্বের উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে ভাষণ দিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল কূটনীতির বিজয়ে পরিণত হইয়াছিল।

ইটালীবাসী যাহাই দাবি করুক-না কেন এ-বিষয়ে বড়ো একটা সন্দেহ নাই যে বিরাট সাম্রাজ্যের সমর্থন সমন্বিত ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত ইটালীকে পরাস্ত করিতে পারিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও নিশ্চিত যে পৃথিবীতে দক্ষতম বিমান বাহিনীগুলির অন্যতম এবং বর্তমান গ্রেট ব্রিটেনের বিমান বাহিনীর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী বলিয়া স্বীকৃত ইটালীয় বিমান বাহিনী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি করিতে পারিবে। ফলে যুদ্ধে জয়ী হইয়াও ব্রিটেন আজিকার তুলনায় অনেক বেশি হীনবল হইয়া পড়িবে। আর

একটি পঙ্গু নৌবাহিনী লইয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে নাৎসী বাহিনীর বিরাট অস্ত্রসজ্জার।

জার্মানী সম্বন্ধে সন্দেহ

সাম্রাজ্যবাদী কূট-কৌশলীদের একটি গোষ্ঠী বলিতে শুরু করিয়াছিলেন যে এখন মেমেল হইতে যে দূরাগত ধ্বনি শুনা যাইতেছে তাহা গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে আবিসিনিয়ায় ইটালীর উৎপাত অপেক্ষা বৃহত্তর বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। সর্ব-প্রকার অভিমত সম্পন্ন ফরাসী রাজনীতিকদের দ্বারা এই সাবধানবাণী সমর্থিত ও পুনঃসমর্থিত হইয়াছিল। ইঁহাদের কাছে বর্তমানে একমাত্র উদ্বেগ হইল ভবিষ্যৎ জার্মান বিপদের প্রতিরোধ করা। অবশেষে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার পক্ষে বীরত্ব অপেক্ষা সুবিবেচনাই ছিল অধিকতর বাঞ্ছিত। কারণ এই যে, যদিও হিটলার খাঁটি ব্রিটিশ-সমর্থক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন ও জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণের কোনো অভিপ্রায় তাঁহার নাই এবং যদিও মেমেল অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তে তাঁহার সকল লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত, তবু অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিক সশস্ত্র জার্মানী সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন যে যদিও আজ ইংলন্ড কিংবা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কোনো অভিপ্রায় জার্মানীর নাই, তবু যে মুহূর্তে জার্মানী পূর্বে ও দক্ষিণে আত্ম-সম্প্রসারণের চেষ্টা করিবে সেই মুহূর্তে ইংলন্ড ও ফ্রান্স যদি ইয়োরোপে জার্মান প্রভুত্ব বন্ধ করিতে চায় তাহা হইলে তাহারা যুদ্ধে জড়িত হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পঙ্গু নৌবাহিনী লইয়া গ্রেট ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে গুরুতর অসুবিধায় পড়িবে। ইতিমধ্যে জার্মান বিমান বাহিনী সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিমান বাহিনী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ বিপদের প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটেনের অনুকূলে সংগ্রামী শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র আশা নিহিত আছে গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান নৌশক্তি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মধ্যে।

গ্রেট ব্রিটেনে যখন এই-সব বিষয় সম্বন্ধে সযত্ন বিচার-বিবেচনা চলিতেছে তখন ইটালী ঘোষণা করিয়াছে যে ফ্রান্স ও ব্রিটেন যদি তাহার আবিসিনীয় কর্মনীতি ব্যর্থ করিয়া দেয় তাহা হইলে সে মধ্য ইয়োরোপের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে হাত গুটাইয়া লইবে এবং হিটলারকে সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ

স্বাধীনতা দিবে। ফল হইয়াছে আশ্চর্যজনক এবং অস্ত্রের ঝনৎকার থামিয়া গিয়াছে। এইভাবে হিটলার তাঁহার পুনরায় অস্ত্রসজ্জার কর্মনীতির দ্বারা ১৯৩৫ সালে ইয়োরোপে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে ভয় দেখাইয়া শান্তি বজায় রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে একটি প্রশ্ন

ইয়োরোপ যখন আর-একটি যুদ্ধের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল তখন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কী করিয়াছিলেন এ প্রশ্ন আমি করিতে চাই। সম্ভবত তাঁহারা বলিবেন যে এ ক্ষেত্রে কী ঘটিতেছিল না-ঘটিতেছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনার হেরফের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ওয়াকিবহাল রাখার মতো চর যদি তাঁহারা বিদেশে রাখিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন তবে তাহা কি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়?

সুকৌশলী মিশর

মিশরীয় নেতৃবৃন্দের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া এ কথা আমাকে বলিতে হয় যে যুদ্ধের বিপদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দাবি তোলেন যে কোনো প্রকারের মিশরীয় সহানুভূতি কিংবা সাহায্য যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ব্রিটেন কর্তৃক মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতা মানিয়া লইতে হইবে।

ব্রিটেন যখন অসুবিধায় পড়িয়াছিল তখন আমরাও দরকষাকষি করিতে পারিতাম। আমরা তাহা করি নাই তাহাই শুধু নয়, আমরা ব্রিটিশ কূট-নীতিকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দিয়াছিলাম। আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদলকে পাঠানো হইয়াছিল আদ্দিস আবাবায়। কেন এরূপ করা হইয়াছিল তাহা কি আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি? খুব হাতের কাছে আবিসিনিয়ার সীমান্তের ওপারেই ব্রিটিশ সৈন্য ছিল— যেমন ধরুন কেনিয়ায়, সুদানে, মিশরে, ব্রিটিশ সোমালিল্যান্ডে। যদি আদ্দিস আবাবায় ব্রিটিশ দূতাবাসকে রক্ষা করাই লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে এই-সব সৈন্যকে কেন পাঠানো হয় নাই। কারণ স্পষ্ট নয়। আবিসিনিয়ায় ব্রিটিশ কর্মনীতির প্রতি ভারতীয় সমর্থন প্রতিপন্ন করার জন্য এবং ভারতের বিপুল সম্পদ ব্রিটেনের পিছনে আছে ইহা ইটালীকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাঠানো হইয়াছিল।

আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতীয় জনগণের দৃষ্টিগোচর করা উচিত। জেনেভায় গ্রেট ব্রিটেনের মুখপাত্র তুলনাহীন ধৃষ্টতার সঙ্গে ইটালীর তুলনায় ব্রিটেনের নৈতিক উৎকর্ষের প্রমাণস্বরূপ ভারতের প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের আচরণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। যখন এই অদ্ভুত বক্তৃতা তারবার্তার সাহায্যে সারা বিশ্বের সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে প্রচারিত হইতেছিল তখন আমরা নিরুপায় অবস্থায় বসিয়া নিজেদের আঙুল কামড়াইতেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেহ যদি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে জেনেভায় বক্তৃতার মাধ্যমে স্যার স্যামুয়েল হোর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবেন, তাহা হইলে তিনি যে শুধু ভারতের সমর্থনে ব্যাপক ও তাৎক্ষণিক প্রচারের সুযোগ পাইতেন তাহাই নয়, গ্রেট ব্রিটেন যে নীতিজ্ঞানের ভেক ধারণ করিয়াছিল তাহাও তিনি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও পুনরায় আমাদের নেতৃত্বকে ব্যর্থ হইতে দেখা গিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়িতেছে যে কয়েকমাস আগে সোশ্যালিস্ট পার্টি যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাহা বিধিবহির্ভূত বলিয়া নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। যদি ভারতীয় জনগণের নেতারা নিজেদের ভাবী কার্যক্রম নির্ধারণে নাকের ডগার বাহিরে কিছু না দেখিতে পান, তাহা হইলে আমরা যে স্বরাজের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকে কি? এই সেদিন আইনসভায় সরকার যে বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে ভারত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার পূর্বে আমাদিগকে যথোচিতভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইবে— একমাত্র জন্মসূত্রে মূর্খ ব্যক্তিই তাহা মানিয়া লইতে পারে। ঘটনা ঘটিবার পর সরকার সর্বদা আমাদের তাহা জানাইবেন। যাহা হউক, যুদ্ধ সমাসন্ন হইলে পূর্বাহ্নে তাহা জানা নেতাদের কর্তব্য।

অস্ট্রিয়া। ২০ অক্টোবর ১৯৩৫

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

ইউনাইটেড প্রেস-এর নিকট প্রেরিত বক্তব্য।

ভারত-জার্মান বাণিজ্যের পরিসংখ্যান সম্বন্ধে 'বোম্বে ক্রনিকল্' পত্রিকার গত ১৬ অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সভার সম্পাদক ও ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মধ্যে পত্রবিনিময় আমি যথেষ্ট আগ্রহের সহিত পড়িয়াছিলাম।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে কয়েক মাস আগে আমি যখন কার্লসবাদে ছিলাম তখন জার্মানীর সহিত ভারতের যে প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা বর্তমান তৎপ্রতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে একটি বিবৃতিতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বর্তমানে জার্মান কারখানাগুলিতে শিক্ষানবিশির সুযোগ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটি অসুবিধার জন্য ভারত সরকার প্রধানত দায়ী হইলেও ভারতীয় বণিক সভার উপরও কিছুটা দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইয়োরোপে এখানে সাধারণ পদ্ধতি হইল দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি করা এবং অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নীতি অনুসরণ করা। ভারতেও এই নীতি অনুসৃত হইবে না কেন? অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনে আমরা দৃঢ়তার সহিত এই আদানপ্রদান রীতি অনুসরণ সুপারিশ করি। ভারতে এই নীতি অনুসৃত হইবে না কেন? আমি ভারতের বহির্বাণিজ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদানের নীতি গ্রহণ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। এই নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি প্রয়োজন।

অধিকন্তু আমার অভিমত এই যে তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ যেমন জার্মানীর নিকট হইতে পণ্য ক্রয়ের পূর্বে চুক্তি করিয়া নেয় যে তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অধিবাসীকে জার্মান কারখানাগুলিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হইবে, তেমনই ভারত সরকারেরও উচিত অনুরূপ শর্ত আরোপ করা। আমি ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বলিতে পারি যে এরূপ শর্ত আরোপ করা হইলে জার্মানী তাহা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। অবশ্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা হইবে ভারত সরকার কর্তৃক এই শর্ত আরোপ করা। কিন্তু তাঁহারা যদি তাহা না করেন তাহা হইলে ভারতীয় বণিকসভা কাজে নামিতে পারেন। যদি বেসরকারী

সংস্থাগুলি ভারতীয় বণিক সভার মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে এই দাবি করে, তাহা হইলে সে দাবি নিশ্চয়ই মঞ্জুর করা হইবে। আমার খবর আছে যে গত বৎসর ভারত সরকার কর্তৃক জার্মান সংস্থাগুলির কাছে প্রায় ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বৃহত্তর অংশ পাইয়াছিল ক্রুপ্স। আমরা পরিবর্তে কী পাইতেছি তাহা কি আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

এইসঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যে-সব বৈদ্যুতিক ও ইস্পাত দ্রব্যের (যন্ত্রপাতিসহ) জন্য জার্মানী প্রসিদ্ধ তাহার অনেকগুলিতে চেকোশ্লোভাকিয়াও বিশেষজ্ঞ। চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য উদ্বিগ্ন এবং বহু বৎসর ধরিয়া সে ভারতের কাছে যত মূল্যের পণ্য বিক্রয় করে তাহা অপেক্ষা বেশি মূল্যের পণ্য ভারত হইতে কিনিয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া, চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্কোডার মতো নামকরা কারখানাগুলিতে ভারতীয় শিক্ষানবিশদের স্বাগত জানানো হয়। এ অবস্থায় ভারতের সহিত চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যবস্থা থাকা যুক্তিসংগত নয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে আমরা যদি জার্মানী হইতে পণ্য সরবরাহের কিছু আদেশ চেকোশ্লোভাকিয়ায় হস্তান্তর করি তাহা হইলে আমরা যে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত ন্যায়সংগত আচরণ করিব তাহাই নয়—ইহার ফলে জার্মানী ভারতের ন্যায়সংগত দাবি ও প্রত্যাশার প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল হইয়া উঠিতে বাধ্য হইবে।

ভারত হইতে ইয়োরোপে রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা উচিত যে হামবুর্গের মতো জার্মান বন্দরগুলি শুধু জার্মানীর জন্য প্রেরিত পণ্যই গ্রহণ করে না, অন্যান্য মধ্য ইয়োরোপীয় দেশের জন্য প্রেরিত পণ্যও গ্রহণ করে। জার্মানীতে প্রস্তুত পরিসংখ্যান-বিষয়ক বিবরণ ত্রুটিযুক্ত, কেননা জার্মান বন্দরগুলিতে যে-সব ভারতীয় পণ্য যায় এইগুলি হইতে তাহাদের সঠিক গন্তব্যস্থল জানা যায় না।

উপসংহারে আমি পুনরায় আদানপ্রদানের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রশ্নটি গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল ভারতবাসীর কাছে আবেদন জানাই।

২৭ নভেম্বর ১৯৩৮

কংগ্রেস : সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রেরিত বাণী।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে এই একটি ছোটো গোষ্ঠী হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা সহ একটি দেশব্যাপী সংগঠনে পরিণত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের জন্য ইহাই একটিমাত্র সংগঠন। ইহা আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং ইহা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের কেন্দ্রীয় সংস্থা।

আমরা যখন অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে তাকাই তখন গর্বে ও আশায় আমাদের বুক ভরিয়া যায়। গর্বের হেতু হইল জাতির অতীত কৃতিত্ব এবং আশার হেতু হইল চরম বিজয়ে বিশ্বাস। গর্ব এবং আশার মনোভাব লইয়া আসুন আমরা কংগ্রেসের জয়ন্তী উৎসবে অংশ গ্রহণ করি।

আসুন এই শুভলগ্নে আমাদের যে জাতীয় বীরের দল আজিকার কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ চালাইয়া যাইবার মতো অধিকতর শক্তির জন্য আসুন আমরা প্রার্থনা করি এবং সর্বশেষে আসুন আমরা অতীতের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কোনো সম্পত্তি নয় ; কেবলমাত্র ইহার রেজিস্ট্রি-ভুক্ত সদস্যগণ ভারতীয় জাতির সম্পত্তি। সুতরাং আমি সমগ্র জাতির কাছে আবেদন জানাই যে তাঁহারা জয়ন্তী উৎসবকে নিজেদের পক্ষে ও জাতির পক্ষে উপযুক্ত মর্যাদায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুন। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে আসুন আমরা সকলে ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গের ব্রত নূতন করিয়া গ্রহণ করি।

২০ ডিসেম্বর ১৯৩৫

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষ

ইউনাইটেড প্রেসের নিকট প্রেরিত বিবৃতি।

বেশ কিছুদিন পূর্বে আগে গত ৮ অক্টোবর সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলাম তাহাতে আমি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেগুলি হইল বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটে মিশরের মনোভাব এবং আফ্রিকায় ইটালীয় সম্প্রসারণে তীব্র বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও যে-সব কারণে ইটালীর প্রতি ব্রিটেন নরম কর্মনীতি গ্রহণ করিয়াছে সেগুলির বিশ্লেষণ।

প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ মিশর সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণ এখন ওয়াফদ দলের সাহসী ও কূটনৈতিক চালের কথা জানেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জনসাধারণ স্যার স্যামুয়েল হোরের গিল্ডহল বক্তৃতার কথা স্মরণ করিবেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন যে সমগ্র মিশরীয় জনগণ ১৯২৩ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করার যে দাবি তুলিয়াছেন ব্রিটিশ সরকার তাহার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছেন; এই বক্তৃতার পরেই মিশরে রাজনৈতিক ঝড়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। বেশি দিন অতীত হইবার পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং এখন ১৯২৩ সালের সংসদীয় সংবিধান পুনরুজ্জীবনের মিশরীয় দাবি মানিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এইভাবে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা তাহাদের প্রথম বড়ো বিজয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এখন মিশরের স্বাধীনতা মানিয়া লইবার জন্য মিশর ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে একটি স্থায়ী চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই ঘটনা হইতে আমাদের, ভারতীয়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। সেই শিক্ষাটি হইল এইরূপ। রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য শুধু আমাদের প্রচেষ্টার পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, আমরা কিভাবে আন্তর্জাতিক সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারি তাহার উপর ইহা সমানভাবে নির্ভর করে। যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকে তখন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় সর্বনিম্ন ফল পাওয়া যাইতে পারে— আবার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল হইলে সর্বনিম্ন ত্যাগ ও প্রয়াসের ফলে সর্বাপেক্ষা বেশি ফল পাওয়া যাইতে পারে।

জনগণকে বৃহত্তর ত্যাগ ও প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার মধ্যেই শুধু নেতৃত্ব নিহিত নয়, আন্তর্জাতিক সুযোগের যথোচিত ব্যবহারের মধ্যেও তাহা নিহিত। মিশরে বৎসরের পর বৎসর ব্যাপী বিক্ষোভ ১৯২৩-এর সংবিধান পুনরুজ্জীবনে ব্যর্থ হইয়াছিল ; কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় কয়েকদিনের বিক্ষোভ ফলপ্রসূ হইয়াছে। আমরা আমাদের ইতিহাস বিচার করিলে একথা মানিতে বাধ্য যে আমরা যথোচিতভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সক্রিয় না হইয়া ভয়ংকর ভুল করিয়াছি। আশা করা যায় যে অতীতের ভুলের আর পুনরাবৃত্তি করা হইবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে আমি বেশ কিছুকাল পূর্বে ৮ অক্টোবর বলিয়াছিলাম যে পুনরস্ত্রসজ্জিত জার্মানীর ভীতি গ্রেট ব্রিটেনকে ইটালীর প্রতি সহনশীল মনোভাব গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। কয়েকদিন পূর্বে ব্রিটিশ কমনস্ সভায় হোর-লাভাল প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া প্রধানমন্ত্রী বলড্‌উইন বলিয়াছিলেন যে দুঃখের বিষয় তাঁহার মুখ বন্ধ ; কিন্তু তিনি যাহা জানেন তাহা যদি বলিতে পারিতেন তাহা হইলে একটি ভোটও যে তাঁহার বিরুদ্ধে যাইত না এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। এই বক্তৃতার পর হইতে বলড্‌উইন কী গোপন তথ্য জানেন এবং কোনো গোপন তথ্য তিনি ফাঁস করিতে পারিতেছেন না— তাহা লইয়া সারা ইয়োরোপে প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে। গতকল্য ফরাসী সাময়িকপত্র 'চোক' কর্তৃক এই অবগুন্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত হইয়াছে। এই পত্রিকা অনুসারে ফরাসী সামরিক বাহিনীর কাছে নির্ভরযোগ্য সংবাদ আসিয়াছে যে জার্মানী ভয়ংকর গতিতে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে এবং ইহার ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন উভয়েই ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাই ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ইটালী-আবিসিনিয়া বিরোধের অবসান চান এবং স্ট্রে সা ফ্রন্টের পুনরুজ্জীবন চান অর্থাৎ জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বোঝাপড়া চান। যদি ফরাসী সাময়িক পত্র 'চোকে'র এই রহস্যভেদ সত্য হয় তাহা হইলে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিবে। আজিকার ভিয়েনার পত্রিকাগুলির খবরে প্রকাশ যে জাতিসংঘ এক মাসের জন্য অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ইটালী-আবিসিনিয়ার প্রশ্ন বিবেচনা স্থগিত রাখিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে এই চালের পিছনে আছেন ফরাসী সরকার ও ব্রিটিশ সরকার।

কয়েক মাস ধরিয়া এ কথা বলিতে বলিতে আমার গলা ভাঙিয়া গেল যে

বর্তমানে জাতিসংঘ যেভাবে গঠিত তাহাতে ইহা বৃহৎ শক্তিগুলির হাতের পুতুল মাত্র এবং ভারতের উচিত এই সংঘ ত্যাগ করা, কেননা ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাহার কোনো লাভ নাই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আমার এই মনোভাব যে অভ্রান্ত, সময় তাহা প্রতিপন্ন করিবে। জাতিসংঘকে প্রয়োজনীয় বর্মরূপে ব্যবহার করিয়া বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থ অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিংবা শান্তি স্থাপন করিবে। যখন ইংলন্ডের স্বার্থে প্রয়োজন হইয়াছিল তখন সে ইটালীর বিরুদ্ধে বাধা নিষেধ প্রয়োগ করিয়াছিল। আবার যখন তাহার স্বার্থে প্রয়োজন হইয়াছিল তখন সে এমন শর্তে শান্তি প্রস্তাব (হোর-লাভাল প্রস্তাব) করিয়াছিল যাহার ফলে ইটালীর হাতে অর্ধেক আবিসিনিয়া তুলিয়া দিতে হইত। এমন-কি আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে জাতিসংঘের পাঁচ জনের কমিটি যে প্রস্তাব রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আবিসিনিয়ার অধিকার ও ভূমি ইটালীকে উপহার রূপে দিতে চাওয়া হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আমি প্যারীর পত্রিকা 'পপুলেয়ারে' ফরাসী সমাজতান্ত্রিক নেতা ম' লিও' ব্লুম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না—

কয়েকদিন পূর্বে স্যার স্যামুয়েল হোর গিল্ডহলের যে বক্তৃতায় সাধারণ নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বে সর্বপ্রকার গাম্ভীর্য সহকারে বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি নির্বাচনের পূর্বে যাহা ছিল নির্বাচনের পরেও ঠিক তাহাই থাকিবে, আমি (তিনি বলেন) তাহা গুরুত্ব সহকারে ছাপিতেছিলাম। আমি এ কথা বলিতে লজ্জা বোধ করি যে ম'- লাভালের সমর্থকরা যখন আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে এই সবকিছু নির্বাচনী অভিযানের সময় অপেক্ষা বেশি দিন টিঁকিবে না তখন তাঁহাদের কথা আমি বিশ্বাস করি নাই।

এই অবস্থায় ইংলন্ডের স্বতন্ত্র শ্রমিক দল ও তাঁহাদের মুখপত্র 'দি নিউ লীডার' বাধা নিষেধ প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট থাকায় যে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদের সেই মনোভাবে যথেষ্ট বুদ্ধি ও যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫

জামশেদপুরে শ্রমিক পরিস্থিতি : চিত্রের অন্যদিক

জামশেদপুরের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কসের জেনারেল ম্যানেজার মি. জে. এল. কীনানের লেখা যে প্রবন্ধটি ডিসেম্বর ১৯৩৫-এর 'দি মডার্ন রিভিয়্যু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একাধিক কারণে চিত্তাকর্ষক। ইস্পাত তৈয়ারি হইতে ঐতিহাসিক ও সামাজিক গবেষণায় বিচরণের দিক হইতে ইহা চিত্তাকর্ষক, যে নিস্তরঙ্গ আত্মসন্তুষ্টি লেখককে অনুপ্রাণিত করিয়াছে সেজন্য ইহা চিত্তাকর্ষক, বহু রকমের পরস্পরবিরোধিতার যে প্রাবল্য প্রবন্ধটিতে রহিয়াছে সেজন্যও ইহা চিত্তাকর্ষক।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে একটি কথা বলি। মি. কীনান যখন ইস্পাত উৎপাদনের কথা বলেন তখন তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার আত্মবিশ্বাস সম্পদ বিশেষ। কিন্তু তিনি যখন প্রাচীন ইতিহাস কিংবা সমাজবিজ্ঞানের কণ্টকময় অরণ্যে ঢুকিয়া পড়েন তখন তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। মি. কীনান বলেন : "তিনি (জে. এম. টাটা) উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে মনুর সময় হইতে ভারত ধনিকশ্রেণী ও দাসশ্রেণীর দেশে পরিণত হইতে নিয়তিবদ্ধ ছিল।" অর্থনীতিতে ইহা সুবিদিত যে বৃহৎ পরিধির উৎপাদনের ফল স্বরূপ ধনতন্ত্রের আবির্ভাব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। মনু এবং তাঁহার পরে কিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকিতে পারে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। এমন-কি আমরা ভারতে বর্তমানে যে জমিদারি প্রথা দেখি তাহারও জন্ম সাম্প্রতিক কালে। এমন-কি প্রাচীনকালে রাষ্ট্রও সম্পদ জমাইয়া রাখিত না— সে ক্ষেত্রে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে রাষ্ট্র (রাজতন্ত্রই হউক কিংবা সাধারণতন্ত্রই হউক) জনগণের মধ্যে সকল কিছু বণ্টন করিয়া দিবে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধন যিনি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নিজের কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিতেন।

মি. কীনান আরো বলেন : "আমরা (টাটা) জানি যে ভারতে তাঁহার পূর্বে শ্রমিক নামটিই ছিল ঘৃণাসূচক।" মি. কীনান যদি 'শ্রমিক' শব্দটি কারিগর অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কারিগরদের— সে কাঠের মিস্ত্রীই হউক, কামারই হউক কিংবা কুমারই হউক— কখনো ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। তাঁহারা

ছিলেন গ্রামীণ অর্থনীতির অপরিহার্য অংগ এবং অবশিষ্ট গ্রামবাসীদের সংগে তাঁহাদের সম্পর্ক ছিল পরিপূর্ণভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক। শিল্পজগতের সর্বহারা মানুষ অর্থে শ্রমিকরা হইলেন ধনতন্ত্রের কুফলসঞ্জাত এবং ইহার সংগে ভারতীয় ইতিহাসের কোনোপ্রকার সংযোগ নাই। শ্রমিকদের (শিল্পজগতের সর্বহারাদের) যদি ভারতে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের অবস্থাও অনুরূপ। আমি ইয়োরোপীয় কারখানায় ভারতীয় শিক্ষানবিশদের মুখে শুনিয়াছি যে ইয়োরোপীয় কারখানাগুলিতে শ্রমিক ও পরিচালকদের মধ্যবর্তী ব্যবধান খুবই বিরাট।

মি. কীনান যখন বলেন যে "সাধারণ নিয়মানুসারে শ্রমিকের অর্থ সঞ্চয় নিষিদ্ধ ছিল এবং তাহার প্রভু তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিলেও সে দাসই থাকিয়া যাইত", তখনো তিনি ভ্রান্ত। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি মি. কীনান কোথা হইতে এই মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিলেন। পক্ষান্তরে আমরা জানি যে ভারতে নিম্নশ্রেণীজাত মানুষেরা নিজেদের ব্যক্তিগত গুণের দ্বারা অনেক সময় সর্বাধিক মর্যাদার আসন পাইতেন। আমরা যদি বর্তমান মহারাজাদের ও জমিদারদের পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করি তাহা হইলে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণী হইতে উদ্ভূত বাংলার কৈবর্ত রাজাদের উদাহরণও আমি এই প্রসংগে দিতে পারি।

মি. কীনান "প্রয়োজনের জন্য শ্রমিক" ও "প্রগতির জন্য শ্রমিকে"র মধ্যে যে ব্যবধান দেখাইয়াছেন তাহা কৃত্রিম এবং আমাকে বলিতে দিলে বলিতে পারি যে অদ্ভুত। প্রাচীনকালেও সব শ্রম সর্বদা প্রয়োজনের জন্য শ্রম ছিল না। লোকেরা সব সময় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কাজ করিত না কিংবা তাহারা সব সময় অনশন নিবৃত্তির মজুরি পাইত না। অধিকাংশ লোক কাজ করিত অংশত ক্ষুধার দরুন আর অংশত কাজের আনন্দের দরুন। সুদূর অতীতে সব শ্রমই সর্বদা ঘর্মসিক্ত ছিল এরূপ বলা অতিরঞ্জিত। যে-সব বিরাট বিরাট শিল্পসৌধ যেমন মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, তাজমহল, মাদুরা, কোণারক এখনো বর্তমান সেগুলি কি "প্রগতির জন্য শ্রমের"ও প্রতীক নয়? ইহা সত্য যে অতীত দিনে শিল্পগুলি আজিকার মতো বিরাট লভ্যাংশ দিত না। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বিরাট লভ্যাংশ পুরাপুরি শিল্পবিপ্লবের অর্থাৎ বৃহৎ পরিধির উৎপাদনের ফল। ইহা ছাড়া, বিরাট

লভ্যাংশের ঘটনাকে সুবিধাজনক কিংবা ক্ষতিস্বমূলক বলা যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন স্বীকার করিতেছেন যে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্র হইতে উদ্ভূত অন্যায়গুলির জন্য বহুলাংশে দায়ী কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন এবং ইহাদের সংগৃহীত অস্বাভাবিক রকম বিরাট লভ্যাংশ হয় ঘর্মসিক্ত শ্রমের বিনিময়ে, নতুবা ঔপনিবেশিক অথবা অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে শোষিত পণ্য ব্যবহারকারীর বিনিময়ে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট "একদল গর্দভ সদৃশ অধ্যাপকের সহায়তায়" বর্তমান মন্দার হাত হইতে মুক্তির উপায় খুঁজিতেছেন— ইহা উল্লেখ করিয়া মি. কীনান শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পক্ষে কিছু বলিতেছি না কিংবা সেই মহান প্রেসিডেন্টের এরূপ সাহায্যের কোনো প্রয়োজনও নাই। তবু ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে যে আজ রাশিয়াকে বাদ দিলে পৃথিবী হইতে বেকারত্ব ও মন্দা দূর করিবার বৃহত্তম পরীক্ষা চলিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে? এই প্রসংগে মি. এইচ. জি. ওয়েলস্ 'দি নিউ অ্যামেরিকান ইন নিউ ওয়ার্ল্ড' নামে যে চমৎকার পুস্তিকাটি লিখিয়াছেন এবং যাহাতে তিনি মার্কিন পরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ও রাশিয়ার সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন— সেই পুস্তিকাটি আমি লেখককে পড়িতে বলি। মি. কীনান নিজের আত্মসন্তুষ্টিতে যাঁহাদের "গর্দভ সদৃশ" আখ্যা দিয়াছেন সেই অধ্যাপকদের সহায়তা কেন রুজভেল্ট লইয়াছেন তাহারও উল্লেখ আছে মিঃ ওয়েলসের পুস্তিকায়। সম্ভবত যাহা মি. কীনানের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে তাহা হইল এই যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অংশত হইলেও শোষিত সর্বহারাদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে বিরাট লভ্যাংশের উপর হাত দিতেছেন এবং তাঁহার (প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের) অভিমত এই যে মালিকদের উচিত সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তাহাদের সমান বলিয়া গণ্য করা।

মি. কীনান শুধু আত্মসন্তুষ্টই নন তিনি আরো বেশি কিছু। তিনি বলেন যে "ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই কোম্পানি (টাটা) উক্ত ব্যবসায়ে মন্দার অবসান ঘটাইয়াছে এবং আমি মনে করি, সেজন্য ঐ কোম্পানির গর্ববোধ করা উচিত।"। কিন্তু আমি মি. কীনানকে জিজ্ঞাসা করি শেষ পর্যন্ত "ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মন্দা অবসানের" প্রকৃত অর্থ কী। ইহার অর্থ যে পর্যন্ত নূতন বাজার পাওয়া না যায় সে-পর্যন্ত সেই সংস্থাকে

চালু রাখার জন্য আরো বাজার ও যথেষ্ট মূলধন খুঁজিয়া বাহির করা। মন্দার বৎসরগুলিতে ভারতীয় জনগণ ভারত সরকারের মাধ্যমে যে বিপুল অর্থ জোগাইয়াছিলেন তাহার সাহায্যে নূতন বাজার খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানিটি বাঁচিয়া আছে। মন্দার বৎসরগুলিতে ভারতীয় জনগণ সরকারের মাধ্যমে বিপুল অর্থ জোগাইয়াছিলেন তাহা আরো বাজার কিংবা মাল সরবরাহের আরো অর্ডার না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানি চালু রাখিতে সাহায্য করিয়াছিল। কোম্পানি যে আজ আরো লাভ করিতে পারিতেছে, তাহার মূলে আছে দুইটি কারণ : প্রথমত, বিদেশী ইস্পাত, বিশেষ করিয়া ইয়োরোপ মহাদেশের ইস্পাতের উপর আরোপিত শুল্ক টাটার পৃষ্ঠপোষকতা করা জনগণের পক্ষে সম্ভব করিয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, ভারত সরকার কর্তৃক টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানিকে সরাসরি প্রদত্ত মাল সরবরাহের অর্ডার। সুতরাং ইস্পাত ব্যবসায়ে যদি মন্দার অবসান সত্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে কৃতিত্ব প্রকৃতই জনগণ ও ভারত সরকারের প্রাপ্য। মি. কীনান যদিও সাম্প্রতিক উন্নতির জন্য কোম্পানিকে এবং নিজেকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তিনি জনগণ কিংবা ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের একটি কথাও বলেন নাই।

সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সাল হইতে আমি টাটা সম্বন্ধে কিছুটা তথ্য রাখি। আমি জানিতে চাই যে যখন বেকার ভাতা কিংবা বীমার সুযোগহীন হাজার হাজার শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হইয়াছিল তখন সেই মন্দার বৎসরগুলিতে যে মোটা সরকারী সাহায্য কোম্পানিকে চালু রাখিয়াছিল ও চুক্তিবদ্ধ অফিসারদের মোটা বেতন জোগাইয়াছিল তাহা না পাইলে কোম্পানি আজ বাঁচিয়া থাকিত কি ? আমি আরো বলিতে চাই যে আমদানী-করা ইস্পাতের উপর মোটা শুল্ক স্থাপন এবং জনগণ ও ভারত সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন ব্যতীত জেনারেল ম্যানেজার যেরূপ দাবি করিয়াছেন সেরূপভাবে কোম্পানি মন্দার অবসান করিতে পারিত কি ?

কয়েকটি স্থানে লেখক যে বিভ্রান্ত ভাবনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা শোচনীয় এবং তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার উচিত ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান না পড়িয়া অর্থনীতি অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগী হওয়া। এখানে তাঁহার যুক্তির একটি উদাহরণ দেওয়া হইল : "১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে দুই হাতের আঙুলে গোনা যায় এরূপ অল্পসংখ্যক কর্মচারী বাদ দিলে আমাদের মাসিক

বেতনভোগী কর্মীরা ছিলেন 'প্রগতির জন্য শ্রমিক'। ইস্পাত কোম্পানি গত বৎসর লাভ করিয়াছিল এবং এই ইস্পাত কোম্পানি তাহাদের 'প্রগতির জন্য শ্রমিকরা' যে অতিরিক্ত প্রয়াস করিয়াছিল তাহার জন্য তাহাদিগকে ন্যায়সংগতভাবে পুরস্কৃত করিয়াছিল।" উল্লিখিত অংশ পড়িয়া মনে হইবে যে কোম্পানির অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ছিল ১৯৩১ সালে ও তাহার পর কর্মীদের কাজে উন্নতি। আসলে ঘটনা হইল পূর্ব অধ্যায়ে যাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে সেই মাল সরবরাহের বড়ো বড়ো অর্ডার প্রাপ্তিই এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ। কেহ যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একজনের পর একজন শ্রমিককে পরীক্ষা করেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে ১৯২৯-৩০ সালে ও ১৯৩১-৩৩ সালে তাঁহাদের কাজের কোনো হেরফের হয় নাই। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে জেনারেল ম্যানেজার অনুযোগ করিতেন যে মাল সরবরাহের অর্ডারের অভাবে তাঁহাকে মজুরি কমাইতে হইয়াছিল, ব্যাপক ছাঁটাই করিতে হইয়াছিল এবং জামশেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির কয়েকটি বিভাগ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল।

লেখক একটি জায়গায় যেমন মন্তব্য করিয়াছেন "বর্তমানে আমার মতে অর্থনৈতিক কারণে একমাত্র টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিকরা ছাড়া গোটা ইস্পাত জগতের শ্রমিকরা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারা 'প্রগতির জন্য শ্রমিক', 'প্রয়োজনের জন্য শ্রমিক' নয়।···আমার মতানুসারে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্ততপক্ষে শ্রমিক মহলে এমন কেহ নাই যাঁহারা 'প্রয়োজনের জন্য শ্রমিক' শ্রেণীর বাহিরে আসার চেষ্টা করিতেছেন।···এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আমরা প্রত্যেকেই ইহা উপলব্ধি করি যে ভারতে আমরা ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সালে মন্দার সম্মুখীন হইয়াছিলাম! একই মন্দা অন্যান্য দেশেও আছে। আমার ধারণা ইস্পাত ব্যবসায়ে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানিই একমাত্র কোম্পানি যাহার অগ্রগতি হইয়াছে···"।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে জামশেদপুর ইস্পাতকর্মীদের পক্ষে স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে— পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ইস্পাত কোম্পানিগুলির আদর্শস্থল। কিন্তু আসল তথ্যগুলি কি? প্রবন্ধের প্রথম দিকে লেখক বলিয়াছেন যে আমেরিকার ইস্পাতকর্মীরা বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বেতন পান। ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৫-এর আমেরিকান আয়রন অ্যান্ড স্টীল ইনস্টিটিউটের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া লেখক বলিয়াছেন :

"নভেম্বর ১৯৩৪-এ মার্কিন শ্রমিকরা…গড়ে ঘণ্টায় ৬৪.৭ সেন্ট রোজগার করিতেন।…জাপানী মজুরির হার ছিল ঘণ্টায় ৯.৭ সেন্ট এবং ১৯৩৩-এ ভারতে এই হার ছিল ঘণ্টায় ৮.৬ সেন্ট"। (ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এই অংক ছিল ঘণ্টায় ২৫ সেন্টের মতো)। ভারতের গড় যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-অষ্টমাংশ হয় এবং টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি যদি ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বৃহত্তম ইস্পাত শিল্প হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে অর্থহীন বাগাড়ম্বর না করিয়া টাটার জেনারেল ম্যানেজারের উচিত লজ্জায় মাথা নত করা।

লেখক যখন প্রথম লিখিতে বসিয়াছিলেন তখন তিনি যে তাঁহার কোম্পানির ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার নীচের মন্তব্য হইতে পরিষ্কার :

"আমরা মনে করি যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি ; আমরা আমাদের হাসপাতালগুলি লইয়া বাগাড়ম্বর করি ; আমরা যে মজুরি দিয়া থাকি তাহা লইয়া অহংকার করি। কিন্তু আমরা কি এক মুহূর্ত থামিয়া চিন্তা করি এবং ভারতের সংগে ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকার তুলনা করি ? আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে আমরা তাহা করি না…আমরা আমাদের কর্মীদের যে বেতনাদি দিয়া থাকি তাহার সহিত ইয়োরোপে প্রদত্ত বেতনাদির তুলনা করা উচিত।"

এখন আমি আরো গুরুতর ধরনের অভিযোগের কথায় আসিব যা টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির বিরুদ্ধে আনা যায়। এই-সব অভিযোগ হইল নিম্নোক্ত খাতে :

১. ভারতীয়করণ সম্বন্ধে মনোভাব।

২. অপচয় নিরোধে তাঁহাদের অযোগ্যতা।

৩. শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব।

উল্লিখিত তিনটি খাতের ভূমিকা স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে টাটার পরিচালকবর্গ সর্বদা দাবি করেন যে তাঁহাদের শিল্প 'জাতীয়' শিল্প এবং ইহারই ভিত্তিতে তাঁহারা সরল জনসাধারণের সহানুভূতির পূর্ণতম সুযোগ লইয়াছেন। কিন্তু আমি এখনই প্রমাণ করিব যে ভারতীয় শিল্পপতিদের যে বস্ত্রকলগুলির ক্ষেত্রে "জাতীয়তা" কিংবা "স্বদেশ প্রেম"-এর ধুয়া প্রায়শই জনসাধারণকে ঠকাইবার জন্য সুবিধাজনকভাবে ব্যবহৃত হয়, এমন-কি সেগুলি অপেক্ষাও জামশেদপুরে টাটার শিল্প অনেক কম "জাতীয়"।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে যখন ইস্পাত কোম্পানিটি গঠিত হইয়াছিল তখন বহু সংখ্যক বিদেশীকে, বেশির ভাগ মার্কিন ও ইংরেজ, উচ্চতর পদে চুক্তিতে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের সমপরিমাণে রাজকীয় বোনাস-সহ রাজকীয় বেতন দেওয়া হইত এবং আমি এরূপ ব্যাপার জানি যেখানে বোনাস ছিল বেতন অপেক্ষাও বেশি এবং উৎপাদন কিংবা লাভের সংগে তাহার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমার যদি ভুল না হয়, তাহা হইলে জেনারেল ম্যানেজার নিজে মাসে বেতন পান ১০,০০০ টাকা— ইহা ভারতের প্রধান প্রদেশগুলির গভর্নরগণের বেতনের সমান। জনসাধারণকে বলা হইয়াছিল যে যথেষ্ট সংখ্যায় ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দিবার সংগে সংগে তাঁহারা চুক্তিবদ্ধ অফিসারদের স্থলে কার্যভার লইবেন। এই প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় নাই। ১৯২৮ ও ১৯৩১ -এর মধ্যে আমরা বারবার ভারতীয়করণের অনুরোধ জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। আজ অবস্থা হইল এই যে, অনেক বিভাগে ভারতীয়রা চুক্তিবদ্ধ বিদেশীদের সমান কাজ করিয়াও শেষোক্তদের মোট বেতনাদির অর্ধেক কিংবা এক-তৃতীয়াংশ বেতন পাইতেছেন। ইহা ছাড়া আলোচ্য সময়ে আমার জেনারেল ম্যানেজারের সহিত যোগাযোগ থাকায় আমি অভিযোগ করিয়াছিলাম যে উপযুক্ত ভারতীয় থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন চুক্তিবদ্ধ অফিসারের সংগে চুক্তি আরো কিছুকালের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। জামশেদপুরে কতজন বিদেশী কর্মরত আছেন এবং তাঁহারা কত বেতন পান সে সম্বন্ধে আজ যদি কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তাহা হইলে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি নিন্দাভাজন হইবে।

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি নিঃসন্দেহে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান এবং সেইজন্যই অপচয় নিবারণের উদ্দেশ্যে কঠোর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আদৌ সন্তোষজনক নয়। ডিরেক্টররা অনুপস্থিত থাকেন এবং এই সংস্থার আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা সকলেই নিজের নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত মানুষ এবং জামশেদপুরে যন্ত্রপাতির কাজকর্ম দেখিবার মতো ইচ্ছা কিংবা অবকাশ তাঁহাদের নাই। ফলে বিরাট যন্ত্রপাতি চালানোর দায়িত্ব থাকে বিদেশীদের হাতে এবং যে অনুপস্থিত বোর্ড তাঁহাদের হাতের মুঠোয় তাহার কাছে ছাড়া অন্য কাহারো কাছে তাঁহাদের কোনো দায়িত্ব নাই। আমাকে যখন ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে ধর্মঘটীদের পক্ষে আপসের শর্তগুলি লইয়া

আলোচনা করিতে হইয়াছিল তখন আমি প্রথম বোর্ডের অসহায়তা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যদি কোনো বিষয়ে জেনারেল ম্যানেজার "হ্যাঁ" বলিতেন বোর্ড তাহাতে সম্মত হইতেন। পক্ষান্তরে জেনারেল ম্যানেজার যদি "না" বলিতেন বোর্ডেরও উত্তর হইত "না"।

তবু যে মীমাংসায় আসা গিয়াছিল তাহার কারণ হইল যে তৎকালীন জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আলেকজান্ডার মীমাংসার অনুকূলে ছিলেন। আমি একবার ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতিকে পরামর্শ দিয়াছিলাম যে অফিসারদের মুখে ঝাল না খাইয়া তাঁহার ও বোর্ডের উচিত শ্রমিকদের সহিত অধিকতর সংযোগ স্থাপন করা এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যদি কারখানায় ঘুরিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভালো হইবে। সভাপতি আমার প্রস্তাবে সম্মত বলিয়া মনে হইয়াছিল কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার ইহার বিরোধিতা করায় আমার পরামর্শ কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। তৎসত্বেও বোর্ড বোধ হয় নিজেদের অবস্থা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কেননা ইহার অল্প পরে তাঁহারা বোর্ড ও পরিচালন কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একজন ডিরেক্টরকে জামশেদপুরে এবং পরে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োগের পর হইতে জামশেদপুরে কিছুটা প্রশাসনিক দৃঢ়তা দেখা দিয়াছে। আর কলিকাতায় এবং অন্যত্র অধিকাংশ পত্রিকাকে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দলে টানিয়া নেওয়া হইয়াছে এবং তাহার ফলে আজ জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিতে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি সম্বন্ধে সমালোচনা দেখা যায় না বলিলেই চলে। কিন্তু আসল ব্যাধি অর্থাৎ অপচয় ও অযোগ্যতা অব্যাহতই আছে।

উল্লিখিত ডিরেক্টর একজন ভূতপূর্ব আই. সি. এস. এবং দক্ষ প্রশাসক কিন্তু তাঁহার কারিগরি দক্ষতা না থাকায় পরিচালন কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব। ইহার একটি ফল হইয়াছে এই যে ভারতীয়করণের বিষয়ে অগ্রগতি হইয়াছে সন্তোষজনক। বহুসংখ্যক চুক্তিবদ্ধ অফিসার আছেন যাঁহাদের স্থান দক্ষ ভারতীয়রা অনেক কম বেতনহারে পূর্ণ করিতে পারেন। আমি পূর্বে ১৯৩৩ সালের জন্য গড়ে ভারতীয় মজুরির হার প্রতি ঘণ্টায় ৮.৬ সেন্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আমরা যদি উক্ত বেতনভোগী বিদেশীদের বাদ দিই তাহা হইলে গড় আরো অনেক কমিয়া যাইবে সে-বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, জামশেদপুরে যে অপচয় চলিতেছে মাথাভারী প্রশাসন তাহার একটি ছোটো দফা মাত্র। মাল মজুতের বিভাগ কেহ যদি খতাইয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন সেখানে কী পরিমাণ মূলধন অব্যবহৃত পড়িয়া আছে এবং তিনি যদি বার্ষিক যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার পার্টস প্রভৃতি ক্রয়ের অর্ডারগুলি পরীক্ষা করেন তাহা হইলে জামশেদপুরে যে ধরনের অপচয় হয় তাহার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করিতে পারিবেন। প্রায় ৭।৮ বৎসর আগে কোম্পানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ভারতীয় অফিসার চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছিল এবং তাঁহার জায়গায় আমদানি করা হইয়াছিল একজন বিদেশীকে। তাহার পর কিছুকাল ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতির দরুন বৈদ্যুতিক বিভাগে অপচয় হইতে আরম্ভ করে। জ্বালানি ব্যবহার আর-একটি অপচয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির মতো একটি সুবৃহৎ সংস্থার জ্বালানির ব্যবহার কমাইবার জন্য সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদি থাকা অত্যাবশ্যক এবং এ-বিষয়ে গবেষণাও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি এ-বিষয়ে অনগ্রসর। মাথাভারী প্রশাসনের সহিত অপচয়ের দরুন টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না এবং সর্বদাই তাহাকে হয় অর্থ সাহায্য নয় রক্ষামূলক শুল্কব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। যে দেশে শ্রম এত সস্তা, সে দেশে একটি সুগঠিত ইস্পাত সংস্থার সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বনির্ভর হইয়া ওঠা উচিত। জামশেদপুরে স্বাধীন কতকগুলি সংস্থা আছে যাহারা টাটার নিকট হইতে লোহার ছাঁট কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তি কিনিয়া লইয়া লাভ করে। ইহার একমাত্র কারণ তাহারা অপচয় ও মাথাভারী প্রশাসন এড়াইয়া চলে।

শেষ এবং আমাদের উদ্দেশ্যের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে-বিষয়টির উল্লেখ আমি করিব তাহা হইল শ্রমিকদের প্রতি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির মনোভাব। জামশেদপুরে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছিল ১৯২০ সালে এবং সেই সময়ের মধ্যে এত অভিযোগ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল যে ১৯২১-২২ সালে সেখানে গুরুতর শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। প্রায় এই সময়ে পরলোকগত দেশবন্ধু সি. আর. দাশের সহানুভূতি জামশেদ-পুরের শ্রমিকদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহাদিগকে পূর্ণতম সমর্থন দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯২৩ সালের

নির্বাচনে ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিশালী দল হিসাবে আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এই সমর্থনে কোনো লাভ হয় নাই। দেশবন্ধু দাশের সহিত যোগ দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং যেহেতু আইনসভায় টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানিকে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য দানের প্রশ্ন বিবেচিত হইবার কথা ছিল সেই হেতু টাটার তখন এইসব জাতীয় নেতার সংগে একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। টাটা কোম্পানি তখন ট্রেড ইউনিয়নকে (শ্রমিক সমিতি নামে অভিহিত) স্বীকৃতি দিতে, বেতনের দিন ইউনিয়নের চাঁদা তুলিতে এবং সাধারণভাবে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সম্মত হইয়াছিল। কিছু সময়ের জন্য শ্রমিকদের অবস্থায় নিশ্চিত উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল কিন্তু দেশবন্ধুর তিরোধানের পর অবস্থা আবার খারাপ হইতে আরম্ভ করে।

দেশবন্ধুর স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন মিঃ সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ এবং তিনি আইনসভায় কংগ্রেস দলের নৈতিক সমর্থনে পতাকা উড্ডীয়মান রাখিয়াছিলেন! কিন্তু কোম্পানির অফিসারদের সহানুভূতিহীন ও হৃদয়হীন আচরণের ফলে ১৯২৮ সালে একটি বড়ো ধর্মঘট হইয়াছিল। তাহার পর হইতে শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোম্পানির যে মনোভাব হইয়াছে তাহা আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপযোগী হইলেও "জাতীয়" শিল্পের উপযোগী নয়। জামশেদপুরের শ্রমিকদের সংগে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যখন ধর্মঘটীরা এবং তাঁহাদের নেতা শ্রীহোমি তাঁহাদের দাবি সমর্থনের জন্য আমার উপর অপ্রতিরোধ্য চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ধর্মঘটীদের সহিত আমার যোগদানের ফলে কোম্পানি যখন একটা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল তখন কোম্পানির কর্মকর্তারা এই শর্তে শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে শ্রীহোমির বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনেক অভিযোগ ছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সহিত কোনো আপস আলোচনা করিবেন না। ইহার ফলে শ্রমিকদের সহায়তামূলক কোনো মীমাংসা যদি হয়, তাহা হইলে এই আলোচনা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে শ্রীহোমি প্রথম সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন মীমাংসার শর্তগুলি রচিত হইয়াছিল এবং শ্রমিকদের একটি গণসমাবেশে সেগুলি অনুমোদিত হইয়াছিল তখন তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া এই মীমাংসার বিরোধিতা করার জন্য একটি নূতন সংস্থা গঠন করেন।

মীমাংসার অল্প পরেই কোম্পানি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রূপায়িত করিতে অস্বীকৃত হয় এবং ইহার ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক শ্রীহোমির দলে যোগ দেন। কয়েক মাস কোম্পানি শ্রী হোমির সংগঠনকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জানায় কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সে কৌশল পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাহাদের এককালীন শত্রু শ্রীহোমিকে জেনারেল ম্যানেজার আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পুরাতন সংগঠন শ্রমিক সমিতিকে অবজ্ঞা করা হইয়াছিল এবং যাঁহারা মীমাংসার শর্তাদি রচনা করিয়াছিলেন ও এই সংগঠনের প্রতি অনুগত ছিলেন তাঁহাদিগকে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে আবার দৃশ্যান্তর ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন দফায় শ্রীহোমির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছিল এবং তিনি কারাবন্দী হইয়াছিলেন। শ্রীহোমির অনুপস্থিতিতে তাঁহার সংগঠন হইয়া দাঁড়ায় ঝাঁপ বন্ধ করা দোকানের মতো।

১৯৩০ সালে কংগ্রেস দল আইনসভা বর্জন করায় শ্রমিকদের প্রতি কোম্পানির মনোভাবেও সুনিশ্চিত কঠোরতা দেখা দিয়াছিল। শ্রীহোমি কারাগারে যাইবার পর যখনই কোনো শ্রমিক সমাবেশ করা হইত তখনই লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া একদল গুণ্ডা ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইত এবং গায়ের জোরে সভা পণ্ড করিয়া দিত। ১৯৩১ সালে আমি যখন এইরূপ একটি সভায় সভাপতিত্ব করিতেছিলাম তখন এইভাবে সে সভা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা বলিতে পারি। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অবস্থা চলিয়াছিল এবং এমন-কি ১৯৩৪ সালে জামশেদপুরে অবস্থা এত খারাপ ছিল যে সেই শহর পরিদর্শনের সময় মহাত্মা গান্ধী একটি জনসভায় মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে "নিয়োগ-কারী ও কর্মচারীদের মধ্যবর্তী সমস্যাগুলির সমাধান লাঠির দ্বারা করা হইতেছে" ইহা জানিয়া তিনি দুঃখিত।

শ্রমিকদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা যায় যে ১৯৩০ সাল হইতে কোম্পানি তাঁহাদের সম্বন্ধে একটা নিষ্ঠুর কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। শ্রমিকদের দুইটি সংগঠনেরই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল, বেতনের দিন চাঁদা তোলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মীদের হয় শাস্তি দেওয়া হইতেছিল, নয় তাঁহা-দিগকে জামশেদপুর হইতে দূরদূরান্তরে বদলি করা হইতেছিল। ১৯৩৪

সালের জানুয়ারি মাসে যখন জামশেদপুরে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তারা প্রায় চাল্লিশ জনের একটা গুন্ডাদলকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন তখন বিষয়টি আদালতের বাহিরে মিটাইয়া লইবার জন্য টাটার উচ্চপদাধিকারী অফিসারদের আগ্রহী হইতে দেখা গিয়াছিল।

এই ঘটনার চরম পরিণতি হইল ১৯৩৫ সালে, সেক্রেটারি ও অফিসের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ঘরের জন্য চার বছরের বকেয়া ভাড়ার দাবি জানাইয়া কোম্পানি শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের উপর নোটিশ জারি করিল, অথচ চার বছর পূর্বে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. দালালের সহিত আমার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কোম্পানি চার বছরের ঘরভাড়ার দাবি প্রত্যাহার করিবে স্পষ্ট এই বোঝাপড়াই হইয়াছিল। কোম্পানি ভাবিয়াছিল অ্যাসোসিয়েশন ভাড়া দিতে পারিবে না এবং তাহাদের এই কারণে উৎখাত করা যাইবে, এবং যেহেতু জামশেদপুরের সমস্ত বাড়িই কোম্পানির স্বত্বাধীন সেইজন্য বাড়ির অভাবে অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্বই লোপ পাইবে। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভবিষ্যতে ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং বকেয়া ভাড়া কিস্তিতে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানি কোনো মিটমাটের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল, কোম্পানি ঘর ভাড়া চান নাই, তাঁহারা চাহিয়াছিলেন জামশেদপুরে শ্রমিক সংগঠনের বিলোপ।

কোম্পানি তাদের এই খেলায় সুখে দিন কাটাইতেছিল এমন সময় কংগ্রেস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুনরায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কোম্পানি জানিত দুই-তিনজন এম. এল. এ. স্বভাবত শ্রমিকদের সহিত কোম্পানির ব্যবহার প্রসঙ্গে নানাপ্রকার অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, সুতরাং তাহারা কৌশল পরিবর্তনের কথা ভাবিল। কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নামে একটি নূতন শ্রমিক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটিল এবং কোম্পানির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা শ্রমিকদের ইহাতে যোগদানের পরামর্শ দিলেন। এই নূতন দল কোম্পানির সুনজরে রহিয়াছে, এদের প্রধান কাজ সরকার ও কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের চায়ের আমন্ত্রণে আপ্যায়ন করা এবং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎকার। এই নূতন নীতির উদ্দেশ্য ব্যবস্থাপক সভায় ও অন্যত্র সমালোচকদের দেখানো যে কোম্পানি শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যাবলী দমন করে না। সংঘবদ্ধ শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতি কোম্পানির মনোভাব প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা

করিয়াছি, এখন এক-একজন শ্রমিকের প্রতি তাদের ব্যবহারের বিষয়ে বলিব। আমার কাছে মেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (যাহা জামশেদপুরে 'কোম্পানির ইউনিয়ন' নামে পরিচিত) কর্তৃক জেনারেল ম্যানেজারের নিকট পেশ করা দাবিসনদের একটি মুদ্রিত সংস্করণ রহিয়াছে, যাহাতে আছে—

'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি'তে নিযুক্ত অধিকাংশ শ্রমিকের অবস্থাই ভালো নয়, কারণ অনেকের উপরেই যথেষ্ট কারণ না দর্শাইয়া বরখাস্তের, বাধ্যতামূলক ছুটি প্রভৃতির নোটিশ জারি করা হইয়াছে। যেমন, পুরনো রোলিং মিলের কর্মচারীবৃন্দ, যাঁহারা দীর্ঘদিন এই কোম্পানিতে কাজ করিতেছেন এবং অন্যান্য সহযোগী অংশের মতো ইহারাও এই কোম্পানির ক্রমউন্নয়নে নানা ভূমিকা পালন করিয়াছেন— তাঁহাদের বাধ্যতামূলক ছুটির মাধ্যমে কর্মবিরতির সম্মুখীন করা হইতেছে।

সম্প্রতি কোম্পানি 'অস্থায়ী' আখ্যায় নূতন কর্মচারী নিয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু মজার ব্যাপার এই 'অস্থায়ী'দের কার্যকালের কোনো সময়সীমা নাই। এই ধরনের কর্মচারী দু বছরেরও অধিক কাল নিযুক্ত রহিয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নয়। এর দ্বারা কোম্পানি একটা বিরাট অংশ অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, মহার্ঘভাতা, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি বাবদ যাহা স্থায়ী কর্মচারীরা ভোগ করেন এবং এই 'অস্থায়ী' নিযুক্তরা পাইতেছেন না।

সপ্তাহাধিক কাল কর্মবিরতি নিত্যকার ঘটনা। কর্তৃপক্ষের বারংবার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিককে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর দিবার সুযোগও দেওয়া হইতেছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় এই বিধি পালন করা হইতেছে না অথবা দ্রুত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দাখিল করা কৈফিয়তের প্রতি নজর দেওয়া হইতেছে না। একই মন্তব্য অন্য সব শাস্তিমূলক ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য— যেমন, মাহিনা সংকোচন।...

কর্মচারীদের উন্নতি ও মাহিনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই। কিছুদিন যাবৎ কোম্পানির নীতি হইয়াছে অধিক মাহিনার পদের বিলোপ সাধন, এবং যখন এই পদগুলি শূন্য থাকিবে তখন নিম্নবেতনভোগী কর্মচারীদের উপর অধিক কাজ স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাপাইয়া দেওয়া।

বোনাস দেওয়ার পরিকল্পনার পিছনে যে উৎসাহব্যঞ্জক মনোভাব রহিয়াছে

আমরা তাহার প্রশংসা করি, কিন্তু আমরা মনে করি এটা কতিপয় শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিভাগীয় ভিত্তিতে বোনাসের নীতি পুনরায় অপারেটিং ও মেনটেনান্স বিভাগে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে।

কোম্পানি যখন বিশেষ বিশেষ সময়ে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন সাপ্তাহিক মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগের রীতি অনুসৃত হয়। কিছুদিন যাবৎ আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো বিভাগে জামশেদপুরে স্থায়ী শ্রমিক-শক্তিতে নিযুক্ত সাপ্তাহিক মজুরির শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার (স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই ইহার অন্তর্ভুক্ত) যাহা সমগ্র কর্মচারী শক্তির কুড়ি শতাংশ। এরকম অধিকাংশ শ্রমিকেরই কার্যকাল পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এইরূপ অধিকাংশ সাপ্তাহিক-ভিত্তিক মজুরির লোকেরা দৈনিক পাঁচ আনা হইতে আট আনা পায়। শ্রমবিষয়ে রয়েল কমিশনের রিপোর্টে আমরা জানিতে পারি যে আহমেদাবাদ ও শোলাপুরের পাঁচ সদস্য-বিশিষ্ট পরিবারের ন্যূনতম খরচ অপেক্ষা জামশেদপুরের জীবনধারণের মান অনেক উঁচুতে। (শোলাপুরে মাসিক খরচ ৩৭ টাকা ১৩ আনা ১১ পয়সা এবং আহমেদাবাদে ৩৯ টাকা ৫ আনা আট পয়সা কিন্তু জামশেদপুরে পাঁচ হাজার শ্রমিক দৈনিক মজুরি পান ৫ আনা হইতে আট আনা।)

উপরে প্রদত্ত বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে— উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আন্দোলনকারী হিসাবে নয়— অনুগত 'কোম্পানির ইউনিয়ন' রূপে আমি কি মি. কীনানকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি জামশেদপুরে কয়টি 'প্রগতিপন্থী শ্রমিক' আছেন? আমি বিস্মিত হইব না জেনারেল ম্যানেজার এবং কতিপয় উচ্চপদস্থ অফিসার ভিন্ন খুব সামান্য ভারতীয়কে 'প্রগতিপন্থী শ্রমিক' রূপে চিহ্নিত করা যাইবে।

প্রবন্ধের শুধুমাত্র একটি অংশের জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ যেখানে তিনি টাটার খনিগুলির শ্রমিকদের অবর্ণনীয় অবস্থার বিবরণ দিয়াছেন। আমি আশা করি মিসেস কীনানের সহানুভূতিসূচক মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জেনারেল ম্যানেজার গরিব খনির শ্রমিকদের দৈনিক মজুরির বৃদ্ধি সাধন করিবেন।

লেখক স্বাভাবিকভাবেই লৌহপাথরের খনির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কয়লা খনির কী হইবে। কিছুদিন পূর্বে আমি যখন টাটা কোলিয়ারী লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলাম, সেই সময় টাটা কয়লা খনির শ্রমিকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম। সেই সময় কতিপয় খনি বন্ধ করিয়া

দেওয়া হইয়াছিল। ফলে সহস্রাধিক শ্রমিক কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই আমরা খনিগুলি চালু থাকুক চাহিয়াছিলাম, কিন্তু কোম্পানি আমাদের দাবির বিপক্ষে দুইটি যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছিলেন— প্রথমত, কতিপয় খনির সহিত কোম্পানির দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তি রহিয়াছে, এবং উহাদের যোগানের পর, নিজেদের খনি হইতে কোম্পানির অতিরিক্ত কয়লার আর প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়ত, তুলনামূলকভাবে বর্তমান বাজার দর হইতে কোম্পানির খনি হইতে উৎপাদন খরচ বেশি।

কোম্পানি কেন একদিকে লোকসানজনক দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করিল এবং অন্যদিকে নূতন খনি ক্রয়ে মূলধন বিনিয়োগ করিল তাহা অনুধাবন করা বাহিরের কাহারো পক্ষে মুশকিল। প্রথমত, এইরূপ লোকসানজনক দীর্ঘ-মেয়াদীচুক্তি করা ভুল হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ত, তাহা করিয়া থাকিলে তাহাদের নূতন খনি ক্রয় করা উচিত হয় নাই। তৃতীয়ত, এই কয়লা খনি ক্রয়ের পর একবার তাহাতে কাজ আরম্ভ করিয়া পরে তাহা বন্ধ রাখা উচিত হয় নাই, কারণ বন্ধ খনি উপযুক্ত অবস্থায় রাখিতে প্রচুর ব্যয় বহন করিতে হয়। চতুর্থত, কোলিয়ারী বিভাগে মাথাভারী প্রশাসনের জন্য অযথা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইতেছে যাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই-সব অযোগ্যতার দরুন ভুক্তভোগী দেশবাসী ও রাষ্ট্র এবং শ্রমিকদের অত্যন্ত কম বেতনে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

টাটার কর্মচারীরা 'প্রগতির জন্য শ্রমিক' আখ্যায়িত হইতে চাহিলে, মাথা-ভারী প্রশাসনের শোধন প্রয়োজন এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের অপচয় ও অপদার্থতামুক্ত হইতে হইবে। বিগত বৎসরের কাজের জন্য স্বল্প বেতন-ভোগী ভারতীয় মজুরদের ন্যায্য বোনাস জামশেদপুরের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে না অথবা অন্যান্য মালিকের তুলনায় টাটা কোম্পানি ভালো, এই দাবিও প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না।

ভিয়েনা। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৫

সং যো জ ন

১

দেশবাসীর প্রতি

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ বোম্বাই হইতে লয়েড ট্রিস্টিনোর 'এস. এস. গাঙ্গে' জাহাজে ইয়োরোপ অভিমুখে রওয়ানা হইবার প্রাক্‌কালে 'ফ্রি প্রেস অফ ইণ্ডিয়া'র নিকট দেশের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতি।

ইয়োরোপ-যাত্রার প্রাক্‌কালে দেশব্যাপী আমার সকল বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করিবার জন্য আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা-সূচক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার চূড়ান্ত শারীরিক অশক্ত অবস্থা সত্ত্বেও তাঁহারাই শুধু জানেন কেন ভারতবর্ষের কোনো অংশে থাকাকালীন গভর্নমেন্ট আমাকে মুক্তিদান অথবা কোনোরকম স্বাধীনতা দান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহারা আমার বৃদ্ধ এবং অসুস্থ পিতামাতাকে দেখিবারও কোনো অনুমতি দেন নাই।

তবুও আমি মনে করি গভর্নমেন্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে-সব সুযোগ-সুবিধা আমাকে দিয়াছেন তাহা দেশব্যাপী আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের এবং বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের অবিরাম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। তাঁহারা সকলেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

জনসাধারণ অবগত আছেন যে যদিও আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থার জন্য গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণ দায়ী, সরকারী ব্যয়ে ইয়োরোপে তাহারা আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে যেমন অস্বীকৃত হইয়াছেন, তেমনি আমার বন্ধু ও আত্মীয়পরিজনদের ভারতবর্ষে আমার চিকিৎসার দায়িত্ব দিতে অসম্মত হইয়াছেন।

মুখ্যত, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বন্দীদশার জন্য গত এক বছর যাবৎ আমার আত্মীয়পরিজন যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন, গভর্নমেন্টের এই ব্যবস্থায় আমার সম্মতিদান অসম্ভব ছিল। কিন্তু আমার কতিপয় বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী স্বেচ্ছায় আমার ইয়োরোপ-প্রবাস এবং সেখানে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সংগতি সংগ্রহের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার ফলে ইয়োরোপ অভিমুখে স্বাস্থ্যান্বেষণে আমার যাত্রা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

আমার পূর্বেকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইব কিনা এখনই তাহা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে আমার ভাগ্যে যাহাই সঞ্চিত থাকুক-না কেন, যাঁহারা আমার ইয়োরোপ-যাত্রা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমি অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও আমার বন্ধুদের এবং শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তা গ্রহণে কোনোপ্রকার দ্বিধাবোধ করি নাই, কারণ আমি সর্বদাই মনে করি যে আমার রক্তের সম্পর্কের পরিধিতেই আমার পরিবারবর্গ সীমিত নয়, সমগ্র দেশে তাহা পরিব্যাপ্ত এবং আমার দেশের সেবায় যখন সর্বকালের জন্য আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন উৎসর্গ করিয়াছি আমার ঘনিষ্ঠতম পরিবারবর্গেরও যেমন আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মনোযোগ দিবার অধিকার রহিয়াছে, আমার দেশবাসীরও তেমনি এ-সম্পর্কে সমান অধিকার রহিয়াছে।

আমি এই আশা এবং প্রার্থনা করিতেছি যে ভারতীয় সমাজ জীবনের সকল স্তরের অধিবাসীবৃন্দ আমাকে যে-পরিমাণ প্রীতি ও ভালোবাসায় আচ্ছন্ন করিয়াছেন, বিধাতা তাঁহার অপার করুণা দ্বারা যেন আমাকে তাহার সুযোগ্য অধিকারী করিয়া তোলেন।

আমার সমুদ্রযাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার উপর সকল প্রকার আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, আমি মনে করি যে আমি আমার দেশবাসীর সর্বোত্তম সহৃদয়তা, শুভকামনা এবং শ্রেষ্ঠতম প্রীতিধন্য সহমর্মিতা বহন করিয়া রওয়ানা হইতেছি।

সুতরাং, আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদের এই আশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার রোগমুক্তির পথে (যদি তাহা ইতিমধ্যে অত্যধিক বিলম্বিত না হইয়া থাকে) তাঁহাদের ভাবনা ও প্রার্থনা সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিদান করিবে— যে শক্তি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সর্বোত্তম ঔষধের চাইতেও অধিক ফলপ্রদ হইবে।

ঘ.

13

C/o American Express Company,
Nice (France)
7. 12. 33

Dear Mr Woods,

Thank you so much for your letter of the 3rd November. I am sorry for the delay in replying to it.

It was good of you to send the sympathetic message of Irish friends to the Indian Press. I am sure it will be greatly appreciated. I remember that in September 1929 the family of Terence MacSwiney sent a short but magnificent message on the occasion of the death from hungerstrike of Jatin Das in Lahore Prison. The message was received with grateful appreciation.

Thank you very much for the invitation to come to Ireland: I have been longing to visit Ireland for years and I hope to do so before I return to India. In my part of the country (Bengal), recent Irish history is studied closely by freedom-loving men and women and several Irish characters are literally worshipped in many a home. At present I am not allowed to visit the United Kingdom (Free State) — nevertheless I shall be permitted by the Irish (Free State) Government to visit Ireland. But I want to keep this fact a strict secret. Some friends of mine in London are trying to secure permission for me to visit England. But if the British Government come to know that I am planning to visit Ireland, it will put their back up and they will never issue a passport for my visit to England. Until the question of my visiting England is finally decided, one way or the other, I desire to keep quiet regarding my intention to visit Ireland

For Madame Gonne Macbride I have a message from my brother whom I met in prison just before I sailed for Europe. My brother met Madame in 1914 in Paris and ever since then, has been one of her admirers. I daresay Madame does not remember my brother. He has been in internment since February, 1932: My brother went with Mukherji, an Indian friend of his, to visit Madame.

I duly received a copy of your bulletin and I liked it.

Do you get any of the Indian papers (in English) regularly? If you get them, would it be possible for you to pick out the interesting news — or would it be necessary to supply you with the news in a ready form? How

often do you publish the bulletin? I am anxious to supply you with information about India.

Kindly let me know which papers in Ireland are likely to publish interesting news, exposing the true character of British Imperialism. "Irish Press" of Dublin is Dev's paper—I think. Which is the organ of the I.R.A.? We shall try to send some news from time to time, if you could supply me with a list of the friendly Irish papers and journals.

I hope letters are not secretly censored in Ireland now-a-days, as they are in India. It is necessary for me to know that.

With deepest regards
I am
Yours sincerely
Subhas C. Bose

ডাবলিন-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সম্পাদিকা শ্রীমতী এফ. এম. উডস্‌কে লেখা চিঠি। প্রতিলিপি ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স অফ ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গ.

Milan
১৫।১।৩৪

স্নেহের অশোক,

তোমার তিনখানি চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি— ৩০শে ডিসেম্বর, ২রা জানুয়ারী ও ৬ই জানুয়ারী।

আমি ১১ তারিখে রোম ছেড়েছি— এখানে ১৭।১৮ তারিখ পর্য্যন্ত আছি। তারপর এখান থেকে "জেনিভা" যাব। আমার ঠিকানা—

C/o Mrs Horup
23 Avenue Bean Sejour
Geneva

অথবা C/o. American Express Co.

রোমে থাকতে বড়কর্ত্তার সংগে দুইবার দেখা হয়েছিল। এ বিষয়টা গোপন রাখবে— তবে ডাঃ "থিয়োরফেল্ডার"কে বলতে পার। তা ছাড়া "গভর্ণর অফ্ রোম"-এর সংগে দেখা হয়েছিল এবং তাঁর সাহায্যে মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম্ম দেখতে পেয়েছিলাম। প্রোফেসার টুচ্চি (Tucci) ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আসাতে— তাঁর সংগেও দেখা ও কথাবার্ত্তা হয়েছিল। আশা করি রোমে ক্রমশঃ একটা ভাল আড্ডা গড়ে উঠবে।

আমি ফ্লরেন্সে নামি নি— রোম থেকে বরাবর এখানে এসেছি।

Munchen-এ যাওয়া সম্বন্ধে এখনও স্থির করি নাই। এদিকে এত দেরী হয়ে গেল যে বোধহয় জানুয়ারী মাসটা জেনিভায় বিশ্রাম করা বাঞ্ছনীয় হবে। শরীর মন্দ নয়— পেটের যন্ত্রণা রোমে আসবার পর বিশেষ বাড়ে নাই— তবে বড় ক্লান্ত বোধ করছি। আশাকরি তুমি ভাল আছ।

ডাঃ থিয়োরফেল্ডারের সংগে কি কথাবার্ত্তা হয় তা জানবার জন্য বিশেষ উৎসুক আছি। রোমের প্রোগ্রাম দেখে এবং মুসোলিনীর বক্তৃতার কথা শুনে উনি কি বল্লেন?

শ্রীযুক্ত খান্না, বরাট, সেন প্রভৃতি সকলকে আমার প্রীতি সম্ভাষণ জানাবে।

ইতি— তোমার
রাঙ্গাকাকাবাবু

ড. অশোকনাথ বসুর সৌজন্যে।

ঘ.

C/o American Express Co
Geneva
21.2.34

স্নেহের অমি,

…বিজ্ঞান শিখলে চিন্তা ও কাজের অভ্যাসগুলি exact হয়। আমাদের জাতের বড়দোষ যে আমরা বড় 'লেলা-ক্ষ্যাপা"— চরিত্রের মধ্যে exactness এবং বাঁধন নেই। সেটা আনতে হলে আমাদের শিক্ষা বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। আমার যদি সম্ভব হত আমি গোড়া থেকে বিজ্ঞান আবার শিখ্‌তাম। কিন্তু আমি philosophy পড়ে মানুষ হয়েছি— যখন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম তখন "too late"।…এদেশে প্রত্যেক বালক-বালিকা স্কুলে উচ্চ বিজ্ঞান শিখে— আমাদের তো সেই উপায় নেই— তাই কলেজে গিয়ে আমাদের বিজ্ঞান শিখতে হয়।

চরিত্রের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে হলে— বিবেকানন্দের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জাতের চরিত্রের প্রধান দোষ— আমাদের একাগ্রতা নেই— concentration নেই। এই concentration পাবার জন্যে পূর্বে ধ্যানের অভ্যাস করতে হত। এই একাগ্রতার সঙ্গে চাই "tenacity"— "লেগে থাকা"। একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সেই আদর্শের পেছনে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। বাঙ্গালী যদি Concentration ও Tenacity লাভ করতে পারে— যদি তার চরিত্রে একাগ্রতা ও আদর্শ-প্রবণতা আসে— তাহলে তার সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না। কারণ চরিত্রের অন্যান্য উপাদান তার সবই আছে।

একটা কথা সর্বদা মনে রাখবে— যে সংসারে হীনতা ও কুটিলতাকে জয় করতে হলে— শুধু ভালবাসার দ্বারা সেটা জয় করা যায়। এর চেয়ে বড়সত্য ইহজগতে নেই। যদি জীবনে কোন বস্তু ঘৃণা করতে হয়— তাহলে ঘৃণা করা উচিত নীচতা ও কুটিলতাকে। কিন্তু নীচতার প্রতিদানে নীচতা দেখালে চলবে না— ভালবাসা ও উদারতা দেখাতে হবে। তাই Christ ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—"Father, forgive them for they know not what they do"—এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছিলেন— "মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।"

সন্ন্যাসীর আদর্শ বাইরে নয়— প্রাণের ভিতরে। গৈরিক ধারণ করলে সন্ন্যাসী হয় না। এই যুগের জন্য যে সন্ন্যাস, সে সন্ন্যাসের অর্থ—কর্ম সন্ন্যাস। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে একটা মহান্ আদর্শের জন্য জীবনটা ঢেলে দিতে হবে। এর নাম নিঃস্বার্থ কর্ম।

তুমি জান যে আমি নিজে একবার বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে গেছ্লাম। গুরু খোঁজবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছ্ল। মনের মত গুরু পাই নাই। তাই ফিরে আসি। সেই সময়ে আমি বুঝতে পারি যে সংসার আমাদের বাহিরে নয় আমাদের মনের ভিতরে। বনে গেলেও মানুষ নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করবে যদি তার আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়ে থাকে। তবে আমি স্বীকার করি যে মাঝে মাঝে নির্জন স্থানে যাওয়া ভাল এবং যাওয়া দরকার।

তারপর নারীর কথা। ব্রহ্মচর্য্য দুই রকমের আছে— প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য মানে শরীরকে শুদ্ধ রাখা। এর পরের অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য মানে নারীর প্রতি কোনো কামনা পোষণ না করা। প্রথম রকমের ব্রহ্মচারী হওয়া খুব কঠিন নয় কিন্তু দ্বিতীয় রকমের ব্রহ্মচারী হতে হলে বহুকাল চেষ্টা ও অভ্যাস দরকার। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে খাঁটি ব্রহ্মচারী হ'তে হলে দুইটা জিনিষ চাই :

১. জীবনে একটা মহান আদর্শকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতে হবে এবং সেই আদর্শের প্রতি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাহলে automatically অন্য বাসনা থেকে মনটা সরে আসবে।

২. মাতৃরূপে নারীর চিন্তা করা চাই— অর্থাৎ দুর্গা বা কালীরূপে ভগবানের আরাধনা করা চাই। এই রকমের ধ্যান ও প্রার্থনা করতে মনের এমন একটা অবস্থা আসবে যে স্ত্রীলোককে দেখলে বা স্ত্রীলোকের চিন্তা করলে— মার কথা মনে আসবে। এই ভাবটা আরও ঘনীভূত করার জন্য আমাদের শাস্ত্রে এবং তন্ত্রে অনেক প্রকার পূজার আয়োজন আছে যেমন কুমারী পূজা। অর্থাৎ কুমারীকে সামনে বসিয়ে রেখে শুধু মার কথা এবং বিশ্বজননীর কথা চিন্তা করতে হয়।

অল্পদিনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ সফলকাম না হতে পারলে— হতাশ হওয়া চলবে না। বিবাহ পরে তুমি কর বা না কর— এখন থেকে ব্রহ্মচর্য্য পালন

করতে হবে। প্রত্যহ সকালে এবং রাত্রে যদি দুর্গামূর্ত্তির ধ্যান করা হয় তাহলে উপকার পাওয়া যাবে। চন্ডীতে আছে—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবিঃ ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"

অর্থাৎ "সমস্ত বিদ্যা তোমার ভিন্নরূপ এবং সমস্ত স্ত্রীজাতি ও তোমার ভিন্নরূপ— হে বিশ্ব জননী।"

আমার মধ্যে ভাল যদি কিছু থাকে— তা যেন তুমি পাও এবং মন্দটা যেন না পাও— এটাই আমার নিরন্তর প্রার্থনা। ইতি

তোমার রাঙাকাকাবাবু

শ্রীঅমিয়নাথ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ঙ. Vienna
15. 8. 34

স্নেহাস্পদেষু,

অশোক,

আমি জানি না তোমার হাতে কিরকম সময় থাকিবে। যদি সময় থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কাজটী করিলে আমি বিশেষ সুখী হইব।

আমার বইর জন্য আমি কয়েকটী ফটো চাই। যদি জোগাড় করিয়া পাঠাইতে পার তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তুমি নিজে অবশ্য জোগাড় করিতে পারিবেনা— কিন্তু অক্ষয়, গোপাল প্রভৃতির সাহায্যে জোগাড় করিতে পার। আমি একটা তালিকা দিতেছি :—

মহাত্মা গান্ধী... * (জরুরি)
দেশবন্ধু... * ,,
লালা লাজপত রায়
লোকমান্য তিলক
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু * ,,
কংগ্রেসের দৃশ্য
অন্য কোনও ফটো যাহা উপযোগী হইতে পারে

(৬) এবং (৭) সম্বন্ধে আমি সঠিক কিছু বলিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে তুমি নিজে চিন্তা করিতে পার অথবা গোপালের সংগে পরামর্শ করিতে পার। আমার বইর বিষয় হচ্ছে—১৯২০ হইতে ১৯৩৪ পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস। সুতরাং তুমি ভাবিয়া দেখিতে পার আর কি রকম ছবি উপযোগী হইবে। ছবিগুলি ফটো হওয়া চাই এবং শীঘ্র পাঠান চাই।

"বম্বে ক্রনিকলে" দেখিলাম যে খাম্বা খুব লম্বা মন্তব্য লিখেছে জার্ম্মানি সম্বন্ধে। তুমি কি পাঠ করেছ?

Times-এ পড়িলাম ২।৩ দিন পূর্ব্বে, যে সেপ্টেম্বরের শেষে registered marks আর বিদেশীদের দেওয়া হইবে না। এ সিদ্ধান্ত ছাত্রদের সম্বন্ধেও খাটবে কিনা— তা কিছু লেখা নেই। যদি বাস্তবিক তোমাদেরও বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের খুবই অসুবিধা হইবে। তুমি একবার Reichs-bank-কে এ বিষয়ে লিখিতে পার।

আমার শরীর একই রকম চলছে। C/o American Express Company— এই ঠিকানায় চিঠি দিও। "মিলান" ও "নেপিল্‌স্‌" হইতে তোমার চিঠি যথাসময় পাইয়াছিলাম। আশাকরি পথে তোমার কোনও কষ্ট হয় নাই।

ইতি তোমার
রাঙাকাকাবাবু

পুনঃ আসিবার সময়ে কিছু curios লইয়া আসিবে। তাছাড়া ২।১ পাউন্ড দার্জ্জিলিঙ "চা" আনিবে।

সুভাষ

চ.

Naples
20. 1. 35

স্নেহের অশোক,

আজ Naples-এ পৌঁছিয়া তোমার চিঠি পেলাম। আমি পরশু Rome যাইব— সেখানে ২।৩ দিন থাকিয়া Vienna যাইব— এইরূপ ইচ্ছা। Rome-এ Hotel Excelsior-এ থাকিব। বিশেষ জরুরি কথা না থাকিলে Vienna-তে উত্তর দিও। আমি Italy-তে ৬ দিন থাকিলে 50 percent reduction পাইব— Italian Railways-এ।

GRAND HOTEL DE LONDRES
NAPOLI

Naples
20. 1. 33

প্রতিলিপি : ড. অশোকনাথ বসুকে লিখিত পত্র

London Timesএ আমার সম্বন্ধে কি ২ বেরিয়েছে (আমি দেশে ফিরিবার পর) তা যদি স্মরণ থাকে— তাহা হইলে আমাকে জানাইও। যদি cuttings থাকে তাহা হইলে পাঠাইও।

অচ্যুত কলিকাতা বিদ্যাপীঠে আমার ছাত্র। ছেলে ভাল। Non-cooperation করিবার পর শেষ পর্য্যন্ত Non-cooperation বজায় রাখিয়াছে— যাহা খুব অল্প ছেলে করিয়াছে। গত ৩।৪ বৎসর তাকে খুব কমই দেখিয়াছি— তবে লোকমুখে শুনিয়াছি যে researchএর কাজ ভালই করিয়াছে। বরাবর ও একটু eccentric এবং একটু কাটখোঁট্টা ও abrupt। এ পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে কিছু শুনি নাই। ১৯২১শে আমাদের সংগে জেলেও গিয়াছিল। বি. কে. ঘোষকে আমি অচ্যুতের সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইয়ুরোপে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলাম। অচ্যুতের "প্রো-জার্ম্মান" ভাব বোধ হয় ঘোষ-এর কাছ থেকে পাওয়া— তাছাড়া যখন বৃত্তি পাইয়াছে— তখন "প্রো-জার্ম্মান" হইবার কারণও আছে। তবে উৎকট রকমের "প্রো-জার্ম্মান" হইবার কোনও কারণ দেখি না।

আমার শরীর মোটের উপর একই রকম চলছে। দেশে গিয়া পেটের যন্ত্রণা বাড়িয়াছিল— জাহাজেও কষ্ট পাইয়াছিলাম। খুব সম্ভব Vienna গিয়া operation করাইব। ছোটদাদা নূতন রকমের diagnosis করিয়াছেন এবং তাঁর মত operation এর বিরুদ্ধে। কি করিব বুঝিতে পারিতেছিনা।

আমার সব চিঠিগুলি একটা পার্শেল করিয়া ও Einschreiben করিয়া Vienna পাঠাইয়া দিও। তাড়াতাড়ি নাই— আমার Vienna পৌঁছান সংবাদ পাইলে তারপর পাঠাইও।

তুমি যে বইগুলি নিয়ে গেছ— তা তোমার কাছে রাখতে পার।

আমাদের জাহাজে একজন সহযাত্রী শ্রীযুক্ত "বিশ্বম্ভর নাথ"—মিউনিক হয়ে Berlin যাবেন। আমি তাঁকে তোমার ঠিকানা দিয়েছি এবং আমার নামে তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করতে বলেছি। তিনি Cawnpore Chemical Works-এর Chief Chemist। তাঁর আচারব্যবহার ভালই— সাধ্যমত তাঁর সাহায্য করো। তাঁকে Deutches Museum দেখে যেতে বলেছি। তোমার নিজের সময় না থাকিলে আর কাহাকেও বলিতে পার তার দেখাশুনা করিতে।

বাড়ীর খবর তত ভাল নয়। মার শরীর মন বড় খারাপ। আসবার

সময়ে দেখে এসেছি গোপালির স্ত্রীর ও দ্বিজুর টাইফয়েড্ অসুখ। তাহা ছাড়া ছেলেমেয়েদের কাশি জ্বর ইত্যাদি। মেজদাদারও dysentric diarrhoea হয়েছিল। শ্রাদ্ধের কাজ একরকম ভালভাবে হয়ে গেছে। তোমার হয়ে অন্য ছেলেরা শ্রাদ্ধ করেছে। আমি home-interned ছিলাম। বাঙ্গলা ছাড়বার পর automatically released হই— তবে police escort শেষ পর্য্যন্ত আমার সংগে ছিল এবং জাহাজে তুলিয়া দিয়া তার পর বিদায় লয়। তবে Bombayতে এবার পুলিশ দুর্ব্ব্যবহার করে নাই। তাই বম্বাই পৌঁছিয়া বন্ধুদের সংগে আলাপ করিতে পারিয়াছিলাম এবং press-কে interview দিতে পারিয়াছিলাম।

পুলিনের latest address কি ?

আশাকরি তুমি ভাল আছ।

ইতি তোমার

রাঙ্গাকাকাবাবু

পুনঃ American Expressএর সহিত বন্দোবস্ত রাখিও যেন তাদের ঠিকানায় তোমার টেলিগ্রাম আসিলে তুমি পাও। আমি বাড়ীতে বলে এসেছি যে Bose Amexco Munich— এইভাবে টেলিগ্রাম করিতে। তুমিও বাড়ীতে এটা জানিয়ে দিও।

সুভাষ

ড. অশোকনাথ বসুর সৌজন্য প্রাপ্ত।

তথ্য ও উল্লেখ -পঞ্জী

পৃ. ১৭ ।। নিবেদন

১৯২৯; আগস্ট মাসে 'অল ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল সাফারার্স ডে' পালনের জন্য দক্ষিণ কলিকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন। প্রায় তিনমাস শুনানীর পর আদালত, ১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে রাজদ্রোহের অভিযোগে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। আট মাস কারাভোগের পর ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ তিনি মুক্তি পেলেন। সেই কারণে এই সময়ের কোনো ভাষণ, অভিভাষণ, বিবৃতি সংকলিত হবার কোনো অবকাশ নেই।

পৃ. ৪৬ ।। রাইটার্স বিল্ডিংসে আক্রমণ

বিনয়-বাদল-দীনেশ। ৮ ডিসেম্বর, ১৯৩০ বাংলা সরকারের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিং-এ তিন বিপ্লবী শহীদ বিনয় বসু (১৯০৮), বাদল (সুধীর) গুপ্ত (১৯১২) এবং দীনেশচন্দ্র গুপ্ত (১৯১১) ইয়োরোপীয় পোশাক পরে দিন-দুপুরে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দোতলায় উঠে পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কারাবিভাগের ইনসপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন সাহেবের কামরায় ঢুকে নেতা বিপ্লবী বিনয় বসুর গুলি করবার হুকুম পাওয়ামাত্র সিম্পসন সাহেবের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। সিম্পসনের মৃত্যু হল। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি নেলসন্, সেক্রেটারি টয়নাম্, দুই আই. সি. এস. কর্মচারী আহত হন। তারপর 'অলিন্দ যুদ্ধ' শুরু হয়। অতঃপর তিনজনই একটি ঘরে ঢুকে সায়ানাইড বিষের অ্যাম্পুল মুখে পুরে দেন। বাদলের দেহ এলিয়ে পড়ল, বিনয় ও দীনেশ নিজেদের পিস্তল থেকে নিজ নিজ মাথার খুলি উড়াবার জন্য তাক্ করে গুলি ছোঁড়েন। ১৪ ডিসেম্বর বিনয় জীবনের পরপারে চলে গেলেন। দীনেশ সুস্থ হয়ে উঠলে বিচারের পর ১৯৩১, ৭ জুলাই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। ১৯৩০, ২৯ আগস্ট বিপ্লবী বিনয় বসুর গুলিতে বাংলা পুলিশের আই. জি. লোম্যান মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রাণ হারান। গুরুতর আহত হন ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট হডসন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স। এপ্রিল ২৭,১৯৩০-এ প্রেস অর্ডিন্যান্স নামক প্রথম প্রেস এমারজেন্সি অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী

নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি দীর্ঘকাল সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখে।

পৃ. ৪৮।। স্কটিশ চার্চ কলেজ শতবার্ষিকী

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মেয়র সুভাষচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। ১৯১৬ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র সুভাষচন্দ্র ফিরে গিয়েছিলেন কটকে। এক বছর অনুপস্থিতির পর কলকাতায় ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষের অনুমতি-ক্রমে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন বিষয়ে অনার্স পড়তে শুরু করেন। "ভর্তি হয়েই পরম আগ্রহ ও নিষ্ঠায় আমি পড়াশুনা শুরু করে দিলাম। দুটো বছর আমার নষ্ট হয়েছিল। ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে আবার যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলাম আমায় সহপাঠীরা ততদিনে বি.এ. পাশ করে এম.এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে।"

পৃ. ৫৮।। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদাবি

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯২৮-এ বোম্বাইতে সুতীকল শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিতরূপে শুরু হয়। গভর্নমেন্ট এবং মালিকপক্ষ সমবেতভাবে এই ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হলে ১৯২৯, মার্চ মাসে সারা ভারত থেকে ৩১ জন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার ক'রে মীরাটে তাদের সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাহায্যে ইংলন্ডের রাজার হাত থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে সোভিয়েতের অনুকরণে ভারতে সরকার স্থাপনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন। ১৯৩৩, ১৬ জানুয়ারি রায় দেওয়া হয়। তিনজন অভিযুক্ত মুক্তি পান, বিচারাধীন থাকাকালীন একজনের মৃত্যু হয়। অবশিষ্টদের ৩ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম সহকর্মী, প্রথম জীবনে বর্তমান বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড স্থাপনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম সহায়ক এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ১০০ বৎসর বয়সে ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ লোকান্তরিত হন।

টেরেন্স ম্যাকসুইনী। আয়ারল্যান্ডের কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনী আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামে কারারুদ্ধ হয়ে তারই প্রতিবাদে আমরণ অনশন

ধর্মঘট শুরু করেন। অনশন ধর্মঘটকালে ম্যাকসুইনী জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে পোঁছালে ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট ম্যাকসুইনীর প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করা হয়। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রীসভা এ-বিষয়ে অনড় হওয়ায় ৭৬ দিন অনশনের পর ম্যাক-সুইনী কারাগারে আত্মাহুতি দেন।

পৃ. ৬৬ ।। ভারতে চাই সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক

গান্ধী-আরউইন চুক্তি। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে কংগ্রেসকে সম্মত করাবার জন্য ১৯৩১-এর জানুয়ারির শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজি বড়োলাট লর্ড আরউইনের সংগে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে দলবলসহ দিল্লী পোঁছান। সেখানে গান্ধীজি ও বড়োলাটের সংগে কয়েকদিনব্যাপী আলোচনার পর ৪ মার্চ আলোচনা সমাপ্ত করে গান্ধীজি আলোচনার ভিত্তিতে উভয় পক্ষের সম্মত একটি চুক্তির খসড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করেন এবং পরদিন ৫ মার্চ, ১৯৩১ মহাত্মা গান্ধী এবং বড়োলাট চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। এই চুক্তি 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' অথবা 'দিল্লী-চুক্তি' নামে খ্যাত।

পৃ. ১১৫ ।। শ্রমিক আন্দোলন

হুইটলি কমিশন। ১৯২৯, জুন মাসে গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিক গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় এলে ভারতবর্ষে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য মি. হুইটলির সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনই হুইটলি কমিশন নামে খ্যাত। সাইমন কমিশনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার হুইটলি কমিশনে দুইজন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ননেতাকে মনোনীত করেন— বোম্বাই-এর শ্রীএন. এম. যোশী এবং লাহোরের শ্রীচমনলাল। শ্রমিক আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ এই প্রস্তাবে সম্মত হলে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত হয়।

পৃ. ১৩৭ ।। প্রতিবাদ

২৩ আগস্ট ১৯৩১ সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা ২২ আগস্ট, ১৯৩১-এর পত্রের প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তর দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ১৯ আগস্ট, ১৯৩১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে একটি চিঠি

দিয়েছেন, ২২ (২১?) আগস্ট উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে লিখেছেন : "তুমি লিখিয়াছ যে, তুমি ভারতবর্ষের সর্বত্র আমাকে প্রেসিডেন্ট করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিয়াছ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাংলায় তো সেরকম কিছুই দেখি নাই। একথা যদি সত্য হয় যে আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার সম্মতি না লইয়া আমার নাম ব্যবহার করা হইয়াছে, তবে একথা বলিতে হয় যে, তুমি সৌজন্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ। মনে হয় তুমি আমাকে চাও না, আমার নামটাই চাহিয়াছ।"

দীর্ঘ চিঠির শেষাংশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে লিখেছেন : "তুমি একদিকে আমাকে তোমাদের রিলিফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের রিলিফের টাকা আমার দ্বারা অপসারিত হইয়াছে, একথাও বলিতেছ। একই সাথে একবার গালি দেওয়া আর একবার স্তুতি করায় মনে হয় তুমি ধমক দিয়া কাজ আদায় করিতে চাও।..."

পৃ. ১৪৮ ॥ বাংলায় বিরোধ মিটাইতে পদত্যাগ

হিজলী হত্যাকাণ্ড। খড়্গপুরের অনতিদূরে হিজলী বন্দী নিবাসে, বিনা বিচারে আটক বাংলার বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর বন্দী-শালায় সশস্ত্র প্রহরীদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিরোধ চরমে উঠলে অকস্মাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ রাত্রিতে সশস্ত্র প্রহরীরা বন্দীদের ব্যারাক লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এবং তারপর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তাদের যথেচ্ছ আক্রমণ করে। দুইজন বিপ্লবী বন্দী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন এবং ২০ জন গুরুতররূপে আহত হন। সরকারী তদন্ত কমিটি প্রকাশ্য তদন্তের পর গুলি ছোড়ার বিরুদ্ধে রায় দেন। সুভাষচন্দ্র এই ঘটনার পর জে. এম. সেনগুপ্তসহ হিজলী উপস্থিত হয়ে শহিদদের শবদেহ কলকাতায় এনে দাহ করবার ব্যবস্থা করেন। পরে ২৫ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে জনসভায় হিজলী হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়। সুভাষচন্দ্র এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি বার্তাও সভায় পাঠ করা হয়।

পৃ. ১৭৩ ॥ স্বাধীনতার বাণী

চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ড। ৩০ আগস্ট, ১৯৩১-এ চট্টগ্রামের ফুটবল মাঠে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামের অত্যাচারী পদস্থ পুলিশ অফিসার আসানুল্লাকে

হত্যা করলে পরদিন প্রকাশ্যে গুণ্ডাদের হাতে শহর ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। গুণ্ডারা অবাধে লুণ্ঠন এবং মারপিট ও নানা-প্রকার অত্যাচারে দারুণ সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। কলকাতার জনসাধারণ একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করে স্থানীয় কয়েকজন অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। বহুদিন বাদে ডিভিসন্যাল কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পৃ. ২৪৭ ।। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির অভ্যুদয় এবং ভারতের ভবিষ্যৎ

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি। ১৯৩৪-এ নাসিক জেলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য তরুণ চিন্তাবিদদের সমাবেশে এই পার্টি গঠিত হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব দেবে আশা করা হয়েছিল। জওহরলাল যদিও এই দলের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন, এই দলে যোগ দিয়ে তার নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গোড়া থেকেই সমাজ-বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণে দ্বিধাচিত্ততা দেখিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে পরিষদীয় বিরোধীদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক স্পর্ধার অভাব, এই পার্টিকে কংগ্রেসেরই রকমফের দলরূপে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করে, যদিও এই দলে প্রতিভাবান তারুণ্য-শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল।

পৃ. ২৯১ ।। ভি. জে. প্যাটেল উইল

ভি. জে. প্যাটেল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তিনি বোম্বাইয়ের আইনজীবী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলভুক্ত হন। বিঠলভাই প্যাটেল ১৯১৯-এ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরূপে ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন সংস্কারের পূর্বে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে ইংলন্ডে যান। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য পার্টির (Indian Legislative Assembly) প্রতিনিধিরূপে ১৯২৫-এ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম নির্বাচিত সভাপতির দায়িত্ব বিশেষ বিচক্ষণতা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করে সরকার পক্ষের যেমন ত্রাসের কারণ হয়েছিলেন, তেমনি বিরোধীদের নেতাসহ অন্যান্য সদস্যদের অধিকার

ও প্রিভিলেজ সুরক্ষা করে তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২৭-এ বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন।

বড়োলাটের ৩১ অক্টোবর, ১৯২৯-এ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক পরিণতি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসরূপে ঘোষণার পর, তারই মধ্যস্থতায় বড়োলাট লর্ড আরউইন গান্ধীজি ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সংগে সাক্ষাৎকারে সম্মত হন এবং ডিসেম্বরে এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০-এ আইন-অমান্য আন্দোলনে সরকারী অত্যাচার সকল সীমা লঙ্ঘন করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সেনাবাহিনীর গুলিতে হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষের উপর মৃত্যুর তদন্তের জন্য তাঁর সভাপতিত্বে কংগ্রেস একটি কমিটি নিয়োগ করে। তার পূর্বে সরকারী তুলা শুল্ক বিলে সাম্রাজ্যের পোষকতা (Imperial Preference) সংক্রান্ত জবরদস্তি নীতি গ্রহণে কংগ্রেস পার্টি এবং পণ্ডিত মালব্যর ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিলে, বিঠলভাই প্যাটেল, ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দেন।

১৯৩৩, মে মাসে ভিয়েনায় চিকিৎসাধীন থাকাকালীন বিঠলভাই সুভাষ-চন্দ্রের সংগে ভিয়েনা থেকে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের এবং গান্ধীজির নেতৃত্বের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করে যৌথ বিবৃতি দেন। ১৯৩৩, ২২ অক্টোবর ভি. জে. প্যাটেল একটি সুইস স্বাস্থ্যনিবাসে দেহরক্ষা করেন। তাঁর একলক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পদ জাতীয় কাজের জন্য রেখে যান এবং বিদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাজে প্রচারের জন্য একটি উইলে এই সম্পদ সুভাষচন্দ্রের হাতে দেবার নির্দেশ রেখে যান। সেই উইলের নির্দেশ কার্যকর হয় নি।

নির্দেশিকা

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪ ॥	১৫	পণ্য ভারতে আমদানী	পণ্য আমদানী
৪৬ ॥	২২	প্রমাণিত	প্রশমিত
৭০ ॥	১৭	উৎপারিত	উৎসারিত
৭২ ॥	২৭	চুক্তিগবন্ধ	চুক্তিবন্ধ
১১৫ ॥	১৭	নঁয়ম	নিয়ম
১৯৯ ॥	৪	পথ। আমরা···	পথ। অন্যটি আপসের পথ। আমরা
২৩৮ ॥	২	পর বোম্বাই···	পর পুনরায় ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাই.
২৭০ ॥	১১	আয়রাল্যান্ডের	আয়ারল্যান্ডের
২৯২ ॥	২০	আবস্ট	আগস্ট
২৯৩ ॥	১৬	১১১ নং (১৮১৮)	৩ নং (১৮১৮)
২৯৪ ॥	২৯	এই	বই
২৯৫ ॥	১৬	ইউনাইটে	ইউনাইটেড
॥	২৫	ফান্স	ফ্রান্স